ভিনয়, অভিনয় নয়
অন্যান্য গল্প

অভিনয়, অভিনয় নয়

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

চতুরঙ্গ প্রকাশালয়
৬৩-১এফ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ১৯৩০

দাম [illegible] টাকা

প্রকাশক

শ্রীসুজিতকুমার দাসগুপ্ত

৯৩-১এফ্ বৈঠকখানা রোড্

১৮ নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

তাই আমি এই সুযোগে আমার নিজের লেখাটি তাড়াতাড়ি ঢুকে' নিচ্ছি। চুলোয় যাক্ ছদ্মনাম—বহুদিন যাবৎই তা'র ছদ্মত্ব ঘুচেছে। কোনো লেখকের বাজারে যখন একবার নাম হ'য়ে যায়, তখন আর তা'র ছদ্মনাম নে'য়ার উপায় থাকে না; সব ভালো জিনিষের মত যশেও অসুবিধে আছে। উর্ম্মিলার পরবর্ত্তী গল্পগুলো লেখা হ'লে পুরাণের পুনর্জন্ম নামক বইয়ের লেখকের নাম না-হয় বিপ্রদাস মিত্রই রাখ্‌তাম; কিন্তু তা যখন হ'ল না, এই নিঃসঙ্গ গল্পটিকে বুদ্ধদেব বসুর অভিনয়, অভিনয় নয়-এ আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম।

বইয়ের জ্যাকেট্‌-এর ছবিটি শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের আঁকা।

৯৩-১এ,

১৮ নং বৃন্দাবন
ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টি,
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে দ্বা,

সূচী

'Lord, what fools these mortals be!'

A Midsummer-Night's Dream.

প্রথম ও শেষ

প্রথম ও শেষ

সোনারঙ্ পোঃ,
(ঢাকা)
১৬ই বৈশাখ, বিকেল

এইমাত্র বেড়াতে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এসে গেলো বৃষ্টি। আমার জান্‌লার পাশের পুরোনো পেঁপে গাছটার চিক্‌রি-কাটা চিকণ পাতাগুলি হাওয়ায় দুলে'-দুলে' উল্টে' যেতে লাগ্‌লো। প্রথমে হীরের কুচির মত বড় ও স্বচ্ছ বৃষ্টির ফোঁটা—যেন কতদূর থেকে ছুটে' আস্‌তে-আস্‌তে পেঁপে-গাছটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়্‌লো; পরে এলো জাঁক-জমক হাঁকডাকে পৃথিবীকে অস্থির করে' বৃষ্টির মিছিল, সবুজ পাতাগুলো জলের ঝাপটে কালো হ'য়ে এলো, বিকেলের প্রচুর আলো কোথায় গেলো মিলিয়ে,—আকাশ থেকে নদী পর্য্যন্ত মেঘের ধূসর ছায়া শীত-সন্ধ্যার কুয়াশার মত ভারি ও ম্লান হ'য়ে নেমে এসেছে।

সুতরাং আমাদের বেড়াতে যাওয়া হ'ল না। সেই বেশেই আমার ঘরে ফিরে' এসেছি। জানলার শার্সির কাঁচে বার বার বৃষ্টির ঝাপট্ এসে আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে, তা'র পেছনে আমাদের বিস্তৃত আম-বাগানের শ্যামল ঘনতা রঙ্গমঞ্চের কালো যবনিকার মত চোখে এসে লাগছে। ঘরের ভেতরে আলো কম; জান্‌লার কাছে একখানা চেয়ার নিয়ে এসে বস্‌লাম। খানিকক্ষণ বই নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌লাম, মন বস্‌লো না। তারপর হঠাৎ মনে হ'ল, আমার প্রিয়তমা নীলার কাছে যে-চিঠিটা বাড়িতে লিখ্‌বো ভেবেছিলাম, সেটা এখনি লিখে' ফেলি না কেন?

সেই চিন্তার ফল যে কী হ'ল, তা তো তুই প্রত্যক্ষই কর্‌ছিস্। যদি এই বৃষ্টিটা না আস্‌তো, তবে এতক্ষণ পদ্মার ধার দিয়ে সরু পথ ধরে' হেঁটে বেড়াতাম—খালি-পায়ে। এখানকার লোকেরা জুতো-পরা মেয়ে দেখ্‌লে আঁৎকে উঠ্‌বে বলে' নয়,—নরম মাটির ওপর নরম পায়ের

তাঁর বোট্ কখনো সে-পথে যাওয়া-আসা করে নি। এ-পদ্মা অলসগমনা, ভীরু স্রোতস্বিনী নয়, এ গভীর, গম্ভীর ও উদার—করুণা-বিতরণেও যেমন মুক্তহস্ত, অকল্যাণ-সাধনেও তেম্‌নি অকুণ্ঠ। তোরি মত। নদীর মধ্যে এ অভিজাত।'

'বাবা, নিজকে এমন করে' প্রশংসা কর্‌তে তোমার লজ্জা করে না? আমি যে তোমারই মেয়ে।'

বাবা হাস্‌লেন। 'এ কথা বলাতেই তা'র পরিচয় পেলাম।'

চা খেতে বসে' হঠাৎ আমার মনে এক উৎকট প্রশ্নের আবির্ভাব হ'ল। জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম, 'বাবা, যেখানে যাচ্ছ, সেখানে চা কিন্‌তে পাওয়া যায় তো?'

রুটিতে জ্যাম্ মাখাতে-মাখাতে বাবা বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'এক ইংরেজ মহিলার একবার ভারতবর্ষে আস্‌বার কথা হয়। তিনি এখান্‌কার এক বন্ধুকে চিঠিতে জিজ্ঞেস্ করেন, "ক্যাল্‌কাটার পথে-ঘাটে কি দিনের বেলাতেও বাঘ ঘুরে' বেড়ায়?"'

মা আমার পক্ষ নিয়ে বল্‌লেন, 'ওর আর দোষ কী, বলো? জন্মেও তো পাড়া-গাঁ চোখে দেখে নি!'

বাবা বল্‌লেন, 'যেন তুমিই দেখেছ! মা-মেয়ে দু'জনেরই গ্রাম-সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা, তা তো শরৎবাবুর উপন্যাস থেকে নে'য়া। তা ভালোই হ'ল। তোমাকে বিয়ে করেছি পর আর তো দেশে-যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি—এবার তোমাকে সুদ্ধ দেখিয়ে আনা যা'বে! তুমি তো মুসৌরীর নামে ক্ষেপেছিলে, কিন্তু মুসৌরীতে পরেও যাওয়া যা'বে—আর, আস্‌ছে বছর বোধ হয়, যেখানে আমাদের বাড়ি ছিলো, সেখানে থাক্‌বে নদী, এবং তা'র ওপর দিয়ে চল্‌বে স্টীমার। বাড়িটে আমাদের বহুকালের—তিরিশ বছর ওটা দেওয়ান-গোমস্তার হাতে পড়ে' আছে, শেষ সময়ে আমাদেরকে দেখে খুসিই হ'বে।'

প্রথম ও শেষ

মা জিজ্ঞেস্ করলেন, 'কেমন বাড়ি ?'

'কেমন ? দেখতে সাবেকী, কিন্তু কাজে আশ্চর্য
ঘরগুলো অত্যন্ত প্রশস্ত এবং উঁচু, অনেক জান্‌লা অ
বেশ চওড়া। ওপরে ওঠবার সিঁড়ি কাঠের। এ
ও পুরুষদের আলাদা স্নানের ঘর পর্য্যন্ত আছে।
চৌরঙ্গীতে তুলে' নিয়ে আস্‌তে পারলে বস-বাস কর
শ্রীমতী লীনা, তোমার সমস্ত আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক
হ্যাঁ—বল্‌তে ভুলেছি, সিঁড়ির পেছনে ছোট্ট একটা গু
কুঠুরি। বাইরে থেকে যেন জাপানী পর্দ্দার মত দেখা
দরজা—কৌশল না জানলে কিছুতেই খোলার উপায়
আমার প্রপিতামহের আমলে সেখানে মোহর রাখা
বাড়িটে করেন কিনা। তিনি কল্‌কাতায় এসে
ইংরেজি শেখেন। ফলে ইস্‌ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অ
বড় রকম চাক্‌রি জুটে' যায়—মাসে সত্তর টাকা
বছরে তিনি যা উপার্জ্জন করেন, না দিয়ে শুধু
প্রকাণ্ড এসটেট গড়ে' তোলেন। চৌধুরীরা তখন
সেরা জমিদার, কিন্তু সেই সময় থেকেই তা'দের পতন
আমলে আমাদের প্রতিপত্তি আরো বাড়ে, চৌধুরী
জমকের অবশিষ্ট থাকে শুধু প্রকাণ্ড চক্‌মিলান বাড়িখা
ও' বাড়িতে যথেষ্ট রেষারেষি ছিলো—থাকারই কথা।'

যেন একটা গল্প শুন্‌ছিলাম, এইভাবে আমি
'তারপর ?'

'তারপর বাবার আমলে সবি গেলো বদলে। বাব
ছোট ছেলে, তাই পৈতৃক সম্পত্তির ওপর বিশেষ ভর

চলে' গেলেন বিলেত—পাশ করলেন সিভিল্ সার্ভিস্। ফিরে' এসে দেখ্লেন, তাঁর অগ্রজ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে' নিরুদ্দেশ হয়েছেন। পরে জানা গেলো, তিনি হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব জান্বার জন্য জার্ম্মানিতে অবস্থান করছেন। তিনি বাডেন্-বাডেন্-এ মারা যান্।

'অথচ বাবা বিদেশেই থাকতেন বলে' গ্রামের বিষয়-আশয়ের অবস্থা ক্রমশই কাহিল হ'তে লাগ্লো। তারপর তো পদ্মাই সব নিতে সুরু করলে। ফলে চৌধুরীদের সঙ্গে মনোমালিন্যটাও মুছে' গেলো। সীতাপতি চৌধুরীর সঙ্গে বাবার যথেষ্ট বন্ধুতা ছিলো। তাঁকে আমি ছেলেবেলায় বারকয়েক দেখেছি। তিনি সমস্ত জীবন দেশেই কাটান্, কিন্তু অমন প্রতিভাদীপ্ত কপাল ও চোখ আমি কোনো মানুষের দেখি নি। মিকায়েলেঞ্জেলোর মুখের অবর্ণনীয় কারুণ্য ও তেজস্বিতা ছিলো তাঁর চোখে। তিনি বাজাতেন বীণ্—পুঁচ্কে সেতার বা এস্রাজ নয়—ও-সব তখনকার দিনে ছিলো না। অসংখ্য তারের ওপর তাঁর আঙুলগুলো যখন ঢেউয়ের মত অনায়াসে ভেসে বেড়াতো, তখন বাবার কোল ঘেঁষে বসে' মুগ্ধ হ'য়ে আমি তাকিয়ে থাক্তাম। মনে হ'ত, উনি যদি একবার ঐ আঙুলগুলো দিয়ে আমাকে স্পর্শ করেন, তা হ'লে আমি আগুনের মত দাউদাউ করে' জ্বলে' উঠ্বো।'

'উনি এখন খুব বুড়ো হয়েছেন—না ?'

'তখনো যুবক ছিলেন না, কিন্তু বার্দ্ধক্যের আগেই তাঁকে ধর্লে মৃত্যু। আমি তাঁর স্ত্রীকে দেখি নি, তাঁর একমাত্র সন্তান—তাঁর মেয়েই তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই মেয়ের কী হয়েছে জানি নে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠ্তে-উঠ্তে বাবা বল্লেন, 'সে যেন আর-এক জন্মের কথা ; তবু সীতাপতি চৌধুরীর কপাল আর চোখ আর আঙুলগুলো মনে পড়ে।'

প্রথম ও শেষ

জানিস্ নীলা, এই সীতাপতি চৌধুরীকে দেখ্‌তে পাবো ন
মনে-মনে আমার ভারি অভিমান হ'ল—বাবা যেন আমাকে ফাঁ
মস্ত একটা লাভ করে' ফেলেছেন, সে-লাভের যোগ্যতা আম
ছিলো না। অপুত্রক সীতাপতি চৌধুরীর রক্তের বংশ তো শে
গেছে, কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবী থেকে তাঁর মনের বংশও যে লে
গেলো, এই আমার দুঃখ। বাবার কথা শুনতে-শুনতে মনে
বল্‌জ্যাক্-এর পৃষ্ঠা থেকে কোনো চরিত্র নেমে এসে যেন আমা
দাঁড়িয়েছেন—সাত-শো বছর ধরে' তাঁর পূর্ব্বপুরুষরা রাজত্ব
প্রজাদের সঙ্গে নিছক প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ বজায় রেখে চলেছে
করেছেন ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ রাজ-কন্যাদের রূপে তাঁরা
তারপর এলো মানুষের সভ্যতার প্রথম শত্রু—ফরাসী বিদ্রোহ।
বর্ব্বর জনসংঘ গিলোটিনের নীচে—শুধু ষোড়শ লুইকে নয়,
শত-শতাব্দীর দুরূহ সাধনা লব্ধ সৌন্দর্য্য চর্চ্চাকে জবাই করবে
মাটির রাজত্ব কেড়ে নিলো, কিন্তু সাত-শো বছর ধরে' আলো
সৌন্দর্য্যে আনন্দে বিলাসিতায় যে-মন বেড়ে উঠেছে, তা'
খর্ব্ব করবে কে? তাই সেই নায়ক গ্রহণ করলেন নির্ব্বাসন,
থেকে বহুদূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এক ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদ,
আবদ্ধ হ'য়ে উৎসবের একটি বাতির মত কাটিয়ে দিলেন দীর্ঘ
মদের আর গানের নেশায়। সীতাপতি চৌধুরীর মনও সেই
বহুমূল্য বিদেশী ফুলের মত কাঁচের ঘেরা-টোপ-দে'য়া বাগানে
সেই মনকে অতি যত্নে লালন করতে হয়, তা'র স্পর্শ-অসহিষ্ণু সু
তা'কে পরমদুর্লভ করেছে। আজকালকার দিনে আর এমন
ভাই, যে সত্যি-সত্যি ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়, এমন পুরুষ
পদক্ষেপে স্বর্গ-মর্ত্ত্য অধিকার করে' তৃতীয় পা ফেলবার জায়গা

ঝাঞ্ঝা থেকে শিলাবৃষ্টির হাওয়া দিচ্ছে ;—মহার্ঘ ক্রিসেন্থিমাম্-এর দরকার নেই আর ; আমরা সব গাঁদা-ফুল বনে' গেছি ;—ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্মের যত উৎপাতই হোক্, অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যে আমরা ফুটে' উঠ্‌বোই।

এতক্ষণে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে, ভাই ;—বেহারা কখন্ এসে যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, টের পাই নি। ঘরের পক্ষে আলো যথেষ্ট নয়, দরজার কোণে, ভেল্‌ভেট-এর ভারি পর্দার আনাচে-কানাচে, হাল্কা নীল রঙে ছোপানো দেয়ালের গায়ে-গায়ে ভূতের মত অস্পষ্ট অদ্ভুত সব ছায়ামূর্ত্তি এই ঝাপ্‌সা হল্‌দে আলোর লুকোচুরি খেল্‌ছে। ঘরের 'সীলিং' অনেক উঁচুতে—এই দুর্ব্বল আলো সেখানে যেতে-যেতে হাঁপিয়ে পড়ে, সেখানে তাকালে মেঘ-মলিন আকাশেরই এক টুক্‌রো দেখ্‌ছি বলে' ভুল হয়। ঘরের মধ্যে একমাত্র উজ্জ্বল জিনিষ হচ্ছে মেঝের গালিচাখানা—সূর্য্যাস্তের মত খোলা লাল। রঙ্‌চঙে খেলো বিলিতি কার্পেট নয়, পারস্যের বিখ্যাত গালিচা—পাথরের মত ভারি, অথচ মাখনের মত নরম। দিল্লীর নবাবের বেগমরা তাদের পদ্ম-কলির মত পায়ের পাতা এই-সব জিনিষের ওপর ফেলতেন। না—তা'র চেয়েও উজ্জ্বল জিনিষ এ-ঘরে আছে, সে আমি। আমি যেখানে বসে' আছি, তা'র উল্টো দিকের দেয়ালে এক জোড়া দীর্ঘ আয়না ;—সেথবার ফাঁকে-ফাঁকে নিজকে তা'দের মধ্যে দেখে নিচ্ছি। এই ঘরের নিষ্প্রভ ম্লানতার মধ্যে আমাকে রোদের মুখে জ্বলে'-ওঠা তলোয়া'রের মত স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে,—খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাক্‌লে মনে হয়, আয়না যেন ফেটে পড়বে। এই মৃদু আবছায়ায় আবৃত হ'য়ে ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে বসে' এ-কথাই ভাবা সহজ যে আমি রাজকন্যা।

বাড়িটার বিশেষত্বই এই। এতে ঢুকলেই মনে হ'বে, চির-গোধূলির রাজ্যে প্রবেশ করলাম। দিনের বেলাতেও ঘরগুলো ছায়া-ঢাকা, রঙের

ও বেখাব কোমলতায় শান্ত ও শীতল। সেখানে বোদেব আসতে না বাশি-বাশি পদ্দাকে ফাঁকি দে'য়াব জো নেই, সূর্য্যদেব কোনো দিয়ে যদি চুপি চুপি তু' একটি ক্ষীণ বেখা পাঠিয়ে দিতে পাবেন তো ে ফলে, কোনো মন্দিব বা গির্জ্জাব অভ্যন্তবেব মত এই ঘবগুা আব হাওয়ায় এমন একটি অপূর্ব্ব শুচিতা, ও মেজাজে এমন চিব-প্র আছে যে কিছুকাল এখানে বস বাস কবলে যে-কোনো লোকেব ঃ বৃত্তি কবি-তুল্য মার্জ্জিত সূক্ষ্মতা লাভ কবতে পাবে।

বিবাট বনস্পতিব মত অটুট, অক্ষয় ও মহান এই বাড়ি. দূব প্রথম দেখেই এব গাঢ় ধসব বঙ আব বলশালী দৃঢতাব সুন্দব আমাব ভালো লেগেছিলো। এব চাবদিকে যদি খাল থাকতো, তা'ব ওপব টানা-সেতু, আব সেই সেতুব ওপব যদি সাবাদিন ধ্বনি শুনতে পেতাম, তবেই যেন স্বাভাবিক হ'ত। এই অ আমাকে নিজেব কল্পনা দিয়ে পূবণ কবে' নিতে হচ্ছে. এবং ে আবো-একটা অভাব, সেই মানুষেব অভাব, যা'কে দেখে আমাব মন-প্রাণ একসঙ্গে কথা কয়ে' উঠবে: 'সে যে আমি, সেই আমি

ববীন্দ্রনাথ একেবাবে আমাদেব মাথা খেয়েছেন—না বে? ইতি
তোব

সোনাবঙ,
২২শে বৈশাখ।

ছি-ছি, তুই নীলা, তুই? তোব মনে যদি এ-পাপই ছিলো তো আগে বলিস্ নি কেন? আমার কাছে লুকোবাব মত দুষ্মতিও তো

কেন যে তুই আমার কাছ থেকে ব্যাপারটা আগাগোড়া করে' গেছিস্, তা-ও আমি জানি। আমি যদি এব একটু ব

পেতাম, তবে এই দুর্গতির পাঁক থেকে তোকে ছিনিয়ে তুলে' আন্‌তামই, কোনো লজ্জা বা ভয় আমাকে আড়ষ্ট করতো না। তোর চিঠি পাবার আগের মুহূর্ত্তেও কেউ যদি আমাকে এসে বল্‌তো 'নীলা বিয়ে করছে', আমি তা'র মুখের ওপর হো-হো করে' হেসে উঠ্‌তাম। এত দেরি করে' জানালি! তা'র ওপর, কলকাতার বাইরে আছি, আমার অনুপস্থিতি তুই এমন হীন প্রয়োজনে ব্যবহার কর্‌বি জান্‌লে—তা হ'লে সোনারঙের সকল সৌন্দর্য্য আমি না-হয় উপভোগ না করে'ই মর্‌তাম, কিন্তু তোকে তো অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পার্‌তাম!

সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে আমাকে তুই কেমন করে' ফাঁকি দিলি! তোর মধ্যে কখনো এমন-কিছু তো লক্ষ্য করি নি, যা'তে তোর সম্বন্ধে কোনো গুরুতর সন্দেহের উদয় হ'তে পারে! কিন্তু এতে আশ্চর্য্যই বা কী আছে? তুই করছিস্ ব্যবসাদারি বিয়ে; বেণেরা যেমন সাত-পাঁচ, আগু-পিছু, ডান্‌-বাঁ ভেবে-চিন্তে, সাড়ে-ঊনিশ জনের পরামর্শ নিয়ে চা-বাগানের শেয়ার না কিনে' রেঙ্গুন থেকে সেগুনকাঠের চালান আনিয়ে তিনগুণ লাভের আশায় বসে' থাকে, তুইও তেম্‌নি দীর্ঘকাল চিন্তার পর কিনা বিয়ে-করাই ঠিক কর্‌লি। কারণ বিয়ে-করা নিরাপদ—জোলা বলেন, যুবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে নানা দিক থেকেই নিরাপদ। জীবনের উচ্ছলিত গঙ্গায় যৌবনের প্রবল বাতাসের মুখে কল্পনার রঙীন পাল তুলে' দিয়ে আমরা দু'জন একসঙ্গে নাও ভাসিয়েছিলাম, তুই যে এত শীগ্‌গিরই ক্লান্ত হ'য়ে বন্দরের আশ্রয় খুঁজ্‌বি, তা ভাবি নি। এত তাড়ার কারণ কী? পাছে আইবুড়ো মর্‌তে হয়, এই ভয় নয় তো? না, জোলা-উল্লিখিত অন্য-কোনো কারণে তোর সবুর সইলো না?

প্রথম ও শেষ

তোকে এই কথা লিখ্তে ঘৃণায় আমার নিজেরি গা কাঁটা দিয়ে উঠ্ছে। তোর সম্বন্ধে আমার এ কথা ভাবতে হচ্ছে! তা'র আগে সারা পৃথিবী কেন রসাতলে তলিয়ে গেলো না?

মুরারিবাবুর আমি অসম্মান করছি নে। তিনি সুদর্শন ও অমায়িক,—তাঁর স্ত্রীত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তোর দৈহিক কোনো বিলাসিতারই হানি হ'বে না। কিন্তু তোর মন? তুই কি আমায় সত্যি ক'রে বল্তে পার্বি যে সেই ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসামাত্র বিদ্যুৎ-বিদারণের মত অসহ্য আনন্দে তোর মনের আকাশ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিলো? তা-ই যদি হবে, তবে তোর মুখের দিকে তাকাতে আমার চোখ কি ঝল্সে যেতো না? তা হ'লে সেই মুহূর্তে প্রতিমা তোর কাছে নতুন ক'রে জন্ম নিতো,—প্রথম সূর্যোদয়ের অপূর্ব জ্যোতির্লেখা হ'ত তোর গাত্রবাস। নিজের চেয়ে যে প্রেম বড়, তা'কে ও কি গোপন করা সম্ভব? তন্দ্রার জড়িমায় আচ্ছন্ন হ'য়ে মন্থর গতিতে দিনের পর দিন কেটে যায়—সুখ-দুঃখের নির্দিষ্ট গণ্ডী এঁকে-এঁকে, লাভ-ক্ষতির হিসেব ক'রে-ক'রে। তারপর একদিন হয় প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাব; টুক্রো-টুকরো শান্তি দিয়ে মনের জন্যে যে-নীড় গড়েছিলাম, চক্ষের পলকে তা ছিঁড়ে' উড়ে' ঊনপঞ্চাশ বায়ুতে মিলিয়ে যায়, সমগ্র সত্তা সমুদ্র-মন্থনের মত দুঃসহ বেদনার আলোড়নে জেগে ওঠে, আত্মায় আগুন ধরে' যায়, তা'র দীপ্তি সর্ব্বাঙ্গে উচ্ছ্বলিত হ'য়ে ঝ'রে পড়ে;—দান্তের মত সকলকেই ব'লে উঠ্তে হয়: 'সেই দেবতার দেখা পেলাম, যিনি আমার চেয়ে বলশালী; যিনি এসে আমার ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করলেন।'

সেই দেবতার দেখা তুই পাস্ নি; সেই তীব্র দীপ্তিতে জ্বলে' উঠ্তে তোকে দেখি নি। আমাকে ক্ষমা করিস্ লালা, কিন্তু তোদের এ-বিয়েকে আমি আশীর্ব্বাদ করতে পারলাম না।

আর যা-ই করিস্, দয়া করে' প্রত্যুত্তরে সংসারধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমাকে সারগর্ভ উপদেশ দিতে বসিস্ না। সে-গুলো আমি জানি; এবং এ-ও মানি যে পাত্রবিশেষে তা'র সার্থকতা আছে। কিন্তু জানিস তো, সকলের জন্য সব কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু আমরা যেন আমাদের সাধ্যানুযায়ী মহত্তম কর্ত্তব্যকেই অবলম্বন করি, বিধাতা আমাদেরকে দিয়ে এ-ই চান্। ধর্, রবীন্দ্রনাথ যদি অধ্যাপক হ'তেন, তা হ'লে খুব উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপকই হতেন—হয়-তো বাঙ্লা দেশের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বলে' তাঁর নাম থেকে যেতো, কিন্তু পৃথিবীর পক্ষে সেটা কি খুব শুভ ঘটনা হ'ত? সংসারধর্ম্ম যেমন, অধ্যাপনাও তো তেম্নি একটা গুরুতর কর্ত্তব্য। কিন্তু বিধাতা যাঁকে বড় কবি হ'বার মাল-মশ্লা দিয়ে পাঠালেন, তিনি যত ভালো অধ্যাপকই হোন্ না কেন, কর্ত্তব্য তাঁর সম্পন্ন হ'ল না; যতদিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁর কবিত্বশক্তির পরিপূর্ণতম ব্যবহার না করছেন, ততদিন তাঁর জীবন ব্যর্থই রয়ে' গেলো।

তুই কি স্বপ্নেও ভেবেছিস্, নীলা, যে বিধাতা তোর এ-আচরণ ক্ষমা করবেন? আমার সাম্নে এই কাগজের টুক্রোর মত স্পষ্ট করে' দেখ্তে পাচ্ছি যে নিজ হাতে তুই তোর জীবনের সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ কর্লি! 'মাটি কাটি' যে-কোহিনূর লাভ করা যায়, তা দিয়ে কাগজ-চাপার কাজ দিব্যি চলে; কিন্তু কাগজ চাপার ব্রতে কোহিনূর যদি তা'র জীবন উৎসর্গ করে তো তুই কি তা'কে প্রশংসা করবি? তোকে দিয়ে বিবাহিত জীবনের সকল দায়িত্ব উৎকৃষ্ট-রূপে সম্পন্ন হ'তে পারে—তা আমি অস্বীকার করছি নে; কিন্তু সাধারণ স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের চেয়ে অনেক বড় ও সুন্দরতরো কর্ত্তব্যের উপযুক্ত তুই;—তুই মহামূল্য বিরলজ্যোতি হীরক-খণ্ড; কাগজ চাপাদের দলে ফাস্ট্ ক্লাস্ ফার্স্ট্ হ'লেও নিজকে তুই অপমান বই কিছু কর্লি নে।

কোলাকুলি হ'তে থাকে—তেমনি এই ছ' বছর ধরে তুই আর আমি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় জড়িত হ'য়ে বড় হ'য়ে উঠেছি। আকাশে বাষ্পকণা আর সূর্য্যালোক দুই-ই তো থাকে, কিন্তু দু'য়ের যখন মিলন হয়, তখনই দেখা দেয় ইন্দ্রধনু। তুই আর আমি মিলে' সেই মনোহরণ ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছিলাম;—তা'রি অন্তরালে ছিলো আমাদের মনের সীমাহীন রাজত্ব—এক মুঠো নীল কাপড়ের মত কূলহীন, ক্ষয়হীন, মৃত্যুহীন আকাশ।

আমাদের এই বন্ধুতাই কি এবারের এ-জন্মের মত পক্ষে যথেষ্ট ছিলো না, নীলা? আমরা দু'জন না-হয় চিরন্তন নেপথ্যে জীবন কাটিয়ে দিতাম —না-হয় চল্‌তো শুধু আয়োজন, শুধু সজ্জা—রঙ্গমঞ্চে নায়িকাদের আবির্ভাব না-হয় না-ই হ'ত! যা'কে আমরা বাস্তব ব'লি, সেখানে যদি শাদা খাতায় ধূলো জমে' ওঠে তো উঠুক্; আমাদের মনের যিনি কবি, তিনি তো নদীর জলে ভাঙা চাঁদের টুক্‌রোর মত শত-শত গীতি-কবিতার জাল বুনে' যাচ্ছিলেন! সেই জাল ছিঁড়ে' বেরিয়ে আস্‌বার কী প্রয়োজন ছিলো তোর? হৃদয়ের রক্তে যাঁকে অনুভব করেছিস্, একদিন তাঁকে প্রত্যক্ষ কর্‌বিই, এইটুকু আশা কর্‌বার সাহস তোর হ'ল না? আশা পরিপূর্ণ না হ'লেই যে তা ব্যর্থ হ'য়ে যায়, এমন তো নয়। কেরোসিন্ লণ্ঠনের অতি সস্তা বাস্তবের চাইতে সূর্য্যোদয়ের অন্তহীন প্রতীক্ষাই কি বরেণ্য নয়? সূর্য্য যদি কখনো দেখা না-ও দেন্ তবু সেই ব্যর্থতা নেপোলিয়ন্-এর জীবনের ব্যর্থতার মতই মহান্। এই ব্যর্থতার মূল্য তুই দিতে পার্‌বি নে, এ আমি আশা করি নি।

কল্‌কাতায় আমি যত ছেলের সঙ্গে মিশেছি, তা'দের অনেকের চোখের দৃষ্টিই আমার কাছে অনেক অনুক্ত কাহিনী উদ্‌ঘাটন করেছে। রূপে ও বিদ্যায়, বংশ-গৌরবে ও পদমর্য্যাদায় তা'রা নিকৃষ্ট নয়।

কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়েছে, কোথায় যেন কি অভাব রয়ে' গেছে, আমাকে দেখাবাব জন্যে এরা একটি বিশেষ ভঙ্গী অর্জ্জন কবেছে; সেই ভঙ্গীটিই মনোরম, আদৎ লোকটি নয়। এবা যা'কেই বিয়ে করুক্, বিয়ের পব সেই ভঙ্গীটি যা'বে খসে', এবং তখন হবিমতিব স্বামী আব তা'দেব মধ্যে বিশেষ-কোনো পার্থক্য থাকবে না।

তোব মত আমি কোনো ভুল কব্‌বো না। স্বর্গে যাঁব সঙ্গে আমাব বিয়ে হ'য়ে গেছে, পৃথিবীতে তাঁব দেখা পাওয়া মাত্র আমি চিনে' নিতে পাব্‌বো। এক-এক সময় ইচ্ছে কবে, মাদ্‌মোযাজেল্ মোপ্যাঁব মত ছদ্মবেশে বেবিয়ে পডি—তাঁব অন্বেষণে। কিন্তু মন কবে বাবণ। ফুলের বুকে গন্ধেব মত যাঁব অনুভূতি সমস্ত অন্তবাত্মা জুড়ে' আছে বাইরে তাঁকে খুঁজ্‌বো কোথায়? শুভলগ্ন যেদিন আস্‌বে, দুয়ারে করাঘাত পড়্‌বেই—বিজয়ী বাজাব মত এসে তিনি আমাকে অধিকাব কবেনে। আব, যদি তিনি নাই আসেন—না-ই বা এলেন! তবু তাঁব প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত-জপ কবে' আমবণ আমি জেগে বসে' বইবো—তুই দেখিস্।

তোব পূর্ব্বজন্মের [illegible]—

[illegible]

-নং [illegible] স্ট্রীট,

কলকাতা,

১৮ই চৈত্র।

চির-প্রিয়তমা লীনা,

ওপবেব ঠিকানা দেখেই বুঝবি যে ইতিমধ্যে গোত্রের সঙ্গে-সঙ্গে আমাব গৃহও বদল হ'য়ে গেছে। এবং সেই জন্যই তোকে চিঠি লিখতে এত দেরি হ'ল। তামাসা মন্দ হ'ল না, কিন্তু তোকে নেমন্তন্ন কবলেও তো তুই আস্‌তিস্ না!

প্রথম ও শেষ

প্রথমেই তোকে জানানো দরকার যে বিয়ে করে' আমি মোটেও অসুখী হই নি। আমি জানি, সুখের নামে তুই নাসিকা কুঞ্চিত কর্‌বি। তোর মতে ও জিনিষটা পশুদের উপভোগ্য। কিন্তু সত্যি কি তাই, ভাই? কল্পনার আগুনের মেঘ তোকে ঘিরে' আছে বলে' শান্তদীপালোকিত গৃহকোণের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য তোর চোখেই পড়্‌লো না। সেখানে উন্মাদনা না থাক্‌, শান্তি তো আছে; উচ্ছৃঙ্খলতা না থাক্‌, অস্বাস্থ্যও নেই। প্রতিদিনকার সুখদুঃখের অজস্র রেখা-সম্পাত এই গৃহকে বিচিত্র করেছে; স্বর্গের আনন্দ্য জ্যোতি সেখানে পড়ে না, কিন্তু এই পৃথিবীরই ফসলের ক্ষেত থেকে, গোধূলির আকাশ থেকে সোনার আলো সেখানে ঝরে' পড়ে;—অতসীর হাসির মত তা চির-পরিচিত হ'লেও চির-সুন্দর।

বিয়ে-করার জন্য কারো কাছে কোনো অপরাধ করেছি ব'লে যদি আমার মনে হ'য়ে থাকে, সে তোরই কাছে। কিন্তু আমি তো যেমন ছিলাম, তেম্‌নিই আছি, তেম্‌নিই থাক্‌বো। পরিবর্ত্তন যা-কিছু হয়েছে বা হ'বে, তা এত বাহ্যিক ও এত সামান্য যে সেই উপলক্ষ্যেই যদি তোর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হ'তে হয়, তবে স্বামী একদিন গোঁফ কামিয়ে বাড়ি এলে স্ত্রীর উচিত তাকে চিন্‌তে না পারা। তুই যেটাকে প্রকাণ্ড-তম সর্ব্বনাশ বলে' ভাব্‌ছিস্‌, তা'র চেয়েও বড় সর্ব্বনাশ আমার হ'তে পার্‌তো—বসন্ত হ'য়ে আমার মুখ কুৎসিত হ'য়ে যেতে পার্‌তো। কিন্তু সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে কি আমি তোর কাছ থেকে একটুও দূরে সরে' যেতাম? এই ঘটনাটাকেই বা অত বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিস্‌ কেন? তোর বন্ধু এখনো তোর—সর্ব্বান্তঃকরণে তোর, চিরকাল তোর।

তুই যদি আমার অবস্থাটা একটু পরিষ্কার করে' ভেবে দেখ্‌তিস্‌,

তবে তোর চিঠির উগ্রতা নিশ্চয়ই অনেক কমে' আসতো। এ-কথা তুই ভুলে' গিয়েছিলি যে তোর মত মা-বাবার আশ্রয় আমার নেই; পরিজন বল্‌তে আমার এক মামা, তা তিনিই বা কতকাল আমার ভার বইবেন? বি-এ পাশ-করার পর আমার পক্ষে দু'টি পথ খোলা ছিলো—ইস্কুলটিচারি আর বিয়ে। দুই-ই সমান। জলের কুমীরকে এড়িয়ে ডাঙার বাঘের মুখেই যদি আত্মসমর্পণ করে' থাকি তো এমন কী অপরাধ করেছি, বল্?

অবিশ্যি বিয়েটা তেমন-কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপারও নয়। সত্যি ভাই হাওয়ায় উড়্‌তে-উড়তে আমার ডানা বুজে' এসেছিলো; একদিন সুদূরস্পর্শী ভবিষ্যতের বন্ধ্যা অনিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে ক্লান্তিতে আমার দুই চোখ আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো, ব্যাকুলভাবে হাত বাড়াতে প্রথম যাঁর হাতের সঙ্গে হাত ঠেক্‌লো, তিনিই মুরারিবাবু। ভাব্‌লাম, [illegible] হ'লেই বা দোষ কী?

এখন ভেবে দেখ্‌ছি, মোটের ওপর ভালোই করেছি। [illegible] ভালোবাসতে না পারি, তাঁর প্রতি মধুর মমতা জন্মাতে, [illegible] হয়-তো কোনোকালে আমাকে প্রেমের অমরাবতীতে পৌঁছুবে [illegible] তিনি আমাকে ভালোবাসতে না পেরে থাকেন, অপরিমাণ স্নেহ [illegible] এবং মা-কে হারিয়েছি পর থেকে এই স্নেহ [illegible] ওপর [illegible] লোভ সব চেয়ে বেশি। তা-ই পেয়ে আমি তৃপ্ত। [illegible] আমাদের মধ্যে নেই, যা'তে প্রিয়র পায়ের শব্দ শুন্‌লে বুক 'দুপ দুপ' করে' ওঠে, তা'র একটুখানি হাতের লেখা দেখ্‌লে শরীরের সমস্ত রক্ত উঠে' আসে মুখে। এখানে প্রবল আবেগ-ঝঞ্ঝার দুরন্ত মাতামাতি নেই, এখানকার কুঞ্জ-কুটীরে মৃদু মমতার কোমল-মলয়-সমীরের নিত্য-সঞ্চালন। মুরারিবাবু লোক ভালো; শিষ্টতায়, মিষ্ট-আচরণে, বিনয়-বচনে তিনি

বাস্তবিক ভদ্রলোক-আখ্যার উপযুক্ত। তাঁর প্রকৃতি কুয়োর জলের মত ; কালভেদে উষ্ণতা ও শৈত্য দুই-ই তা'র গুণ। চাকর-বাকরদের আদেশ কর্‌বার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা আসে না, এবং নাটুকেপণা না ক'রে'ও তিনি স্নেহশীল হ'তে জানেন। এই ধরণের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলা খুব সহজ, স্বাধ ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র হানি না করে'ও তার সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে নে'য়া যায়। এইভাবে জীবন তো বয়ে' চলুক ;—স্বপ্ন যদি কিছু থেকে থাকে, সে তো আমার আছেই।

শুনে' খুসি হ'বি, এ-বাড়িতে একটা পিয়ানো আছে। মুরারিবাবু শুধু যে বাজাতে জানেন তা নয়, ইয়োরোপীয় সঙ্গীত-সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও প্রচুর। তা ছাড়া, লাইব্রেরি-ঘরে ঢের বই আছে, এবং তা'র বেশির ভাগই কবিতা। এবং সেই বইগুলির পৃষ্ঠা ময়লা।

আমার সম্বন্ধে যা-কিছু জানবার মত, তা তোকে জানালাম। তোর এই এক মাসের সব খবর জানতে উৎসুক,

নীলা।

সোনারঙ,

কল্যাণী,
২০শে জ্যৈষ্ঠ।

সর্ব্বগুণসম্পন্না বন্ধু আমার—দোষের মধ্যে শুধু এই যে তোর চিঠিগুলো বড্ড ছোট হয়। এ-হিসেবে তুই একেবারে বৌদ্ধ ; হিন্দু-ধর্ম্মের চমৎকার আড়ম্বর, বর্ণ ও ধ্বনির অপূর্ব্ব প্রাচুর্য্য তোর মধ্যে নেই ; কথার ভেতর দিয়ে নিজকে তুই যতটা প্রকাশ করিস্, নীরবতার মধ্যে নিজকে আড়াল করিস্ তা'র চেয়ে বেশি। মনে করিস্ নি যে তোর বিবাহিত জীবনের আরো বৃত্তান্ত জান্‌তে আমার কৌতূহল হচ্ছে, কারণ সে-বিষয়ে এমন-কিছু তুই বল্‌তে পার্‌বি নে নিশ্চয়ই, যা আমি জানি

নে বা ভাবতে পারবে নে। আর, যদি বা কিছু থাকে, তা তোর মুখেই শোনা যা'বে। চিঠির মস্ত একটা অসুবিধে এই যে পত্র-লেখক প্রতিটি কথার সঙ্গে-সঙ্গে তদনুযায়ী মুখভঙ্গী খামে পুরে' পাঠাতে পারে না: কণ্ঠস্বরেরই ওঠা-নামা কম্পন-বিকৃতি ইত্যাদি আছে, হাতের লেখার ও-সব বালাই নেই। মুখের চেহারা, গলার স্বর ও বক্তব্য বিষয় —এই তিনে মিলে' হয় গল্প-বলা, চিঠিতে গল্পটি আসে সেজেগুজে, ভদ্রলোক হ'য়ে, কিন্তু হারায় বলা-কে। প্রেমের কবিতা-পড়া ও প্রেমে-পড়ায় যেমন পার্থক্য, চিঠি ও মুখের কথাতেও তেমনি। তোর মুখামৃত পান করবার জন্য না-হয় একদিন তোর বাড্ন্ স্ট্রীট-এর বাড়িতেই যাওয়া যা'বে—কী বলিস্?

কারণ আমাদের শিগগিরই কলকাতায় 'ফিরে' যাবার কথা হ'চ্ছে। পূজো অবধি এখানে থাক্‌বার কথা ছিলো—বাবা বল্‌ছিলেন, এই [illegible] শেষ, তখন দেখা-শোনা আলাপ-পরিচয় শুধু চোখ-কানের নয়, [illegible] বা হোক্। কিন্তু ইতিমধ্যে খবর এলো যে এক মামলার তদ্বির করতে বাবাকে যেতে হ'বে বিলেত। মধ্য-প্রদেশের এক রাজার সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে, তাঁর ছেলে নেই, কাজেই সিংহাসনপ্রাপ্তি নিয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আর খুল্লতাতে ঘটেছে বিরোধ। ব্যাপার জটিল,—পার্লিয়ামেন্ট-এও এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এবং ইণ্ডিয়া-অফিসের পরামর্শ নিতে অগ্রজের পক্ষ হ'য়ে বাবা জুলাইর মাঝামাঝি পাড়ি দিচ্ছেন। তাই বড় জোর আর মাসখানেক আমরা এখানে আছি।

ইস্ যাঃ—আসল খবর দিতেই ভুলে' গেছি। বাবার সঙ্গে আমিও বিলেত যাচ্ছি: বাবা নিজে থেকেই বলেছেন। দিন তিন-চার আগে এক সকালবেলায় তিনি এসে আমার ঘরে উপস্থিত। বিশেষ-কোনো জরুরি কথা না থাক্‌লে সকালবেলাতে তিনি বাড়ির
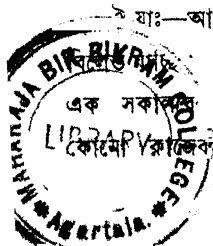
কারু সঙ্গে দেখা করেন না, তাই জিজ্ঞেস্ করলাম, 'কী খবর, বাবা?'

প্রত্যুত্তরে বাবা তাঁর আসন্ন বিলেত-যাত্রার কথা বল্‌লেন। অথচ এ সংবাদের সঙ্গে আমার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবিষ্কার করতে না পেরে আমি বলবার জন্য কথা খুঁজছিলাম, এমন সময় তিনিই আবার বল্‌লেন, 'তুইও চল্ না আমার সঙ্গে।'

তখন এ-টা ভেবেই আমার আশ্চর্য লাগলো যে এ-কথা আমার মনে আগে কেন উদয় হয় নি? বললাম, 'বেশ তো। বোসো না।'

বাবা একটা নীচু কাউচ-এর মাঝখানে বসে' পড়লেন। আমি তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি যাবো? কেন?'

'প্রধানত বেড়াতে। গৌণত আমার সঙ্গী হ'তে। যে-উপলক্ষ্যে যাচ্ছি, তা'তে কাজ স্বল্প, অবসর প্রচুর। তা ছাড়া, যাওয়া-আসার দেড় মাস একেবারে ফাঁকা। এবং সে-বয়েস এখন আর আমার নেই, যা'তে নতুন লোকের সঙ্গে চট্ করে' আলাপ করে' নে'য়া যায়। সে প্রবৃত্তিও নেই। তাই তোকে নিতে চাচ্ছি। মাস তিনেকের ব্যাপার,—এ ক'টা দিন তোর মা হায়দ্রাবাদে তাঁর ভায়ের কাছে বা কলকাতায় আমাদের বাড়িতে থাক্‌তে পারেন—যেমন তাঁর খুসি। আমার অভিপ্রায় এইটুকুই, তোর যদি আরো কোনো থাকে, আমায় জানাতে পারিস্।'

'আমার যাওয়াই যদি ঠিক হ'ল, তবে মাস-তিনেকের মধ্যেই ফিরে' আসতে হ'বে, এমন-কোনো প্রয়োজন বা আকর্ষণ তো আমার দেশে নেই।'

বাবা হেসে বল্‌লেন, 'আচ্ছা বেশ, অক্‌স্‌ফোর্ড্-এ তা হ'লে তোর ভর্তির ব্যবস্থা করি। সময়টাও ঠিক পড়েছে। না প্যারিস্?'

'বাবা, তুমি আমার মনের কথা কী করে' হুবহু বুঝতে পারো, বলো তো? আমি যে অক্‌স্‌ফার্ড-এর কথাই ভাব্‌ছিলাম।'

এমন সময় গোলাপী এলো আমার কোকো-র পেয়ালা নিয়ে। জিজ্ঞেস্ কর্‌লাম, 'এক পেয়ালা খা'বে, বাবা?'

'আন্‌তে বল্।'

কোকো খেতে-খেতে বাবার সঙ্গে অনেক বিষয়েই আলাপ হ'ল। বহুকাল কথা বলে' ও শুনে' অমন সুখ পাই নি। অমন প্রাণ-খোলা সরল, অথচ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার কথা বাবার মুখেও কম শুনেছি। তিনি আমাকে যা বল্‌লেন, তা'র সারসঙ্কলন কর্‌লে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায়:

'দেখতে তো পাচ্ছিস্, মনুষ্যজাতি ক্রমেই অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তা'র কারণ শুধু এই যে মানুষে-মানুষে প্রভেদ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। রাজা ও প্রজায় আসমান্-জমীন্ ফারাক্ আর নেই, সমাজপতির দিন গেছে, সমাজ-চালনায় আজকাল সবার সমান দাবী। গৃহেও তেম্‌নি পিতা তা'র অবিসম্বাদিত কর্তৃত্ব হারিয়েছে। একজন মানুষকে ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কর্‌বার জন্য জনগণ আর পশুতুল্য জীবন যাপন কর্‌তে রাজি নয়,--সবাই মোটামুটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কর্‌বে, বর্তমান যুগের এই হয়েছে লক্ষ্য। ফলে হয়েছে কী, উৎকৃষ্ট বলে' কোনো জিনিষ আর থাক্‌ছে না—সবই মাঝারি। আশি টাকা তোলার আতর আজকালকার বাজারে বিকোয় না, কারণ তা কেনবার মত সঙ্গতি কারুরই নেই; ন' আনা দামের অগুরুর খুব চল্—যা রাণী থেকে কেরাণী পর্য্যন্ত সবাই কিন্‌তে পারে।

'এই উৎকর্ষের অভাব দেখ্‌বি সবখানেই। পাঁচ টাকা দিয়ে বই কিনে' দু' দিন বসে' বিরাট উপন্যাস পড়বার সময় ও সামর্থ্য নেই,

কারো ; আট আনা পয়সা খরচ ক'রে দু'ঘণ্টায় সেই বইখানা ফিল্‌ম্-এ দেখে আসবে। এমন দিন হয়-তো আসবে, যখন কেউ আর বই লিখবে না ; জনমণ্ডলীর শিক্ষা ও আমোদের ভার ন্যস্ত হ'বে ফিল্‌ম্-ওয়ালাদের ওপর ; তাঁরা অবিশ্রান্ত খেলো রসিকতা আর শস্তা ন্যাকামির পসরা বহন ক'রে' জনগণের সঘন করতালি লাভ করবেন। কবিতা পৃথিবী থেকে উঠে' যা'বে, কারণ সবাই তা পড়ে না, গান আর ছবি একেবারে লুপ্ত হ'বে, কারণ ও-সব বোঝবার মত কান বা চোখ যাঁদের আছে, তাদের সংখ্যা হাজার-করা একও নয়। সেই বৈচিত্র্যহীন জগতে মানুষের স্থূলতম প্রবৃত্তিগুলি ছাড়া সব যাবে মরে' ; ফলে সব মানুষই এক রকম হ'য়ে যাবে—অর্থাৎ, মানুষে আর কলে খুব বেশি তফাৎ থাকবে না।

'সুলভতার এই নব্য-তন্ত্রে আমাদের কোনো স্থান নেই—তোর আর আমার। আশা করি নিজের সম্বন্ধে তুই সম্পূর্ণ সচেতন। তোর রক্তের মধ্যে যে-শ্রেষ্ঠতার বীজ আছে, এবং এতদিনকার শিক্ষা ও অনুশীলন যা'র বিকাশের সহায়তা করেছে, আশা করি তুই তা'র অমর্যাদা করবি নে। আত্ম-সমর্পণের একটা প্রবল মোহ আছে—সেটাও সুলভ। তোর পক্ষে তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারা উচিত। বিশেষত আমাদের দেশে এ-ভয় খুব বেশি। আমরা পরাধীন ও সেন্টি-মেণ্টাল্ জাত ; একটু কিছু হ'লেই "জয় মা" বলে' বন্যায় গা ঢেলে দিতে পারলেই আমরা খুসি। তুই আর আমি সব ক্ষণিকের উত্তেজনার ওপরে ; জীবনে ও আচরণে, বুদ্ধিতে ও চিন্তায় আমরা মহার্ঘ সৌন্দর্যের উপাসক ; বাঙলা দেশ আমাদের মনের মাতৃভূমি নয়, এবং দৈবাৎ আমরা দু' শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করে' ফেলেছি !'

বাবার কথা শেষ পর্যন্ত শুনে' আমি বললাম, 'বৃথাই আমাকে এত কথা বললে, বাবা। বিয়ের চিন্তা এখনো আমার মন থেকে ঢের দূরে।

এবং যদি কখনো সে-চিন্তার উদয় হয় তো যথাসময়ে তোমাকে তা জ্ঞাপন কর্‌তে ভুল্‌বো না।'

'সে আমি জান্‌তাম। কিন্তু তুই যখন বিলেতে পড়্‌তে যাওয়া ঠিক কর্‌লি, তখন তোকে এ-কথা না বলে'ও পার্‌লাম না।—বুঝলি তো?'

'বুঝেছি বই কি। কিন্তু আজকাল যে বাঙালী ছেলেরাও মেম বিয়ে করে' আসে না, বাবা!'

বাবা শুধু বল্‌লেন, 'বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার!'

কাজেই দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌, জুলাইর মাঝামাঝি আমরা দেশ ছাড়্‌ছি, তাই মাস খানেকের মধ্যেই কল্‌কাতায় ফেরা দরকার। জাহাজে ওঠবার আগে তোর সঙ্গে অল্প কয়েক দিনের জন্যে দেখা হ'বে, এবং সেই ক'টি দিনের প্রতি আমি উৎসুক হৃদয়ে তাকিয়ে আছি। তিন চার বছরের মত তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'বে এবার—ফিরে' এসে তোকে একেবারে গৃহলক্ষ্মীরূপ না দেখি, তা হ'লেই বাঁচি। এ ক'টা বছর আমি আর যা-ই করি, হৃদয়বৃত্তি চর্চ্চা করবার অবকাশ পাবো না—যদি অবিশ্যি কোনো ইংরেজ ছোক্‌রার প্রেমে না পড়ে' যাই।

ঠিক ঐ কাজটিই যেন আমি না করি, বাবা সেদিন স্পষ্ট করে' তো এ-কথাই বলে' গেলেন। আমার মনের কথা যদি জিজ্ঞেস করিস তো বল্‌তে পারি, সে-ভয় আদৌ নেই। জানি, তিনি সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে-কাছে ঘুরে' বেড়াচ্ছেন, তবু তাঁকে দেখ্‌তে পাই নে কেন? আমরা দু'জন অন্ধকার রাত্রিতে মশাল হাতে নিয়ে অসংখ্য নরনারীর মধ্যে পরস্পরকে খুঁজে' বেড়াচ্ছি;—কতবার হয়-তো পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছি, অন্ধকারে চিন্‌তে পারি নি। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে মশালের আলোকে তাঁর মুখ তারার মত জ্বলে' উঠ্‌বে, অমনি সব সংশয় দূর হ'বে; সকল অন্বেষণের হ'বে পরিসমাপ্তি।

প্রথম ও শেষ

বাবা আমার ঘর থেকে চলে' যাওয়ার পর সেদিন অনেকক্ষণ চুপ করে' শুয়ে' ছিলাম, হঠাৎ কী মনে হ'ল, জানিস? মনে হ'ল, আর দেরি নেই—সে শুভ-মুহূর্ত্ত সমাগতপ্রায়, আমার এই বিলেত-যাত্রার প্রস্তাবনা যেন তাঁ'রি দূত-রূপে এসেছে। এই যে আমি তিন-চার বছরের মত তাঁকে পাবার সম্ভাবনা অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছি—এত বিলম্ব কি তিনি সইবেন? কলম্বাস-এর সেই অকস্মাৎ-আবির্ভূত বিহঙ্গ-শ্রেণীর মত আমার এই প্রবাস-যাত্রার সঙ্কল্প যেন পরম-আকাঙ্ক্ষিত উপকূলের নিকটবর্ত্তিতা নির্দ্দেশ করছে; নিজের তপোবলে তাঁকে আবিষ্কার করবার আনন্দ আমাকে দান করবেন বলে'ই সেই স্বয়ম্প্রকাশ আত্ম-গোপন করে' আছেন।

এখানকার এই নির্জ্জনতায় নিজকে বড় বেশি প্রাধান্য না দিয়ে উপায় নেই। এখানে আমিই আমার একমাত্র সঙ্গী। নিজের মনের এই-সব চঞ্চলতা নিয়ে বিলাস করতে-করতে সন্দেহ হয় যে আমি এদের প্রতি যতটা মর্য্যাদা আরোপ করছি, সে-মূল্য অন্য লোকেও দিতে প্রস্তুত কিনা। কলকাতায় ফিরে' যেতে ইচ্ছে করছে; আমার মনের এই অস্পষ্ট দ্বন্দ্ব-বিধিগুলো তুই-ই একা বুঝতে পারতিস। নিজের ওপর বিশ্বাস যখন টলমল্ করে' উঠছে, তখন তোর চোখের প্রশান্ত নির্ম্মলতার দিকে তাকিয়ে হয়-তো আশ্বাস পেতাম। আকাশ আর পদ্মানদীকে নিয়ে দিন কাটাতে-কাটাতে মন আমার হাঁপিয়ে উঠেছে।

এই কথা লিখতেই মনে পড়লো যে কালকে বেশ মজার একটা ব্যাপার হ'য়ে গেছে। সকাল থেকেই হাওয়ার তাড়া খেয়ে আকাশে মেঘগুলো ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্ছিলো। দুপুরটি ছিলো ছায়া-ঢাকা, স্নিগ্ধ। বৃষ্টি নেই, অথচ বাতাস বেশ জোরে বইছে। ধূসর আকাশ আর সজল বায়ুতে মিলে' মনের ওপর যে একটি কোমল আবেশের

সঞ্চার করে, তা কাটিয়ে ওঠ্‌বার জন্য আমি টমাস্ ব্রাউন্-এর 'রিলিগিয়ো মেডিচি' পড়্‌তে বস্‌লাম। কিন্তু প্রথম কয়েক লাইন্ পড়ার পর মন ও চোখ দুই-ই ক্লান্ত হ'য়ে এলো। দূর ছাই—বরঞ্চ বাইরে থেকে খানিকক্ষণ ঘুরে' আসি। আমাদের বড় দীঘিটার জল মেঘের ছায়ায় কালো হ'য়ে নিশ্চয়ই কূলে-কূলে টল্‌মল্ করে' উঠ্‌ছে!—বইখানা হাতে করে'ই বেরিয়ে পড়্‌লাম।

দীঘিটা আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানকটা দূরে। তিনটে বড়-বড় আঙিনা পেরিয়ে সুবৃহৎ দুর্গা-মণ্ডপ—বহুকালের অব্যবহারে ম্লান। তারপর কয়েক ঘর মালী-বাড়ি—আমাদেরই রায়ৎ। সেই বাড়ি-গুলো পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা-জায়গা;—বিকেলে মালীর ছেলেরা ওখানে হা-ডু-ডু খেলে। তারপর দীঘি—মস্ত দীঘি, ওপারে পানের বরজ্ একটা,—এধারে বাঁধানো ঘাট। সারা গ্রামের পানায় জল এই দীঘি থেকে সর্‌বরাহ হয়। ঐ ঘাটে দাঁড়িয়ে পদ্মার রূপালি ঝিকিমিক চোখে পড়ে। লোকে বলে, মাটির তলা দিয়ে পদ্মার সঙ্গে এই দীঘির গোপন যোগাযোগ আছে; তাই এর জল অত মিষ্টি।

সকাল-সন্ধ্যায় এই দীঘিতে লোক-চলাচলের অভাব হয় না; কিন্তু এই ভর্-দুপুরবেলা চার্‌দিক শূন্যতায় ঝাঁ-ঝাঁ করছে; এত নীরব যে চড়ুই পাখীদের ডানার' ঝাপ্‌টানিও শুন্‌তে পাওয়া যায়। বাঁধানো ঘাটের নীচের দিকটার একটা সিঁড়িতে বসে' আমি হাতের বইখানা খুল্‌লাম।

হাওয়ার দাপটে দীঘির জল ছোট-ছোট ঢেউ তুলে' আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়্‌ছিলো; তা'দের ছল্‌ছলানি শুন্‌তে-শুন্‌তে কি আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম, না আমার মন বইয়ের মধ্যেই ডুবে' গিয়েছিলো, তা এখন বল্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু হঠাৎ জলের মধ্যে

প্রথম ও শেষ

ভয়ানক একটা তোলপাড়ের শব্দ শুনে' আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। তাকিয়ে যা দেখ্‌লাম তা এই :

আমি যেখানে বসেছিলাম, তা'র একটু দূরে একটা জাম্‌রুল-গাছ, তা'র কয়েকটা পত্র-ঘন শাখা সামনের দিকে ঝুঁকে' পড়ে' দীঘির জল-স্পর্শ কর্‌তে উদ্যত হয়েছে ;—মাঝে-মাঝে দু'একটা শুক্‌নো পাতা টুপ্‌টাপ্ করে' খসে' পড়্‌ছে। সেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে একটা লোক বসে' ছিপ্ দিয়ে মাছ ধর্‌ছে—এতক্ষণে আমার চোখে পড়্‌লো। এইমাত্র বোধ হয় বেশ বড় রকমের একটা মাছ টোপ্ গিলেছে। এদিকে লোকটা প্রায় মাটিতে শুয়ে' পড়ে' মাছটাকে ডাঙায় তুলে' আন্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে ; ওদিকে আবার মাছটাও এই মর্ম্মান্তিক বন্ধন থেকে ছাড়া পাবার জন্য নিদারুণ ছটফটানি সুরু করে' দিয়েছে। তা'রি ফলে ঐ তোলপাড়।

আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, ততক্ষণে আমাদের মৎস্য-শিকারীর জয় হয়েছে ; মস্ত একটা রুই মাছ ডাঙায় পড়ে' হাঁপাচ্ছে এবং লোকটা নিচু হ'য়ে তা'র মুখ থেকে বড়্‌শির টোপটা খসাচ্ছে। মুহূর্ত্তে আমার অধিকার-বৃত্তি সজাগ হ'য়ে উঠ্‌লো ; লোকটার কাছে এগিয়ে এসে আমি রুক্ষ-স্বরে বল্‌লাম, 'এই, তুমি এ-দীঘি থেকে মাছ ধরছো যে বড় ? জানো—'

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে লোকটা আমার দিকে মুখ ফেরালো, এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমি চুপ করে' যেতে বাধ্য হ'লাম। আশ্চর্য্য রকম বড় ও পরিষ্কার দুই চোখ মেলে' সে একবার আমার দিকে তাকালো ;—সে-দৃষ্টিতে তিরস্কারের তীব্রতা ও করুণাভিক্ষার নম্রতা দুই-ই দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। তারপর চোখ নত করে' মৃদু মেঘ-গর্জ্জনের মত গম্ভীর-কোমল স্বরে সে বল্‌লে, 'আমার মতন দুর্ভাগ্যকে অপমান করা আপনাকে সাজে না।' 'আপনাকে' কথাটির ওপর জোর দিয়ে বল্‌লে।

আমি একটু অপ্রস্তুতই হ'য়ে গেলাম। লোকটা ততক্ষণে ছিপটা সম্পূর্ণ খসিয়ে নিয়ে আবার বল্‌লে, 'এ-দীঘি আপনাদেব, এ-মাছের ওপরও আপনারই অধিকাব। আপনাব যদি দর্‌কাব থাকে তো বলুন্‌, নইলে মাছটাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দি।'

আমার মুখ দিয়ে বেবিয়ে এলো, 'তা'ব মানে?'

'আমি মাছ খাই নে।'

না জিজ্ঞেস্‌ করে' পার্‌লাম না, 'তবে—তবে ধরেন কেন?'

'এম্‌নি। সময় কাটাতে।—আপনি তা হ'লে চান্‌ না মাছটা?' বলে' তিনি সেটাকে পা দিয়ে আস্তে একটু ঠেলে দিলেন। অৰ্দ্ধ-মৃত রুই গড়াতে-গড়াতে জলে গিয়ে পড়্‌লো। মাছটা পাবের কাছে অগভীর জলে খানিকক্ষণ ছটফট্‌ করে' তলাকাব সমস্ত কাদা ওপরে পাঠিয়ে দিলে; তারপব যেই একবার গভীব জলেব আশ্রয় পেলো, অম্‌নি সব গেলো শান্ত হ'য়ে।

ভদ্রলোকের আচরণে ও কথাবার্ত্তায় আমি ক্রমাগতই আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম, কিন্তু সব চেয়ে বড় বিস্ময় পেলাম তখন, যখন তিনি উঠে' দাঁড়ালেন। পুরুষ-জাতকে যদি সুন্দর ও কুৎসিত এই দুই দলে বিভক্ত কর্‌তে হয়, তবে তাঁকে কুৎসিত না বলে' উপায় নেই। কিন্তু তিনি খর্ব্বাকৃতি হ'লেও ক্ষুদ্রদেহ নন্‌। প্রশস্ত, বলিষ্ঠ কাঁধেব ওপব সিংহেব মত প্রকাণ্ড, তেজ-ব্যঞ্জক মাথা, দীর্ঘ বাহুর কঠিন সবলতায় পৌরুষের রুক্ষতা, কিন্তু হাত দু'খানা নারী-সুলভ, মুখের চেয়ে তা'দের রঙ্‌ ফর্সা। পরিচ্ছন্ন নখগুলিতে রক্ত যেন ফেটে পড়্‌ছে।

সিংহেব মত সেই মাথায় শিশুর মত স্বচ্ছ ও করুণ চোখ; আমাব দিকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে নত-মস্তকে যেন আমাব কথা-বলার অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। বল্‌লাম, 'এক মাসের ওপরে আমি

এখানে আছি, কিন্তু আপনাকে কখনো দেখেছি বলে' তো মনে পড়্ছে না।'

'আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জ্জনা কর্বেন, কারণ আমি কাল মাত্র এখানে এসেছি।'

কথাটা আমার কানে ব্যঙ্গের মত শোনালে। হেসে বল্লাম, 'আপনার স্পর্দ্ধা আছে। আমার কথাটা অভিযোগ নয়।'

ভেবেছিলাম, আমার এ-কথা শুনে' ভদ্রলোক যা'বেন চটে,' কিন্তু চটা দূরে থাক্, তিনি তাঁর স্বভাবত মৃদু কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে বল্তে লাগ্লেন, 'কাল এখানে এসেই শুন্লাম, আপনারা এসেছেন। আপনারা সমাজের শীর্ষতুল্য; আমার উচিত ছিলো কাল্কেই এসে আমার অভিবাদন জা'নিয়ে-যাওয়া, কিন্তু তিন দিন রেলে-জাহাজে কাটিয়ে আমি পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম। আমার এই আপাত-অবহেলার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাই'ছি।' বলে' ঈষন্নত মস্তক তিনি আরো অবনত কর্লেন।

মুখের এই অতি'বক্ত বিনয়ের অন্তরালে মনের যে-অসম্ভব অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন ছিলো, তা আমার আত্ম-সম্মানে ঘা দিলে। অসহিষ্ণুভাবে বলে' উঠ্লাম, 'তা'র কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিলো না।'

বলে'ই দ্রুত পদক্ষেপে সেখান থেকে চলে' আস্ছিলাম, কিন্তু অল্প একটু যেতেই সেই ভদ্রলোক এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। না থেমে বল্লাম, 'বলুন্।'

চল্তে-চল্তে তিনি বল্লেন, 'অপরাধ গ্রহণ কর্বেন না, কিন্তু আপনার হাতের বইখানা যদি একদিনের জন্য আমাকে ধার দেন্, তবে কাল্কে আর আমাকে আপনাদের দীঘিতে অনধিকার-চর্চ্চা কর্তে আস্তে হয় না।'

তাচ্ছিল্যভরে বল্লাম, 'কিন্তু ও তো গল্পের বই নয়!'

ভদ্রলোক উৎফুল্লস্বরে বল্লেন, 'না, নয়। কিন্তু গল্পের মত সুখপাঠ্য ও কবিতার মত ছন্দশীল। আপনার হাতে যে-বইখানা দেখ্ছি, তা'র চেয়ে তাঁর 'Urn Burial' আরো চমৎকার। পড়েছেন নিশ্চয়ই?'

হঠাৎ থেমে গেলাম। তার পর ফিরে' তাঁর মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়াতেই তাঁর মুখের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর্লাম। এইমাত্র যা উৎসাহে ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় উজ্জ্বল ছিলো, আমার দৃষ্টি তা'র ওপর পড়তেই লজ্জায় ও আশঙ্কায় তা মলিন হ'য়ে এলো। বল্লাম, 'এই নিন্।'

বইখানা নেবার জন্য তিনি যে-হাতখানা বাড়ালেন, তা'র আঙুলের ডগাগুলো একটু-একটু কাঁপ্ছিলো। বইখানা তাঁর হাতে দিয়ে আমি আমার মধুরতম হাসি হেসে বল্লাম, 'আচ্ছা, নমস্কার।' বলে' দু'হাত একত্র করে' কপালে ঠেকালাম।

প্রতিনমস্কার করে' তিনি বল্লেন, 'আমার সৌভাগ্য!' কিন্তু ও-দু'টি কথা তিনি যে-গাম্ভীর্য্যের সহিত উচ্চারণ কর্লেন, তা'তে আমার মনে হ'ল, তিনি ধ্বনিবহুল সংস্কৃত ভাষায় বল্লেন, 'কৃতার্থোঽহং দেবি!'

বাড়ি ফিরে' এসে মনে হ'ল যে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অনেক জরুরি কথাই জানা হয় নি। নাম জিজ্ঞেস্-করাটা অবিশ্যি আধুনিক আদব-কায়দার অনুযায়ী নয়;—কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই এ-গ্রামের লোক, নইলে আমাদের সম্বন্ধে অমন সম্ভ্রম-সহকারে কথা বল্বেন কেন? আর অত জান্বেনই বা কি করে'? ওদিকে আবার তিন দিন রেলে-জাহাজে কাটিয়ে এলেন;—অত দূরে কোন্ দেশ? বোম্বে? পণ্ডিচেরী? রেঙ্গুন? অত দূর দেশে কী করেন তিনি? অরবিন্দের শিষ্য বা সব্যসাচীর পকেট-সংস্করণ নন্ তো? অথচ টমাস্ ব্রাউন্ও পড়া আছে! আধুনিক যুগের কোনো সাহিত্য-সম্রাট্ হ'লে একটুও আশ্চর্য্য হ'তাম না; কিন্তু এই

প্রথম ও শেষ

সেকেলে লেখকের অদ্ভুত ভাষা ও তা'র চেয়েও অদ্ভুত চিন্তার রসোপভোগ কর্‌তে পারে, এমন লোকও আজকালকার দিনে আছে ?

আসল কথা এই যে এই মৎস্য-শীকারীর সম্বন্ধে আমি বিষম কৌতূহল অনুভব কর্‌ছি। তাঁর বাড়ি কোন্ দিকে, জিজ্ঞেস্ কর্‌তে ভুল হ'য়ে গেছে ; আশা কর্‌ছি, শীগগিরই একদিন এসে তিনি বইখানা ফেরৎ দিয়ে যা'বেন।

তুই তো মানব-চরিত্রের একজন মস্ত বড় সমঝ্‌দার ;—আমার চিঠি পড়ে' এই ভদ্রলোকের একটা চরিত্র-চিত্রণ লিখে পাঠাতে পার্‌বি ? যদি সুযোগ হয়, আসলটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌বো। ইতি—

তোর লীনা।

সোনারঙ্,
২২শে জ্যৈষ্ঠ।

লীনা,

বইখানা দিতে তিনি নিজে আসেন নি ; আজ সকালে একটা চাকরকে দিয়ে সেখানা ফেরৎ পাঠিয়েছেন। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে বইখানা একবার খুল্‌তেই তা'র মধ্যে আবিষ্কার কর্‌লাম ডাকঘরের ছাপ-আঁকা খোলা একটা খাম—ওপরে নাম লেখা 'শ্রীবিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়' —এবং ঠিকানা কলম্বো। খামখানা বোধ হয় পেইজ্-মার্ক্ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিলো, তার পর আর স্থানান্তরিত কর্‌তে মনে ছিলো না।

কোনো অপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তা'র নাম-ধাম-বিবরণ জান্‌বার প্রথা আমাদের দেশে আছে। প্রথম দু'টি দৈবাৎ জান্‌তে পেরে তৃতীয়টি জান্‌বার জন্য আমার কৌতূহল আরো বেড়েই গেলো। কলম্বোটা

অবিশ্যি দুর্বোধ্য নয়—অন্ন-অন্বেষণে আজকাল মানুষ কোথায় না যেতে পারে? কিন্তু তাঁর ঐ নাম—মধুসূদনের কোন পদের অংশ-বিশেষের মত গুরুগম্ভীর তাঁর ঐ নাম আমাকে চঞ্চল করে' তুল্‌লো।

মনে হ'ল, ও-নাম যেন আমার অচেনা নয়, এক কালে যেন ঐ নামের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিলো, এখন তা ভুলে' গেছি। অথচ, ও-নামের কাউকে কখনো চিন্‌তাম কিনা, না কারো মুখে শুনেছি বা কোনো বইতে পড়েছি—হাজার চেষ্টা করে'ও তা মনে কর্‌তে পার্‌লাম না। জানিস্ তো, আমাদের স্মরণ-শক্তি কি অদ্ভুতরকম খামখেয়ালী; সাধারণ অবস্থায় তা'র মধ্যে সামান্য একটু শ্লথতা খুঁজে' পাবি নে; দশ বছর আগেকার কোনো ঘটনাও অনায়াসে বিবৃত করে'-যাওয়া যায়; কিন্তু যদি কেউ হঠাৎ 'নির্নিমেষ' বানান জিজ্ঞেস করে' বসে, বা 'Sorrows of Satan'-এর লেখিকার নাম জান্‌তে চায়—তা হ'লেই হয় মুস্কিল। এবং যে-হেতু 'বিদ্যাপতি' নামের ইতিহাস জান্‌তে আমার মন উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে, সেই জন্যই সুযোগ বুঝে আমার স্মৃতি-শক্তি দিতে সুরু কর্‌লেন ফাঁকি, এবং দুপুর পর্য্যন্ত আমি অসহ্য যন্ত্রণায় কাটালাম। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ নামের বৈষ্ণব কবির কথাও আমার একটিবার মনে পড়্‌লো না। কিন্তু তার পরেই আমার প্রশ্নের উত্তর মিল্‌লো। আমার তখনকার বিস্ময়টা তুই সহজেই অনুমান কর্‌তে পার্‌বি, দুপুরে খেতে বসে' বাবা যখন বল্‌লেন:

'লীনা, পর্‌শু বড় দীঘির ধারে তোর যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তিনি সীতাপতি চৌধুরীর দৌহিত্র।'

এতক্ষণ যে-নামরহস্য আমাকে পীড়া দিচ্ছিলো, বাবার কথা শোনা-মাত্র তা জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। মনের দরজায় কোথায় যেন একটা খিল পড়ে' গিয়েছিলো, তা চট্ করে' খুলে' গেলো—এবং

সঙ্গে-সঙ্গে এখানে আস্‌বার দিন স্টীমারে বাবার মুখে যে-সব কথা শুনে-ছিলাম, তা'রা হৈ-চৈ করে' ফিরে' আস্‌তে লাগ্‌লো। 'সীতাপতি' নামের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যই যে ঐ ভদ্রলোকের নাম আমার চেনা-চেনা ঠেক্‌ছিলো, তা এতক্ষণে বুঝ্‌লাম।

'কী করে' জান্‌লে, বাবা? মানে, আমার সঙ্গে যে দেখা হয়েছিলো, সে-খবর?'

'তাঁরই মুখে শুন্‌লাম। আজ সকালবেলা ডাকঘরে দেখা। আমি চিন্‌তে পারি নি। উনিই প্রথমে নমস্কার করে' বল্‌লেন, "ভালো আছেন তো?"

'"তা আছি। কিন্তু আপনাকে তো—"

'"আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না? পার্‌বার কথাও নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আমার দু'বার দেখা হয়েছে।"

'আপাদমস্তক তাঁকে নিরীক্ষণ কর্‌লাম। আশা করেছিলাম, মুখের কোনো রেখায় বা দেহের কোনো ভঙ্গীতে বহুদিনের বিস্মৃত কোনো ক্ষণিক পরিচয়ের আলো জ্বলে' উঠবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হ'তে হ'ল। ভদ্রলোক আমার অকৃতকার্য্যতা লক্ষ্য করে' বল্‌লেন:

'"আপনার লজ্জিত হ'বার দরকার নেই, কেননা, প্রথমবার দেখা হয় মাদুরা রেলোয়ে স্টেশনে—নিশাকালে। আপনি যে-গাড়ি থেকে নাব্‌ছিলেন, আমি সেই গাড়িতে উঠ্‌ছিলাম। দ্বিতীয়বার আপনাকে দেখি কল্‌কাতায় রামমোহন লাইব্রেরিতে—স্টেলা ক্রাম্‌রিশ্‌-এর বক্তৃতা হচ্ছিলো।"

'আমি হেসে উঠ্‌তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আর পরশু দিন আপনার মেয়ের সঙ্গে—হ্যাঁ, এক রকম পরিচয়ই হয়েছে।"

'আমি কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে

রইলাম। তখন তিনি তাঁর মাছ-ধরা থেকে বই-ধার-নে'য়া পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা খুলে' বল্লেন।

'আদ্যোপান্ত শুনে' আমি বল্লাম, "সত্যি? কিন্তু লীনার দোষ কী, বলুন? ও তো আপনাকে চেনে না! ঐ দেখুন্—আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে আমিও ভুলে' গেছি।"

'পোস্ট্‌মাষ্টার বাবু এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন, এইবার তিনি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখ থেকেই আমি বিদ্যাপতিবাবুর পরিচয় শুনলাম।

'বিস্মিত হ'তে হ'ল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল যে তাঁর মুখের ওপর সীতাপতি চৌধুরীর সেই আশ্চর্য্য চোখ দু'টি আমি প্রথম দেখেই কেন চিনতে পারি নি? বাল্যকালে আমার কল্পনায় যিনি শুধু ঈশ্বরের চেয়ে ছোট ছিলেন, সেই সীতাপতি চৌধুরীর একমাত্র রক্ত-সম্পর্কিত ও উত্তরাধিকারীকে দেখলাম—মনে হ'ল এ যেন আমার কত বড় সৌভাগ্য।'

এইখানে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞেস্ করলাম, 'তখন আমার হ'য়ে তুমি খুব ক্ষমা চাইলে তো?'

বাবা হেসে বল্লেন, 'ও-সব লৌকিকতার কোনো প্রয়োজন তাঁর কাছে ছিলো না। তাঁকে বল্লাম, "আপনাকে দেখে আমার মন আজ আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, কারণ আপনার সঙ্গে এমন-একজনের স্মৃতি বিজড়িত, যিনি আমার সমগ্র জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন।"'

'ঐ কেতাবী ভাষায় তুমি কথা কইলে বাবা?'

'বক্তব্য বিষয়টা যখন বইয়ে লেখ্‌বার মত হয়, তখন ভাষাটাও সেই অনুসারে তৈরি হ'য়ে ওঠে বই কি!'

'তাই নাকি? যাক্—তারপর?

'তারপর আমরা দু'জন ডাকঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগ্‌লাম। অনেক আলাপ হ'ল। সাংসারিক ব্যাপারে সীতাপতি চৌধুরীর ঔদাসীন্য সব চেয়ে মারাত্মক হয় তাঁর মেয়ের পক্ষে। একমাত্র মেয়ের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ তিনি তাঁর বিয়ে দিতেই ভুলে' যান্। পিতার মৃত্যুর পর এই চতুর্বিংশতিবর্ষীয়া কন্যা আবিষ্কার করলেন যে পৃথিবীতে এখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়।'

এইখানে মা বলে' উঠ্‌লেন, 'কী সর্ব্বনাশ!'

'কিন্তু সৌভাগ্যবশত সীতাপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গীত-দক্ষতা মেয়েকে দিয়ে গিয়েছিলেন, ফলে তিনি কল্‌কাতার এক গানের ইস্কুলে—'

মা বল্‌লেন, 'কিন্তু দেশের বিষয়-সম্পত্তি?'

'জানোই তো, তোমার শ্বশুরের পূর্ব্বপুরুষদের কল্যাণে তা'র নামে মাত্র অস্তিত্ব ছিলো। তা ছাড়া, শুধু অর্থ হ'লেই মেয়েদের চলে না। তদ্ব্যতীত যা প্রয়োজন, তা তাঁর ভাগ্যাকাশে অনতিবিলম্বেই উদিত হ'ল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে সেই ভাগ্যবান?'

'এক দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট সাহিত্যিক। বিয়ে করে' তাঁর অর্থকষ্ট ঘুচ্‌লো। কিন্তু সে-সুখ তাঁর কপালে বেশীদিন সইলো না। বছর তিনেক পরে তিনি গেলেন মারা। বিদ্যাপতি বাঁড়ুয্যে তখন এক বছরের শিশু।'

মা রুদ্ধস্বরে বলে' উঠ্‌লেন, 'তারপর কী হ'ল?'

'হ'বে আবার কী? সেই সাহিত্যিকজায়া কত কষ্ট করে' যে ছেলেটিকে মানুষ করে' তুল্‌তে লাগ্‌লেন, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বিদ্যাপতিবাবু ও-প্রসঙ্গ যেন এড়িয়ে গেলেন মনে হ'ল—সম্প্রতি তাঁর মাতৃবিয়োগও হয়েছে কিনা। মা'র অবশ্যি যথেষ্ট বয়েস হয়েছিলো, কিন্তু বিদ্যাপতিবাবু বোধ হয় এই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনাকে এখন পর্য্যন্ত ক্ষমা করে' উঠ্‌তে পার্‌ছেন না।

মা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বল্‌লেন, 'কী যে বলো! আর-কেউ নেই যা'র—'

'হ্যাঁ, সত্যি। একান্ত স্বজনহীনতা যে কত বড় দুর্ভাগ্য, তা আমাদের বুঝতে পারার কথা নয়।'

'তা এই বিদ্যাপতিবাবু কী কর্‌ছেন এখন?' মা শুধোলেন।

'কলম্বোর এক বৌদ্ধ মিশ্‌নারী কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়ান্ ও মাঝে-মাঝে ছুটী পেলে এইখেনে আসেন। জানো তো, আমাদের জন্যই আজ তাঁর এই দুরবস্থা। তাঁর কথা শুন্‌তে-শুন্‌তে আমি লজ্জিত হ'য়ে উঠ্‌ছিলাম; আমার পূর্ব্বপুরুষেরা আমার ঘাড়ে যত অন্যায়ের ঋণ চাপিয়ে গেছেন—মনে হচ্ছিলো, তা যেন আমার শোধ করা উচিত।'

মা হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লেন, 'সে-উদ্দেশ্যে কী কর্‌লে তুমি?'

'চল্‌তে-চল্‌তে যখন আমাদের দুজনের দুদিকে যাবার সময় হ'ল, আমি একটু থেমে বল্‌লাম, "যদ্দিন এখানে আছি, আপনার সঙ্গলাভের আশা নিশ্চয়ই কর্‌তে পারি?"

'তিনি অল্প একটু হেসে বল্‌লেন, "আপনাদের যদি তা-ই অভিরুচি হয়, আমার কোনো মতান্তর নেই, জানবেন।"

'ফলে আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে' এসেছি। আজ্‌কে রাত্তিরে।'

আমি বলে' উঠ্‌লাম, 'আজ্‌কেই?'

'হ্যাঁ, আজ্‌কেই। তোর মত জিজ্ঞেস্ কর্‌বার সময় ছিলো না, কিন্তু তোর কোনো আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?'

'না, না—আপত্তি কিসের?' সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, বিদ্যাপতিবাবু ঐ কথাটা অমন করে' বল্‌লেন কেন? 'আপনাদের যদি তা-ই অভিরুচি হয়, আমার কোনো মতান্তর নেই, জান্‌বেন।' 'আপনাদের' কেন? আর, 'আমার কোনো মতান্তর নেই, জান্‌বেন,' এ-কথার মানে তো শুধু সম্মতি নয়, বরং সাধারণ

ভাষায় তর্জ্জমা করলে তা অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়: 'যা অনিবার্য্য, তা'র সঙ্গে সংগ্রাম করা চলে না: বিনা দ্বিধায় তা'র হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ভিন্ন উপায় নেই।'

সে যা-ই হোক্, আর ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে বিদ্যাপতিবাবু স্বয়ং আবির্ভূত হ'বেন, আপাতত এই আশা করা যাচ্ছে। এবং এইমাত্র খেয়াল হ'ল যে এখনো আমার সাজসজ্জা বাকি। সুতরাং—যদিও তোকে আরো অনেক কথা বল্‌বার ছিলো—আজকের মত এইখানেই ইতি।

তোর লীনা।

—নং বীডন্ স্ট্রীট্,
২৩শে জ্যৈষ্ঠ।

লীনা,

আজ্‌কেই তোকে চিঠি লিখ্‌তাম না, কিন্তু পর-পর তোর দু'খানা দীর্ঘ চিঠি পেয়ে তোর সম্বন্ধে আমি এতদূর উৎকণ্ঠিত হয়েছি যে বিস্তর কাজের মধ্যেও তোকে দু'চার কথা লেখ্‌বার সময় করে' নিতে হচ্ছে!

আমি তোকে সাবধান করে' দিতে চাই, লীনা—তোর ঐ নব-পরিচিত বিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে! তোর চিঠি দু'খানা পড়ে' তাঁকে আমি যেমন চিনেছি, আমি তাঁর আজন্ম-পরিচিত হ'লেও তা'র চেয়ে ভালো চিন্‌তাম না। যে-দুর্ভাগ্য তাঁর মা-কে ক্ষমায়, নম্রতায়, সহনশীলতায় মধুর করে' তুলেছিলো, সেই দুর্ভাগ্যই তাঁকে হিংস্র, স্বার্থপর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ করে' তুলেছে। এটা অবিশ্যি তাঁর অপরাধ নয়; নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যই এখানে। দৈব-দোষে বিদ্যাপতিবাবু যে-সব দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন বা পাচ্ছেন, সেগুলো মেনে নেবার মত উদারতা বা কাটিয়ে-ওঠার মত শক্তি তাঁর নেই; খাঁচায় অবরুদ্ধ চিতাবাঘের মত তিনি ছট্‌ফট্ করে' বেড়াচ্ছেন;—এবং ভাব্‌ছেন, অন্য

কাউকে অসুখী কর্‌তে পার্‌লে বুঝি তাঁরো শান্তি হ'বে। তাঁর যে-প্রচণ্ড অহঙ্কারের ফলে তাঁর মুখের প্রায় প্রত্যেকটি কথা বিদ্রূপের মত শোনায়, সে-ই তাঁর চরিত্রের কলঙ্ক, কারণ অতখানি অহঙ্কারের যোগ্যতা তাঁর নেই। এবং তিনি তা জানেন। জানেন বলে'ই প্রকাণ্ড অভিমানের ভাণ করে' লোকচক্ষে তিনি সেই অভাব পূরণ কর্‌তে চান্। যেটা অহঙ্কার বলে' মনে হয়, আসলে সেটা তাঁর ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স্।

এ-কথা অবিশ্যি ঠিক যে প্রথম-দর্শনে এই ধরণের লোকের মস্ত একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, এবং বিপদ সেই কারণেই সমূহ। শোনা যায়, বায়রন্‌কে প্রথম দেখে ইংল্যাণ্ড্-এর সুন্দরীবৃন্দ সবাই মনে-মনে বলে' উঠ্‌তেন, 'That pale face is my fate'। তুই কি অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বি যে এ-ক'দিন ধরে' তেমনি একটা চিন্তা তোর মনে আনাগোনা কর্‌ছে? কিন্তু ঐ কথাটা বাঙ্‌লায় বল্‌তে গেলে কী হয়, জানিস্—'ঐ মুখই আমার কাল হ'বে।' কারণ সেই মহিলাদের পক্ষে বায়রন্ যে কালই হ'তেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কী? বায়রন্-এর জাতের লোকেরা উগ্র, দয়াহীন, বে-পরোয়া—এঁরা না কর্‌তে পারেন, এমন কাজ নেই। তাই তাঁদের সংস্রব বর্জ্জনীয়। সাপের মত এঁরা আকর্ষণ করেন—তা'র ফল হয় মর্ম্মান্তিক। বিদ্যাপতিবাবু ঐ শ্রেণীর মানুষ; প্রতিকূল অদৃষ্ট ও নির্ব্বান্ধবতা তাঁকে রুক্ষতরো করেছে। আমার মনে হয়—মনে হয় কী?

নিশ্চয়ই—তিনি এরি মধ্যে তোর ওপর অনেকখানি মোহ বিস্তার করেছেন; কিন্তু তোর মনের স্বাভাবিক মোহ-বিমুখতা ও বুদ্ধির অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা শেষ পর্য্যন্ত তোকে রক্ষা কর্‌বেই, এই বিশ্বাসে নির্ভরশীল, তবু তোর জন্য উদ্বিগ্ন ও তোর চির- কল্যাণকামী বন্ধু,

নীলা।

প্রথম ও শেষ

সোনারঙ,
২৫শে জ্যৈষ্ঠ।

প্রাণাধিক নীলা,

তোর সংক্ষিপ্ত—অর্থাৎ সম্যকরূপে ক্ষিপ্ত—চিঠিখানা পেয়ে আমি কিন্তু মোটেও বিচলিত হই নি। তোর কল্যাণ-কামনার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমার দিক থেকে এটুকু বল্‌তে পারি যে বিপদ এখনো ততটা ঘনিয়ে আসে নি। সুতরাং তোর মহামূল্য উৎকণ্ঠার বাজে খরচ করতে নিষেধ করছি। জমিয়ে রেখে দে—কোনোকালে কাজে লাগ্‌তে পারে।

অথচ ইচ্ছে করলে তোর কথাবো যে উত্তর না দিতে পারি, এমন না। প্রথমেই একটা পুরোনো নীতিবাক্য উচ্চারণ করতে হচ্ছে। সে হচ্ছে এই যে শয়তানকে (এবং বায়রনকে) যত কালো করে' আঁকা হয়, তত কালো সে নয়। তুই যদি বলিস্ যে ও-কথা বলার কোনো মানে হয় না, তা হ'লে আমি বল্‌তে বাধ্য হ'ব যে বিদ্যাপতি-বাবুর সঙ্গে ঐ দুই মহাপুরুষের চরিত্রগত কোনো সাদৃশ্যই নেই। ডন্ জুয়ান বা মেফিস্‌টোফিলিস্-এর অংশ নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। উপন্যাসের নায়কের যে-কয়েকটি বড-বড় ছাঁচ আমাদের চোখের সাম্‌নে আছে, তা'র কোনোটির মধ্যেই তিনি পড়েন না। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের চোখ-ঝল্‌সানো প্রখরদীপ্তিত্ব বা কবি-রামচন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শী কারুণ্যের মন-ভোলানো মধুরতা—কোনোটিই তাঁর নেই। তাঁর মধ্যে সে-মদিরতার অভাব, যা'তে তাঁকে দেখামাত্র মনের নেশা ধরে' যেতে পারে।

তারপর অহঙ্কার। বিদ্যাপতিবাবু অহঙ্কারী বটে, কিন্তু কে বল্‌বে সে-অহঙ্কারের যোগ্যতা তাঁর নেই? মানুষের মর্য্যাদা-নির্দ্ধারণের সত্য উপায়—যা-হয়েছে নয়, যা-হ'তে-পার্‌তো। তিনি দরিদ্র, এ হচ্ছে সাংসারিক সত্য, কিন্তু তা'র চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে এই যে দারিদ্র্য তাঁকে

মানায় না। সেই জন্যই তাঁর মন বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম করে' যায়। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে নিষ্ফল অভিযোগ কর্‌তে তিনি অভ্যস্ত নন্‌, কিন্তু তা'র প্রতিকূলতাকে স্বীকার করে' নিয়ে মনের জন্মগত উদারতাকে খর্ব্ব কর্‌তে তিনি নারাজ। ভাই, স্বভাব যাঁকে বড় করেছে, তাঁর জাত মার্‌বে কে?

এই আত্ম-শ্লাঘা যদি তাঁর সর্ব্বস্ব হ'ত, তা হ'লেও তোর ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি ছিলো না। উগ্র লাল রঙ্‌য়ের গোলাপ দৃষ্টিকে পীড়া দিত, যদি না তা'র আশেপাশে শ্যাম-পত্রগুচ্ছের ম্লানিমা দেখ্‌তাম। তেম্‌নি একটি স্বভাবজাত বিনয়ের কোমলতা তাঁর গর্ব্বকে সুদৃশ্য করেছে। এবং ঐ দু'টি জিনিষ তাঁর মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে তা'দেরকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখ্‌বার উপায় নেই। ইলেক্‌ট্রিক্‌-এর কোন্‌ তারে নেগেটিভ্‌ আর কোন্‌ তারে পজিটিভ্‌ শক্তি যাতায়াত করছে জানি নে, কিন্তু এটুকু নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি যে দু'য়ের সম্মিলনেই পরম-বাঞ্ছিত আলোর উৎপত্তি।

বলাই বাহুল্য, ইতিমধ্যে বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে আরো দেখা হয়েছে, এবং আমার কাছে তিনি যেমন মনে হয়েছেন, তা'র সঙ্গে মিলিয়ে তোর বর্ণনা পড়েছি। • যে-সব অসামঞ্জস্য চোখে পড়্‌লো, তা তোকে জানালাম

সে-রাত্রে নিমন্ত্রণ-রক্ষা কর্‌তে তিনি এসেছিলেন—আস্‌বেনই বা না কেন? আহারান্তে নীচের হল্‌-ঘরটিতে আমরা সমবেত হ'লাম। বাবা আমার বেহালাটার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে' বল্‌লেন, 'আপনাকে এর চেয়ে উচ্চশ্রেণীর কোনো যন্ত্র দিতে পার্‌ছি না বলে' ক্ষমা কর্‌বেন।'

বিদ্যাপতিবাবু তাঁর অভ্যাসমত একবার বাবার মুখে তাকিয়ে, তারপর

নিজের প্রসারিত করতলে দৃষ্টি সংবদ্ধ করে' বল্লেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমি বাজাতে জানি নে।'

বাবা বল্লেন, 'একেবারেই নয় ? আশ্চর্য্য !'

'হ্যাঁ, আশ্চর্য্যই। আমার মাতামহ তাঁর কন্যাকে যে-অদ্ভুত শক্তির অধিকারিণী করে' যান্, তা তাঁর—অর্থাৎ সেই কন্যার—সঙ্গে-সঙ্গেই লুপ্ত হ'ল। সেই প্রতিভার উত্তরাধিকারী হ'বার মত সৌভাগ্য নিয়ে তাঁর পুত্রের জন্ম হয় নি।'

বাবা বল্লেন, 'বাস্তবিক। আপনার মা-র কথা আমার স্মরণ হয় না, কিন্তু চৌধুরী-মশায়ের আত্ম-বিস্মৃত মুখের লাবণ্যচ্ছটা আর কারো মুখে দেখ্‌বো না ভাব্‌লে দুঃখ হয়।'

মা জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, 'কিন্তু আপনি গান গাইতে পারেন নিশ্চয় ? গায়কদের মতই তো মার্জ্জিত ও মসৃণ আপনার কণ্ঠস্বর।'

বিদ্যাপতিবাবু আবার দৃষ্টি আনত করে' বল্‌লেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমার সম্বন্ধে আপনার এই অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

তারপর তাঁর সেই আশ্চর্য্য, উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি বাবাকে, মা-কে পরিভ্রমণ করে' অবশেষে আমার ওপর এসে নিবদ্ধ হ'ল। আমার দিকে তাকিয়েই বল্‌তে লাগ্‌লেন :

'দেখুন্, প্রতিভাসম্পন্ন হ'বার প্রচুর সম্ভাবনা আমার ছিলো ; কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যের ফলে সব গেলো ব্যর্থ হ'য়ে। পিতৃগণের পুণ্যফলের কিছুই আমাতে এসে বর্ত্তালো না। আমার বাবা ছিলেন লেখক ;—কেমন লিখ্‌তেন, সে-বিষয়ে আলোচনা করা আমার মানায় না, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের অনেক ওপরে তিনি তাঁর সাহিত্যকে স্থান দিয়েছিলেন, এ-কথা সগর্ব্বে বল্‌তে পারি। আমার এক কাকা ছিলেন—তাঁকে আমি কখনো দেখি নি। সতেরো বছর বয়সে তিনি পালিয়ে

প্যারিসে চলে' যান্—ছবি-আঁকা শিখ্‌তে। কালে চিত্রকর ও ভাস্কর-হিসেবে ও-দেশেও সুনাম অর্জ্জন কর্‌তে তিনি সক্ষম হন্। বছর দুই পূর্ব্বে তাঁর মৃত্যু হ'লে প্যারিসে যে-শোকসভা আহূত হয়, তা'র সভাপতি ছিলেন রোদাঁ।

'আমারো গীতি-কুশল, কবি বা চিত্রকর হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু হ'তে পারি নি বলে'ই আমার হয়েছে মুস্কিল। তাঁদের কাছ থেকে আমি তদুপযোগী প্রাণ ও কল্পনাশক্তি পেয়েছি, কিন্তু পাই নি প্রকাশের ক্ষমতা। প্রতিভাশালী স্রষ্টাদের জ্যোতির্মণ্ডল বেষ্টন করে' যে-সব অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও নিকৃষ্ট লোক বিরাজ করে, আমি তা'দের একজন। এরা নিজেরা স্রষ্টা না হ'লেও স্রষ্টার ঠিক নীচেই এদের আসন, কারণ সৃষ্টির সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণতম-রূপে উপভোগ করার ক্ষমতা এদেরই আছে। যেমন আমি। আমার নিজের আযোগ্যতা দেখ্‌লেন তো, কিন্তু ছবি, কবিতা বা গান আমার চাইতে বেশি ভালোবাসে, এমন লোক নেই।'

এই দীর্ঘ বক্তৃতার আসল উদ্দেশ্য যে কী, তা এতক্ষণে বোঝা গেলো। এবং তা'র ফল যে কী হ'ল, তা বুঝ্‌তেই পার্‌ছিস্;— বেহালাটা আমাকেই হ'ল বাজাতে।

যতক্ষণ বাজাচ্ছিলাম, বিদ্যাপতিবাবুর সেই আশ্চর্য্য, উজ্জ্বল চোখ ধারালো তীরের ফলকের মত আমার মুখের ওপর বিদ্ধ হ'য়ে ছিলো। সে-দিকে না তাকিয়েও আমি তা বুঝতে পার্‌ছিলাম। মানুষের অমন চোখ হয় ভাই ?—যে-চোখে কখনো পলক পড়ে না, প্রশান্ত গভীরতায় যা পাষাণের মত স্থির হ'য়ে গেছে! আমার সমস্ত মুখ যেন জ্বালা করে' উঠ্‌লো; স্পষ্ট অনুভব কর্‌লাম, আমার হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দিত হ'য়ে বুক থেকে সমস্ত রক্ত মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ বাজ্‌না থামিয়ে আমি উঠে' দাঁড়ালাম। কিন্তু বিদ্যাপতিবাবুর

সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ামাত্র তাঁর কঠিন দৃষ্টিতে অমন তরল চঞ্চলতা এলো কী করে'? দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনিও উঠে' দাঁড়ালেন।

নীলা, আমার এই বিবরণ পড়ে' তুই যা ইচ্ছে তা ভাব্‌তে পারিস্‌, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তা করিস্‌নে, এই মাত্র অনুরোধ। শ্যালট্‌-বাসিনীর মত বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফি'রিয়ে মায়া-মুকুরের ভেতর দিয়ে তো আমি পৃথিবীটাকে দেখি নি যে একদিন বিষণ্ণ-স্বরে বলে' উঠ্‌বো, 'I'm half-sick of shadows'! আমার লান্স্‌লট্‌কে যদি আমি দেখে থাকি, দিনের আলোয় শাদা চোখেই দেখেছি। প্রত্যূষের অস্পষ্ট আলোয় জ্বরের ঘোরে-দেখা-স্বপ্নের কুহেলি-আবরণে ক্ষণবিহারী ছায়ার মত দেখা দিয়েই তিনি অপসৃত হ'বেন না: তাঁর আবির্ভাব হ'বে সূর্য্যোদয়ের মত মহিমান্বিত, মৃত্যুর মত সংশয়াতীত ও সুনিশ্চিত। সেই মোহ তিনি বিস্তার কর্‌বেন না, বুদ্ধি যা'তে ঘোরালো হ'য়ে আসে। অন্ধকার নিরবয়ব ও অস্পষ্ট বলে'ই কুৎসিত, কালো বলে' তো নয়। সূর্য্য উঠ্‌লে তা'র আলোয় যেমন পৃথিবীর সুগঠিত ও সুসমঞ্জস সৌন্দর্য্য আত্ম-প্রকাশ করে, তেম্‌নি তাঁর স্পর্শে আমার দেহ ও মন ও আত্মা থেকে ঘুমের যবনিকা উঠে' যা'বে; শুধু ইন্দ্রিয়ের চেতনায় বা হৃদয়ের অনুভূতিতেই নয়, বুদ্ধির মমতাহীন প্রখর উজ্জ্বলতাতেও তাঁকে লাভ কর্‌বো—কোথাও কোনো ফাঁকি থাক্‌বে না। এর নাম তো মোহ নয় ভাই: বরঞ্চ তাঁর প্রেম যখন মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার মত বুকে এসে বাজ্‌বে, তখনই সকল মোহ থেকে মুক্তি লাভ কর্‌বো, লাভ কর্‌বো নব-জন্ম।

লীনা।

প্রথম ও শেষ

সোনারঙ্,

৩২শে জ্যৈষ্ঠ।

নীলা,

কাল রাত্তিরে পৃথিবীর সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার হ'য়ে গেছে, তাই মনের মধ্যে তা একটুও ঝাপ্সা হ'য়ে যাবার আগেই তোকে লিখ্তে বসেছি। নিছক ঘটনা-হিসেবে দেখ্তে গেলে তা তেমন বিস্ময়কর মনে হ'বার কথা নয়, কিন্তু তা'র ফলে আমার মধ্যে যে-পরিবর্ত্তন এসেছে, আশ্চর্য্য সেইটি। এতদিন যে-যবনিকা মৃদু হাওয়ায় থেকে-থেকে কাঁপ্ছিলো মাত্র, কাল আমার চোখের সাম্‌না থেকে তা উঠে' গেছে, এবং রঙ্গমঞ্চের ওপর আমারই জীবন নাট্য অভিনীত হচ্ছে, দেখ্লাম। সেই দিকে তাকিয়ে নিজকে আবিষ্কার করলাম, ও অভিনন্দন জানালাম। কারণ সেই আমি সব-চেয়ে আশ্চর্য্য।

এখানে যখন আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'য়ে যায়, কল্‌কাতায় লোকে তখন বেড়াতে বেরোয়। আহার ও নিদ্রার মাঝখানে সময়ের সুবৃহৎ ফাঁকাটা আমরা তিনটি প্রাণীতে মিলে' গল্প-গুজব করে' ভরে' তুলি। কিন্তু কাল মা-র শরীর অসুস্থ ছিলো, তাই আমাদের সভা বসে নি। বাধ্য হ'য়ে ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হ'ল। ঝাড়-লণ্ঠনের যতই চাক্‌চিক্য থাক্, সে-আলো বৈঠকখানারই উপযোগী, শোবার বা পড়্বার ঘরের নয়। জানালার ধারের টেবিলে বসে' মোমের আলোয় আমি বই পড়্তে লাগ্‌লাম। সমস্ত পল্লী ঘুমিয়েছে।

কতক্ষণ পড়েছিলাম, ঠিক বল্‌তে পার্‌বো না, কিন্তু মনে আছে, একটা মোমের আধ-খানার বেশি পুড়ে' গিয়েছিলো। কাজেই অনুমান কর্‌ছি, তখন রাত বারোটার কম হ'বে না। বুঝ্তে পারলাম, এখন শয্যাগ্রহণ করলে সঙ্গে-সঙ্গেই নিদ্রাকর্ষণ হ'বে; তাই গল্পের বহু-পরিচিত

নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গত্যাগ কর্‌তে কষ্ট হ'লেও বইখানা মুড়ে' আমি চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লাম।

খোঁপার কাঁটাগুলো খুল্‌তে-খুল্‌তে আমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। খানিকক্ষণ আগে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিলো, এখন আকাশের মেঘ কেটে চাঁদের মুখ দেখা দিয়েছে। দশমী বা একাদশীর চাঁদ রয়েছে আমার মাথার ওপরে—জানালা থেকে তা'কে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কিন্তু তা'র নীল আলোয় আমাদের আম্র-কানন চুপচাপ দাঁড়িয়ে স্নান কর্‌ছে, কাছের গাছগুলোর ভিজে পাতারা ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় সঞ্চালিত হ'য়ে ঝিকিরমিকির করে' উঠ্‌ছে। আমার জানালার নীচে আলো-ছায়ায় মিশে' অদ্ভুত আব্‌ছায়ার জাল বুনে' চলেছে, পেঁপে-গাছটার পাশে এক টুক্‌রো ছায়া এইমাত্র নড়ে' উঠ্‌লো।

কিন্তু ঐ ছায়াটাই কি সোজা হ'য়ে উঠে' দাঁড়িয়েছে? তা'র ফাঁকে-ফাঁকে শাদা কাপড়ের মত ও কী দেখা যাচ্ছে? যাক্—এতদিনে বোধ হয় একটা আসল ভূতের দেখা পাওয়া গেলো! হাওয়ায় দু'একটা এলোচুল উড়ে' এসে আমার চোখে-মুখে পড়্‌ছিলো; হাত দিয়ে তা'দেরকে সরিয়ে আমি মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে তাকালাম।

বিদ্যাপতিবাবু ফির্‌ছিলেন বোধ হয়;—আমার দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই থম্‌কে দাঁড়ালেন।

বিস্ময়ের প্রথম আঘাত কাটিয়ে উঠ্‌তে-না-উঠ্‌তেই অসংখ্য প্রশ্ন একসঙ্গে আমার মনকে আক্রমণ কর্‌লে: এর মানে কী? গোলাপীকে তুল্‌বো? উনি কি এ-পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন? বাবাকে ডাক্‌বো? এত রাত্তিরে কোথায়ই বা যাবেন? আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে' পড়্‌বো? কিন্তু—

এতক্ষণে এই অতি সরল সত্যটা আমার মনে উদয় হ'ল যে

বিদ্যাপতিবাবু আমাকে দেখ্‌বার জন্যই ঐখেনে এসে দাঁড়িয়েছেন, এবং সম্ভবত বহুক্ষণ যাবৎই দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই আমাকে এমন-কোনো কথা তাঁর বলার ছিলো, জ্যোছ্‌নার নেশায় সারা পৃথিবী ঝিমিয়ে না এলে যা বলা যায় না—আমার প্রতিটি হৃৎ-স্পন্দন চীৎকার করে' এই কথা বলে' উঠ্‌লো। সেই কথা আমার শোনা চাই। ভাববার সময় নেই, যে-কোনো মুহূর্ত্তে তিনি ঐ পথের মোড়ে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে পারেন। মনে হ'ল, সেই কথাটি না শুন্‌তে পার্‌লে আমার পৃথিবী চির-কালের মত বন্ধ্যা হ'য়ে যা'বে। সেই শুভ-লগ্ন বুঝি এলো, যা'র জন্য এতকাল অপেক্ষা করেছি; এ যদি বৃথা বয়ে' যায়, তবে এ-জন্মের মত আমার মনের বৈধব্য ঘুচবে না।

এখন বুঝতে পার্‌ছি, নীলা, যে বাইরে উপস্থিত হ'তে-পারার আগে আমি অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নেমে, মাঝের হল্‌টা পেরিয়ে নিজ হাতে পেছন দিক্‌কার প্রকাণ্ড ভারি দরজাটা খুলেছিলাম। কিন্তু তখন মনে হয়েছিলো যেন ইচ্ছে করা মাত্র আমি হাওয়ায় উড়ে' এসে সেখানে পড়্‌লাম।

দরজার ঠিক বাইরে সিঁড়ির ওপর আমি দাঁড়ালাম। বিদ্যাপতিবাবু যন্ত্র-চালিতের মত আমার দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লেন। সিঁড়ির গোড়ায় এসে কী ভেবে যেন একটু অপেক্ষা করলেন—তার পর আমার ঠিক নীচের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন।

অস্ফুটস্বরে আমি জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লাম, 'আপনি? এ-সময়ে? কেন?'

মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠের উত্তর শুনলাম, 'কাল চলে' যাচ্ছি। তাই আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলাম।'

কী বল্‌ছি, নিজে তা বুঝ্‌তে-পারার আগেই আমি বলে' উঠলাম, 'কাল যাচ্ছেন? অসম্ভব।' কথাটা নিজের কানেই বিসদৃশ শোনালো।

একটু অপ্রতিভ হ'য়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে' তাড়াতাড়ি বলে' ফেল্‌লাম, 'কিন্তু সময়টা কি খুব সুনির্ব্বাচিত হয়েছে, বিদ্যাপতিবাবু ? আপনার বিবেচনাকে ধন্যবাদ !'

'আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসি নি, আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলাম শুধু । দূর থেকে দেখে চলে' গেলেই আমার তৃপ্তির সীমা থাক্‌তো না ; আপনার সঙ্গে যে কথা বল্‌তে পার্‌ছি, এ আমার আশাতীত সৌভাগ্য ।'

'দুঃখের বিষয়, এ-সৌভাগ্য আমার পক্ষেও সমান উপভোগ্য হচ্ছে না । পাশের ঘরে চাকর-বাকররা শুয়ে' আছে ;—তা'রা যদি কেউ—'

'নিরর্থক আপনি আশঙ্কা কর্‌ছেন । আমি তো চলে'ই যাচ্ছিলাম—কেন আপনি এলেন ?'

বলে' তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে হাওয়ার মত স্বরহীন অথচ তীব্র স্বরে আমি ডাক্‌লাম, 'শুনুন্ ।'

বিদ্যাপতিবাবু আমার দিকে যে-মুখ ফেরালেন, তা ভূতের চেয়েও ম্লান । নীচের সিঁড়িতে না নেবে যতটা সম্ভব তাঁর কাছে সরে' এসে আমি বল্‌লাম —না, বলি নি, কারণ আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোয় নি ;—আমার নিশ্বাস-পাতের সঙ্গে এই কথা উচ্চারিত হ'ল : 'কাল্‌কেই যাচ্ছেন ? সত্যি ?'

বিদ্যাপতিবাবুর বিবর্ণ মুখ মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো, দেখ্‌লাম । ভীরু একটি হাসি লাজুক্ আলোক-রেখার মত তাঁর ঠোঁটের কিনারে একটু খেলা কর্‌লে, তারপর তাঁর দুই চোখের শ্যামল গভীরতায় ঝাঁপ দিয়ে খানিকক্ষণ ঝল্‌মল্ করে' নিজকে হারিয়ে ফেল্‌লে । অত্যন্ত সহজভাবে, প্রায় লঘুকণ্ঠেই তিনি বল্‌লেন, 'এ-কথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস কর্‌ছেন ? জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যাঁর নির্দ্দেশ মেনে-চলায়

আমার জীবনের একমাত্র চরিতার্থতা, একটু আগেই তিনি নিজমুখে বলেছেন যে কাল আমার যাওয়া অসম্ভব।'

'তাঁর ওপর আপনার বিশ্বাস যদি এম্‌নি অন্ধ, তবে যাবার সংকল্প করাব আগে তাঁর পরামর্শ নেন্ নি কেন?'

'বিশ্বাস অন্ধ বলে'ই কোনো প্রশ্ন কর্‌বার প্রয়োজন হয় নি। জান্‌তাম, তাঁর যা অভিপ্রেত, তা হ'বেই; আমার কোনো চেষ্টার অপেক্ষা তিনি রাখ্‌বেন না। হ'লও তা-ই।'

'তবে জান্‌বেন, তিনি এই মূহুর্ত্ত থেকে আপনার সমস্ত জীবন দাবী কর্‌ছেন।'

হঠাৎ বিদ্যাপতিবাবু নতজানু হ'য়ে আমার সাম্‌নে বসে' পড়্‌লেন। তাঁহার উত্তোলিত, উদ্‌গ্রীব বাহু এড়াবার জন্য আমি বিদ্যুৎ-গতিতে সরে' যেতেই আমার শাড়ির আঁচলটা পড়্‌লো লুটিয়ে। বিদ্যাপতিবাবু দুই হাতে সেই আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে তা'তে মুখ ঢাক্‌লেন।

ঈষৎ অবনত হ'য়ে আমি তাঁর চুলের ওপর হাত রাখ্‌লাম। ধীরে-ধীরে তিনি মুখ তুল্‌লেন—সিংহের মত প্রকাণ্ড মাথায় হরিণের চোখ—আশ্চর্য্য উজ্জ্বল চোখ—জ্যোছ্‌না আর অশ্রুজল একত্র হ'য়েও সেই দু'টি চোখকে উজ্জ্বলতরো কর্‌তে পারে নি। দু'খানা আয়না মুখোমুখী রাখ্‌লে যেমন তা'রা পরস্পরের সংখ্যাহীন ছায়া সৃষ্টি করে, তেম্‌নি আমাদের দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হ'তেই তা'র ভেতর দিয়ে আমরা নিজেদের অনাদিবিস্তৃত অগণন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ কর্‌লাম;—সময় যখন শিশু, তখন থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী। এক মুহূর্ত্ত কেটে গেলো—শত সহস্র শতাব্দী। বিদ্যাপতিবাবু আবার আমার আঁচলে মুখ ঢাক্‌লেন। সেইন্ট্ ভেরনিকার রুমালে যীশুর মুখের ছাপের মত আমার ঐ বস্ত্রাঞ্চলে যদি আজ

তাঁর মুখচ্ছবি দেখতে পেতাম, তা হ'লে আমি একটুও বিস্মিত হ'তাম না।

পনেরো মিনিট আগে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে যে নেমে এসেছিলো, সে আর ফিরে' এলো না, তা'র শূন্য স্থান যে অধিকার করেছে, শেলির মত সে সুন্দর, ভাই, দেবতার মত সে অনির্ব্বচনীয়। বিশ্বের সকল কবিদের অপরূপ আনন্দ ও বেদনা, কল্পনা ও অনুভূতি আমার মনে নেবুর রসে লেখা ছিলো; এতদিন তা পড়তে পারি নি, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে প্রেমের আলো জ্বলেছে, তা'র উত্তাপে সেই লেখা উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে ফুটে' উঠেছে। নিজকে আবিষ্কার করলাম, ভাই,—এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে লেখে নি।

আমাদের এই বিবাহকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্যই বিধাতা সেই অল্প ক'টি সময়ের জন্য আকাশ থেকে করেছিলেন জোছনার পুষ্প-বর্ষণ,—নইলে ওপরে এসে আমি বিছানায় শোবামাত্র আকাশ ভেঙে কেন নামবে বৃষ্টি? জলের ধারা যে গান করতে-করতে পৃথিবীতে নামে, আমার আগে কেউ কি তা জেনেছে? দুপুর রাতে অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে'-শুয়ে' কিছুতেই ঘুমতে-না-পারাটি যে কত মিষ্টি, নীলা, তা প্রথম উপলব্ধি করলাম।

আজ সকালবেলা চোখ মেলতেই পৃথিবীর সঙ্গে আমার প্রথম শুভ-দৃষ্টি হ'ল। পুকুরের নীচের পাঁক থেকে আরম্ভ করে' আকাশের স্ফটিকাভ নীলিমা পর্য্যন্ত এমন-কিছু নেই, যা আমার ভালো না লাগছে। এমন কি, গোলাপীর উঁচু দাঁতও আজ ক্ষমা করতে পারছি।

এই পর্য্যন্ত লিখেছি, এমন সময় লেখায় বাধা পড়লো। বাবা পাশের বারান্দা দিয়ে তাঁর নিজের ঘরে যাচ্ছিলেন; আমার দরজার কাছে এসে কী মনে করে' থেমে দাঁড়ালেন। উৎফুল্লকণ্ঠে ডাকলাম, 'এসো, বাবা।'

বাবা এলেন। তারপর তাঁর মুখে যা শুনলাম, তা এই :

এইমাত্র তিনি বিদ্যাপতিবাবুর বাড়ি থেকে ফিরছেন। দেওয়ানজীর সঙ্গে মহালের দেখা-শোনা করতে বেরিয়েছিলেন, ফেরবার পথে পড়লো সেই বাড়ি। ভাবলেন, বিদ্যাপতিবাবু অনেকদিন আসেন না, একবার খোঁজ নিয়ে যাওয়া যাক্। গিয়ে দেখলেন, বিদ্যাপতিবাবু জ্বরে অচেতন হ'য়ে পড়ে' আছেন, তাঁকে দেখে চোখ মেললেন, কিন্তু চিনতে পারলেন বলে' মনে হ'ল না। চাকরের মুখে শুনলেন যে তিনি সন্ধ্যের একটু পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান্। যখন ফিরেছেন, রাত তখন আর বেশি নেই, এবং জামা-কাপড় সব বৃষ্টিতে এমন ভিজেছে যে মনে হয়, এইমাত্র তিনি নদীতে ডুব দিয়ে এসেছেন। কাপড় বদলাতে-বদলাতে চাকরকে বললেন, 'আমার বোধ হয় জ্বর হ'লো রে।' তারপর সেই যে বিছানায় পড়লেন, এ-পর্যন্ত আর-একটি শব্দও উচ্চারণ করেন বাবা কপালে হাত রেখে বুঝলেন, জ্বর খুব বেশী, এবং সম্ভবত চেতনা ঘোলাটে হ'য়ে গেছে। বাবা তৎক্ষণাৎ নিজের হাতে-লেখা চিঠি দিয়ে একটা লোককে পাঠিয়ে দিয়েছেন তারপাশার—সরকারী ডাক্তারকে ধরে' আনতে। অবিশ্যি নৌকোই যখন এ-অঞ্চলের একমাত্র যান, তখন ডাক্তারবাবুর আসতে-আসতে বিকেল। বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় চাকরটাকে যথাসাধ্য সাহস ও ভরসা দিয়ে মনুষ্যত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে' এসেছেন, কিন্তু দুপুরবেলায় তাঁকে আর-একবার যেতে হ'বে, কারণ তিনি—হ্যাঁ, তিনি একটু শঙ্কিত হ'য়ে পড়েছেন বই কি।

পরে বাবা বললেন, 'বিদ্যাপতিবাবু কাল সারা-রাত কোথায় যে ছিলেন এবং কী করে'ই বা ভিজলেন, সে এক রহস্য। বোধ হয় কাছের কোনো গ্রামে গিয়েছিলেন নেমন্তন্নে—বা কোনো কাজে—ফেরবার পথে মাঠের ওপর পান্ বৃষ্টি—সেখান থেকে নিকটতম আশ্রয়ও

হয়-তো মাইল-খানেক দূরে। আর ঐ শেষ-রাত্তিরে কাছাকাছি বাড়ি-ঘর থাক্লেই বা কী? স্বগৃহে উপস্থিত হ'তে-না-পারা পর্যন্ত কোনো আশ্রয়ের আশা নেই।--অথচ, আজ নাকি তাঁর এখান থেকে চলে' যাবার কথা ছিলো।'

বাবার কথা শুন্‌তে-শুন্‌তে আমি মনে-মনে কী ভাব্‌ছিলাম, জানিস্? আমাদের এখান থেকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছ্‌তে কোনো মতেই আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগ্‌বার কথা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় আধ ঘণ্টা ধরে' 'নব-ধারা-জলে' স্নান কর্‌তে বারণ কর্‌বেন। তা'র ফলেই এই জ্বর। প্রভুর অনুপস্থিতিতে ভৃত্য সন্ধ্যা থেকেই সুখ-নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তাই রাত-একটাকে নিশান্ত বলে' তিনি স্বচ্ছন্দে ভুল করেছিলেন।

বল্‌লাম, 'আমাকেও নিয়ে চলো না, বাবা—তাঁকে দেখে আসি।'

'তুই যাবি?' এই দু'টি কথায় বাবা অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞেস কর্‌লেন। অসঙ্কোচে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, যাবো। কারণ আজ্‌কে যে তাঁর এখান থেকে যাওয়া হ'ল না, সে-জন্য আমিই দায়ী।'

বাবার চোখ সংশয়ের মেঘে মলিন হ'য়ে এলো—কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই দেখ্‌লাম, সেই দৃষ্টি সত্যবোধের পরিচ্ছন্ন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

'তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে, বাবা।'

'কী, লীনা?'

'তোমার বিলেত-যাত্রার সঙ্গী-রূপে আর-একজনকেও নাও না!'

বাবা হাসিমুখে বল্‌লেন, 'বনবাসে যাওয়া তত দুঃখের নয়, লীনা, সমাজের মাঝখানে একঘরে হ'য়ে-থাকা যত। দু'টি লোক যখন পরস্পরের কাছে সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড় হ'য়ে ওঠে, তখন তৃতীয় ব্যক্তির

উপস্থিতি যে কতখানি বাহুল্য, তা আমি জানি। সেই তৃতীয় ব্যাকুল স্থান অধিকার করে' নিজেকে লজ্জা দিতে আমি রাজি নই। তোরা পরের জাহাজে আসিস্, আমি অবশ্য এই সুযোগে তোদের রবিঠাকুরের বইগুলো পড়ে' ফেল্‌বো। হ্যাঁরে, রবিবাবুর বইয়ের ইংরেজি তর্জমা পড়া যায় তো?'

'কিন্তু বাবা, আমার প্রতি তুমি বড্ড অবিচার করছ।'

'কেননা, নিজের প্রতি সুবিচার করতে হচ্ছে। "তৃতীয় ব্যক্তি"'র দুর্ভাগ্য জানি বলেই তোমার প্রতি ভয়। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তোর মা-কে জিজ্ঞেস্ করে' দেখিস।'

আমিও হেসে ফেললাম।—'তোমার সঙ্গে তর্কে কে পেরে উঠবে বাবা?'

'কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তর্কটা তো আদৌ আমার সঙ্গে হচ্ছিলো না। তুই তর্ক করছিলি নিজের সঙ্গে, এবং এই আত্ম-বিরোধে মানুষ সকলে হারতেই চায়।'

বলে' বাবা আমার ললাট চুম্বন করলেন।

জানিস নালা, বিদ্যাপতিবাবুর এই অসুখের খবর শুনে' আমার একটুও দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা হচ্ছে না। এখানেও আমি বিধাতার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই রোগ মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁকে আমার একান্ত নিকটে এনে দিয়েছে; সাধারণভাবে দিন কাটলে এই একান্ত অন্তরঙ্গতায় উপনীত হ'তে বহুদিন কাটতো। সেই দীর্ঘকালের ব্যবধান বিধাতা নিজ হাতে দিলেন সরিয়ে: কাল রাত্রে যিনি এটুকু সময়ের জন্য আকাশ ভরে' পাঠিয়েছিলেন জোছ্‌না, এই রোগও তাঁরি দান, মিলনতীর্থের দীর্ঘপথকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য তাঁরি একটা কৌশল। যা-কিছু হচ্ছে, তা'র মধ্যে সেই চির-মঙ্গলের পরম শুভেচ্ছা দেখ্‌তে পাচ্ছি।

প্রথম ও শেষ

আজ আর আমার মনে কোনো বিরোধ, কোনো সংশয় নেই; সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার পরিপূর্ণ শান্তিতে তা শরতের আকাশের মত স্তব্ধ ও সমাহিত। এমন কি, বিদ্যাপতিবাবুকে দেখ্‌তে যাবার জন্য কোনো অধীর উৎসুকতা নেই পর্য্যন্ত। কেননা, যা অবশ্যম্ভাবী, তা তো ঘটছে, আমার আজন্ম-তপস্যার ফল লাভ আমি করেছি;—দেবতা দিয়েছেন বর। এই বর আমি যখন ব্যবহার করি নে কেন, একবার যা পেয়েছি, চিরকালের মত তা পেয়েছি; তা ফিরিয়ে-নে'য়া—যিনি বর দিয়েছেন, তাঁরো অসাধ্য।

নীরা।

সোনারঙ্,
১লা আষাঢ়।

নীলা,

তারপাশা থেকে ডাক্তার এসেছিলেন, তিনি বললেন যে বিদ্যাপতি-বাবুর চিকিৎসার ভার-নে'য়া তাঁর সাহসে কুলোয় না, বিদ্যাতেও নয় বোধ হয়। বল্‌লেন—বুকে সর্দ্দি বসে' গেছে, নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে, তাই কল্‌কাতায় নিয়ে-যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং কাল আমরা সবাই কল্‌কাতা রওনা হচ্ছি—এবং এই খবর দিতেই তোকে এ-কার্ড্‌খানা লিখ্‌লাম। বুঝ্‌তে তো পার্‌ছিস, আমার পক্ষে বাড়ী থেকে বেরোনো সম্ভবপর হ'বে না—তুই-ই আসিস্, পরশু সকালেই আসিস্। সোনারঙ্ বছর-খানেকের মধ্যেই নাকি পদ্মার জলে তলিয়ে যা'বে, ইহজীবনে তা'কে আর দেখ্‌বো না, কিন্তু আমার স্মৃতির পৃথিবীতে তা আনন্দ-উজ্জ্বল ক্ষয়হীন আয়ু-লাভ কর্‌লো।

নীরা।

প্রথম ও শেষ

লীনার জীবনের যে অংশের অভিব্যক্তি আনন্দে, সৌন্দর্যে, করুণতায় উজ্জ্বলতম, তা'র পরিচয় এই চিঠিগুলিতে আপনারা, আশা করি, যথেষ্ট নিবিড় করে'ই পেয়েছেন। কিন্তু তা'র জীবনের চরম পরিপূর্ণতার কাহিনী আপনারা এখনো শোনেন নি। সে-কথা বল্‌বার ভার আমার নিজেরই নিতে হচ্ছে বলে' আপনারা অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

দশুই আষাঢ় ভোর-বেলা টেলিফোন্-এর আওয়াজে লীলার ঘুম ভেঙে গেলো। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সে সেটা তুলে' নিলে। তারপর নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্ত্তা হ'ল :

'কে? কে আপনি?'

'আমি।'

'ও, লীনা? কী খবর সব? ডাক্তার-নাগরতন কাল বিকেলেও এসেছিলেন তো?

'হ্যাঁ।'

'নার্স-দু'জন কালকেও সারা-রাত ছিলো?'

'দু'জন নয়, চারজন।'

'নতুন আরো আনানো হয়েছিলো? কেন? তোর মা-র শরীর ভালো আছে তো?'

'মা ভালোই আছেন।'

'কাল সারাদিনেও আমি একবার যাবার ফুর্‌সৎ করে' উঠ্‌তে পার্‌লাম না;—হঠাৎ আমার এক দেওর সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হয়েছেন—তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আজ যাবো। দশটা-নাগাদ তোর গাড়িটা একবার পাঠাতে পার্‌বি?'

'তোর আস্‌বার দর্‌কার নেই।'

'কেন?'

প্রথম ও শেষ

'বিদ্যাপতিবাবু এইমাত্র মারা গেলেন। না, তোর আস্‌বার দরকার নেই।'

আমার চারদিকে সহস্র কৌতূহলী কণ্ঠের প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছি : 'তার পর কী হ'ল? তারপর?'

কিন্তু তারপর আবার কী? লীনাকে আপনারা যতটুকু দেখেছেন, তা'তে তা'র ঐ মর্ত্যাতীত জ্যোতির্ময়ী মূর্তিকেই দেখেছেন, এবং সেই অতি-উজ্জ্বল আভাই যেন আপনাদের মনের চোখে নেশার মত লেগে থাকে। লীনা আপনাদের চোখে দীর্ঘজীবী নয়, উজ্জ্বলজীবী হোক্‌, এই আমার আন্তরিক কামনা। অনুরাগবতী উষসীর লাজরক্ত মহিমার অন্তে গোধূলির বিষণ্ণ, ধূসর ম্লানতা তো আছেই, কিন্তু আমরা—আমি ও আপনারা—আমাদের সমস্ত মন-প্রাণ ভ'রে উষসীকে পান করলাম, আমাদের কাছে আর তারপর নেই।

তবু কোনো পাঠিকা জিজ্ঞেস করতে পারেন—লীনা কি তা'র বাবার সঙ্গে বিলেত গিয়েছিলো? না, বিলেতে সে যায় নি, অক্‌স্‌ফার্ড্‌-এ ভর্তি হওয়া তা'র কপালে আর হ'ল না। তবে? তবে আবার কী? জলপাইগুড়ির একটা মেয়ে-ইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি ছিলো, সে সেটা নিয়ে নিলে। শিক্ষয়িত্রী? কেন? টাকার অভাব তো তা'র—। না, টাকার জন্যে নয়, বাঁচ্‌বার আশায়। তা টাকার জন্যেও খানিকটা বটে;—কারণ সে মনে করতো যে তা'র বিয়ে হ'য়ে গেছে, এবং বিয়ের পর পিতৃগৃহের ওপর মেয়েদের যখন আর অধিকার নেই, তখন নিজের সংস্থান সে নিজেই করতে চায়। কিন্তু সত্যি-সত্যি সে কি আর বিয়ে করে নি? তা করেছিলো বই কি—বিয়ে না ক'রে কোনো বাঙালী মেয়ে সারাজীবন কাটাতে পারে? কিন্তু অনেকদিন পর—

প্রথম ও শেষ

পুরো একটি বছর। পরের বছর দশুই আষাঢ় তারিখে তা'র বিয়ে হল। কা'র সঙ্গে? কা'র সঙ্গে আবার? ঐ ওখানকারই—অর্থাৎ জলপাই-গুড়ির—এক উকীল, নাম রসময় ঘোষাল। লীনার বাবা প্রতিজ্ঞা করেছেন বটে যে জীবনে আর তিনি মেয়ের মুখ দেখবেন না, কিন্তু তা'র মা বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। নীলারও নেমন্তন্ন হয়েছিলো, কিন্তু সে আস্‌তে পারে নি, কারণ তখন তা'র প্রথম সন্তান অন্তঃস্থ।

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

আমি তখন আমহার্স্ট স্ট্রীট-এর সেই মেস্‌টায় থাকি। সেই যে বাসি পাউরুটির রঙ য়ের তেতলা লম্বা বাড়িটা,—মেছোবাজার আর আমহার্স্ট স্ট্রীট এর মোড়ের কাছাকাছি, একটু এগুলেই সেন্ট পল্‌স স্কুল,—উল্টোদিকের ফুটপাথ-এ একটা ছোটখাটো বেচারি-চেহারার পানের দোকান,—'কিন্তু সারা কল্‌কাতার শহর ঢুঁড়লেও অমন পান আপনি কোথাও পাবেন না, অমন রসালো পান। চুণ-খয়ের-শুপুরির প্রোপোর্শান অদ্ভুত রকম পার্ফেক্ট।) নীচের ফুটপাথ এ দালানের ছায়ায় বসে' ক'গুলো—রিক্‌শ ওলা হ'তে পারে, তবে গুণ্ডা হওয়াই সম্ভব—এমনি চেহারার লোক সারা দুপুর খইনি চিবোয় আর জটলা পাকায়। তেতলায় একটিমাত্র ঘর,—বেশ বড় ঘরটি, রাস্তার দিকে গোটা চারেক জানলা, দক্ষিণে একটা ও উত্তরে আধখানা,—কলকাতার পক্ষে আলো-হাওয়ার একটু বাড়াবাড়িই বলতে হ'বে। ঘরটি গোড়ায় থ্রী সীটেড ছিলো, কিন্তু কী করে' সে-ঘর আমার একারই হ'য়ে গেলো—সে-ও এক মজার ব্যাপার।

প্রথম রাত্তিরেই কাণ্ড হ'ল। দশটা বাজে। খাওয়া-দাওয়ার পর অন্য দু' ভদ্রলোক বিছানায় লম্বা হয়েছেন,—একজনের মুখে বিড়ি, আর-একজনের হাতে দু' বছর আগেকার ই, আই, রেলোয়ের টাইম-টেব্‌ল। আমি টেবিলে বসে' ছোট্ট একটি গেলাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে একটু একটু করে' খাচ্ছি। খাচ্ছি তো খাচ্ছিই। সবে একটু ঘোর লেগে আসছিলো, এম্‌নি সময় শুনলাম, "মশায়ের বুঝি কোনো অসুখ-টসুখ আছে?"

ফিরে' তাকিয়ে দেখি, একজনের বিড়িটে গেছে নিবে' ও অন্যজনের টাইম্‌-টেব্‌লখানা হাত থেকে বুকের ওপর নেতিয়ে এসেছে। দু'জনের মুখই মুর্গীর মুখের মত লাল ও গম্ভীর।

হেসে বললুম, "আজ্ঞে না, শরীর আপনাদের আশীর্ব্বাদে সুস্থ আছে। নেশা করবার উদ্দেশ্যেই খাওয়া।"—পরে একটু ... করার লোভ সামলাতে না পেরে বললুম, "ইচ্ছে করেন?"

বিড়িখোরটি এ-কথায় সটান উঠে' বসলেন। রাগের ঝোঁকে আধ-পোড়া বিড়িটে দাঁত দিয়ে চিবোতে-চিবোতে বললেন, "জানেন, ... ভদ্র লোকের মেস?"

এক চুমুক টেনে বললুম, 'বুঝতেই ... পারছেন। না জানলে কি আর আমি এখানে আসি।"

টাইম-টেবল পড়ুয়াটি তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে' আমার ... কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "বুঝলেন, ও সব ন-নষ্টামির জায়গা এ নয়। আমি মিটিং কল করে' কালই আপনাকে না তাড়াচ্ছি তো কী বললাম। যত সব ইয়ে। হয় আপনি যা'বেন, নয় আমরা"

'তা লে আপনারাই যান। সুখের কথা।"

"বটে?" ভদ্রলোক তেড়ে-মেড়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে আমার একটা হাঁচি এলো। সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোক দু'পা পেছিয়ে নিজের অজান্তেই বলে' ফেললেন, "ও বাবা।"

পরের দিন সকালে ম্যানেজার বাবু এসে বিনীতভাবে সব কথা বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমাকে জানালেন যে, যে-হেতু মেস-এর সব মেম্বরই এতে আপত্তি প্রকাশ করছেন, আমার পক্ষে এটা সুবিধের জায়গা হ'বে না।— বরঞ্চ অন্য কোনো মেস্

মাথাটা ধরে' ছিলো, বালিশ থেকে মাথা না তুলেই বললুম, "অন্য কোনো মেস্-এ যেতে আমার কিছুই আপত্তি নেই;—তবে কে আবার অত হাঙ্গাম করতে যায়, বলুন? তা ছাড়া, আপনাদের এ-ঘরটিতে আমার ভারি পছন্দ।"

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

ম্যানেজারবাবু মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, "কিন্তু আপনার রুম-মেইটরা যে একেবারে ক্ষেপে গেছেন!"

বিছানা হাতড়ে একটা সিগ্রেট পাওয়া গেলো। ওটা জ্বালাতে জ্বালাতে বললুম, "দুর্বোধ্য হ'ল। ওঁদের সরাতে বলুন।"

"কিন্তু ওঁরা যে অনেকদিনকার —"

"তা'লে তাঁদের এই মেস্-এর অন্য কোনো ঘরে চালান করুন।"

"কিন্তু এ-ঘরটি যে থ্রী —"

"এমন দু' ভদ্রলোককে এখানে পাঠান, যাঁদের অভ্যেস-টভ্যেস আছে।"

"তেমন কেউ তো নেই।"

"নেই নাকি? শুনে ভারি আনন্দ হ'ল। তা'লে আর কী করা? না হয়, আপাতত আমার মামাবাড়িতেই গিয়ে উঠি। চাকরটাকে বলুন্ ততক্ষণ, আমার জিনিষ-পত্তরগুলো বেঁধে-ছেঁদে রাখুক। আপনাদের এখানে ফোন আছে?"

"না। কেন?"

"তা'লে মামাবাড়িতে একটা খবর পাঠানো যেত।"

"আপনার মামা কী করেন?"

"বিশেষ-কিছু নয়। হাইকোর্টের জজিয়তি।—আমাকে এক পেয়ালা চা [illegible] এনে দিতে পারেন?"

"বিলক্ষণ। পাবি আবার নে। দু'পা দূরেই তো বাকার দোকান। এক্ষুনি নিচ্ছি আনিয়ে। তা, আপনি এ-বেলাই যাবেন? দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বরং বিকেলে —"

বিকেলে আমি গেলাম না; গেলেন আমার যুগল-রুম্-মেইট্। দোতলায় একটা ঘর খালি ছিলো, স্থানবিশেষের সংলগ্ন বলে' সেটাতে কেউ থাকতো না। তা-ই সই।

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

ফলে আমি ও-মেসে যদ্দিন ছিলাম, ও ঘরটায় একাই ছিলাম।

সেই মেস্-এ থাকার সময় একটা ঘটনায় আমি তখনকার মত ভারি আমোদ পেয়েছিলাম। সেই কথাই আপনাদেরকে বল্ছি।

অভিলাষ আমার অনেককালের বন্ধু। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার থেকে ওর সঙ্গে আমার ইয়ার-পনা। বি-এ ক্লাশে উঠে'ই রোজ ক্লাশে এসে বসাটা আমার কাছে অতিমাত্রায় প্লিবিয়ান্ ঠেক্তে লাগলো, সঙ্গে-সঙ্গে এমন একটা—যা'কে বলা যেতে পারে ডিগ্রাফোবিয়া—হ'ল যে, আমি মনে-মনে শপথ করলুম যে আশু মুখুয্যে যতই না কেন চেষ্টা করুন, আমি বাবা কিছুতেই ক্যাল্কাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট হচ্ছি নে। সেই থেকেই পড়াশুনোয় ইস্তফা। বাবা বল্লেন, "বিলেত যা।" বল্লুম, "পড়তে? কেম্ব্রিজের চেয়ে তা'লে ক্যালকাটাই ভালো, কারণ পাশ করা সোজা।" মা বল্লেন, "বিয়ে কর।" বল্লুম, "বি-এই পাশ কর্তে পারলুম না, আবার বিয়ে।" বোনরা বল্লে, "তুমি এখন কী করবে দাদা?" উত্তর দিলুম, "লিখ্বো।"

সেই থেকেই লিখ্ছি। লেখাটা আমার সখ বল্তে পারেন, কিন্তু এ সখে আমি সুখ পাই, এই আমার সাফাই। সখ জিনিষটাই সুখের—নয় কি?

অভিলাষ কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বি এ পাশ করলো। তার-পর একটা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ্ নিয়ে এম্-এতে ভর্ত্তি হ'ল, ল ক্লাশেও নাম রাখ্লো একটা। হাতের পাঁচ।

এতৎসত্ত্বেও অভিলাষের সঙ্গে আমার খুবই মাখামাখি। মুখে তো বটেই, মনেও। যদিও ওর সঙ্গে মিলের চাইতে আমার অমিলই বেশি।

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

একটা উপমা দেবো? ধরুন্, ও যেন মিল্‌টনের একটি সনেট্—ঠাস-বুনোন, পাকা কথা, কোথাও একটু ফাঁকা বা ফিকে নয়—আগাগোড়া জমাট্। ওর মধ্যে শিল্পের যে-স্বল্পতা, সেইটেই ওর গৌরব। আর আমি যেন রবীন্দ্রনাথের এক চতুর্থ শ্রেণীর অনুকারকের লেখা দীর্ঘ, অসমচ্ছন্দের কবিতা;—আগাগোড়া আল্‌গা, বেজুত, নড়্‌বড়ে; বেতালা মাতালের মত বেসামাল পা ফেলে-ফেলে চলেছে;—না আছে একটা বাঁধ, না কোনো বোধ। শস্তা সাবান একটু চট্‌কালেই যেমন অনেকগুলি ফেনা বেরোয়, তেম্‌নি খানিকটা খেলো উচ্ছ্বাস, ফেনার মতই হাল্‌কা, ফিন্‌ফিনে। মোটের ওপর কোনোই মানে হয় না।

এই উপমা যে কতখানি সার্থক, তা আপনারা একটু পরেই টের পাবেন।

অথচ অভিলাষকে আমার ভালো লাগ্‌তো। এখনো লাগে—তবে তখনকার ভালো-লাগাটা ছিলো অন্য-রকম। অভিলাষের চেহারা সেই জাতের, যা'কে সুন্দর বল্‌তে ঠেকে, কিন্তু সুদর্শন বলে' ভাব্‌তে আট্‌কায় না। রঙ্—সাধারণত এবং স্বভাবত বাঙালীদের যেমন হ'য়ে থাকে,—অর্থাৎ, ঈষৎ কালো; মাঝারি লম্বা, দোহারা গড়ন, দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ বিশেষ করে' স্থূল। হাতের আঙুলগুলি মোটা-মোটা, নাক একটু নিম্ন, চোয়ালের হাড় দু'টো চোখে-পড়ার মত—এবং সেই জন্যই চোখ দু'টো দেখায় টানা-টানা, চিকণ। সব মিলে' মুখে একটু চীনে-চীনে ভাব। তবে, অভিলাষের গোঁফ ছিলো।

এইটুকু অভিলাষের বাইরেকার পরিচয়। ভেতরের খবরও এক্ষুনি পা'বেন। আর-একটা কথা এখানেই বলে' রাখা ভালো। অভিলাষের হাস্‌বার ক্ষমতা ছিলো অদ্ভুত;—যে-কোনো সময়ে এবং যে-কোনো কারণে অত চেঁচিয়ে এবং অতক্ষণ ধরে' হাস্‌তে আমি আর-কাউকে শুনি নি। মনে পড়ে, ওর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনে কলেজের কমন্-রুম্-এ

ওর ঐ হাসির আওয়াজ শুনে'ই আমি তখুনি যেন গোটা মানুষটাকেই আন্দাজ করে' নিয়েছিলুম। ও ছিলো আমার হাসির গ্রামোফোন্; মনে যখনই মর্‌চে পড়ি-পড়ি কর্‌তো, তখনই ওকে চালিয়ে দিয়ে মন ঝালিয়ে নিতুম। যে-লোক এত হাসে তা'কে আপনারা নিশ্চয়ই খুব ফূর্ত্তিবাজ ভাবছেন; কিন্তু ওর অবস্থাটা শুনুন্।

যে দিনের কথা বল্‌ছি, সে দিনটা পড়েছিলো অঘ্রাণের মাঝামাঝি। সময়, বিকেল। ডার্ব্বি জুতো মচ্‌মচ কর্‌তে-করতে অভিলাষ এসে আমার ঘরে ঢুক্‌লো। আমাকে টেবিলের ওপর উবু হ'য়ে বসে' থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞেস করলে, "কী লিখছ?"

আমি কলমটা রেখে দিয়ে চেয়ারটা ঘুরিয়ে ওর মুখোমুখি হ'য়ে বল্‌লাম, "গল্প লিখছিলাম। কিন্তু তুমি যখন এলে, গল্প লিখবো আর না, কথা কবো।"

অভিলাষ, আমার কথার শেষের দিকটা যেন শুনতে পায় নি, এম্‌নি ভাবে বল্‌লে, 'গল্প লিখতে পারো না, তবু মিছামিছি সময় নষ্ট করো কেন?

বল্‌লুম, "অন্য কোন কাজ করে' সময় নষ্ট করতে কষ্ট হয় বলে'।"

কথাটা ওর মনে ধর্‌লো না। বললে, 'গল্প লিখে' তোমার যতই না মনের বিরাম হোক্, সেগুলো পড়ে' লোকের ব্যারাম না হয়, সেদিকে নজর রাখ্‌ছো তো?"

আমি বিনীতভাবে বল্‌লুম, "আমার গল্প কাগজ-পত্রে ছাপা হচ্ছে বলে'ই তো তোমার আপত্তি? সে আমি কী কর্‌বো? মামাতো বোন্‌কে দিয়ে নকল করিয়ে মামা-বাড়ির ঠিকানা দিয়ে পাঠাই,—দেখি, কোনো গল্পই ফেরৎ আসে না।"

"যেমন বাঙ্‌লা দেশ, তেম্‌নি হাঙ্‌লা লিখিয়ে। আমি কোনো কাগজের সম্পাদক হ'লে তোমাকে মজা দেখাতাম।"

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

"আচ্ছা অভিলাষ, সত্যি কি আমি এতই খারাপ লিখি যে তা পড়া যায় না, বা পড়্‌তে বস্‌লেই মাথা-ধরা নিয়ে উঠ্‌তে হয় ?"

"ছোঃ ! ও-সব কি একটা লেখা ! তুমি লিখ্‌ছো, কারণ লেখাটা আজকাল এ-দেশে ফ্যাশ্‌নেব্‌ল্ হ'য়ে উঠ্‌ছে। তোমার পক্ষে গল্প-লেখা গোঁফ-কামানোর মতই একটা বাতিক।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তাই চুপ করে' রইলাম।

অভিলাষ বল্‌তে লাগ্‌লো, "দেশের যে হাল দেখ্‌ছি, তা'তে মনে হচ্ছে আর কিছুদিন পরে খবরের কাগজের প্রজাপতি-বৈঠকী বিজ্ঞাপনে পাত্রীর qualification-এর মধ্যে একটি থাক্‌বে, 'অল্প-অল্প কবিতা লিখিতে জানে।' কবিতা-লেখা কি চচ্চরি-রান্না না চর্‌কা-চালানো, যে সব্বারি তা না কর্‌লে জাত যা'বে ?.........এই তো তুমি বাণীশ,— কল্‌কাতায় বসে'-বসে' টুর্গেনিভ্ আর অস্কার্ ওয়াইল্ড্ কপ্‌চাচ্ছো, আর ভাব্‌ছো বাঙ্‌লা-সাহিত্য বুঝি তোমার ভার আর সইতে পার্‌ছে না। ওরে ইডিয়ট্, তোমার চেয়ে মণি বোস্‌ও যে ভালো ছিলো, ভাষায় তবু উড়িয়ে নিতো। তুমি তো বাঙ্‌লাও লিখ্‌তে জান না! তুমি গল্প লেখ্‌বার কে ? লিখ্‌বো আমি! দেখ্‌তে, তা'লে কি-সব জিনিষ বেরুতো—যা কখনো হয় নি—"

"থাক্, আর 'বসুমতী'র বিজ্ঞাপনের ভাষা চুরি করে' একাধারে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়ো না।—কিন্তু এতই যদি তোমার লেখায় হাত, তা'লে চুপ করে' আছ কেন ?"

এইখানে অভিলাষ হেসে ফেল্‌লো। ডান্ হাতের দু'টো আঙুল মুখের মধ্যে গুঁজে' ছেলেমানুষের মত খিল্‌খিল্ করে' হাস্‌তে-হাস্‌তে ও লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। একটু যেন লজ্জিত হয়ে' বল্‌লে, "লিখ্‌বো, লিখ্‌বো। এখনো সময় হয় নি। আর একটা বছর সবুর করো।

...কই, দেখি কি লিখ্‌ছিলে? হাতের লেখাটাকে কিন্তু খুব বাগিয়েছো!"

অভিলাষের মনে কোনো রোষের সঞ্চার হ'লে ও সেটাকে বেশিক্ষণ টেনে রাখ্‌তে পারে না, এই ওর দোষ। একটুক্ষণ আগে ওর মনে যে-উত্তেজনা শীতের বরফের মত (এ-উপমাটা একেবারে নরোয়ে থেকে আমদানি;—কসুর মাপ করবেন।) জমে' উঠ্‌ছিলো, ওর হাসির চাপে তা গেলো ফেটে। হাসিকে পোষ মানাতে না পেরে ও আমার সঙ্গে আপোষ কর্‌তে এলো; কিন্তু ওকে আবার উস্কে দে'য়ার জন্যে আমি ওর হাত থেকে কাগজের তাড়া ছিনিয়ে নিয়ে বল্‌লুম, "আচ্ছা অভিলাষ, তুমি মুখে তো এত বলো, একটা গল্প লিখে ফেলে' আমাদেরকে একবার দেখিয়েই দাও না যে বাঙ্‌লাদেশে একজন গর্কী—না, তোমার গড্‌ তো হার্ডি—একজন হার্ডি দেখা দিয়েছেন।"

অভিলাষ দু'হাত ছড়িয়ে একটা অত্যন্ত নিরুৎসাহকর ভঙ্গী করে' বল্‌লে, "যা—যাঃ! বাজে বোকো না।" বলে'ই খামকা একটু হেসে ফেল্‌লো।

বুঝ্‌লুম, অভিলাষ লজ্জা পেয়েছে। ওকে যদি আপনি বলেন, "তুমি তো ঢের পড়াশুনো করেছো হে!" বা, ও যে বি-এ তে অল্পের জন্য ফার্ষ্ট হ'তে পারে নি, সে-কথা যদি কেউ ওকে স্মরণ ক'রিয়ে দেয়, তা'লে ওর পক্ষে যতটা লাল হওয়া সম্ভব, ও তা হ'বে। নিজের প্রশংসা ও একেবারেই শুন্‌তে পারে না। এখেনেও ও আমার উল্টো।

আমি গম্ভীরভাবে বল্‌তে লাগ্‌লুম, "আমি যতই বাজে লিখি নে কেন, (যদিও তুমি আমার লেখাকে যত বাজে মনে করো, আমি নিজে ততটা করি নে), তবু তো আমি লিখি। তুমি তো তা-ও লেখো না! আমার নাম দু'দশজন লোকে জানে, পূজোর সময় আমি ছ'জন

সম্পাদকের অনুরোধপত্র পেয়েছিলাম, এবং শুনে' হাস্‌বে, কাউকে নিরাশ করি নি। তুমি বল্‌বে, এটা একটা third-rate facility। হ'লই বা। আমি খুব বেশি লিখ্‌তে পারি, সেটাই বা কম কথা কী? তুমি তো আজ অবধি এক কলমও লেখো নি। লোকে আমাকে লেখক বলে' মানে, তোমার নামও জানে না। এইখেনে আমারই জিৎ।"

এতখানি বকে'ও অভিলাষের মনটাকে যথেষ্ট শানিয়ে তুল্‌তে পার্‌লুম না। এত কথার উত্তরে ও শুধু বল্‌লে, "এখন সময় পাচ্ছি নে; কিন্তু I am seething with ideas;—হঠাৎ লোকের তাক্ লাগিয়ে দেবো।"

"আগে তোমার বাক্‌স্ফূর্তি হোক্, তবে তো তাক্ লাগাবে। তা যদ্দিন না হচ্ছে, আমাকেই তোমার চেয়ে বড় লেখক বলে' মান্‌তে তুমি বাধ্য। কেননা, আমি লিখেছি ও লিখ্‌ছি, আর তুমি কখনো লেখো নি। আইডিয়া তোমার যতই থাক্ না, কি আসে-যায়? তোমার মাথাটা তো কাঁচের নয়, আর আইডিয়াগুলো তো হীরের কুচি নয় যে সবাই দেখ্‌তে পাবে, তোমার ব্রেইনের সবগুলো সেল্-এ লাখ-খানেক আইডিয়া জল্‌জ্বল্ কর্‌ছে। যতক্ষণ না সেগুলো কথায় গেঁথে বাইরে জাহির কর্‌তে পার্‌ছো, ততক্ষণ ও থাকা-না-থাকা সমান। আমার লেখায় হয়-তো কোনো আইডিয়াই নেই, কিন্তু তা'র প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে তা চোখে দেখা যায়।··· দ্যাখো, ও-সব 'ম্যুট্ মিল্‌টন্'-ফিল্‌টনে আমি বিশ্বাস করি নে। ম্যুট্ই যদি হ'ল, তবে আবার মিল্‌টন্ কি? নীরব হ'লে আবার কবি কিসের? তুমি যদি আজ মরে' যাও, তা'লে এ-কথা কি কেউ ভাব্‌বে যে এ-লোক বেঁচে থাক্‌লে হার্ডি হ'ত?"

"তা ভাব্‌বে না; লোকে আমাকে একেবারেই ভুলে' যাবে। সেটা

মন্দর ভালো; কিন্তু তোমায় মর্‌তেও হ'বে না; দশ বছর পরে যখন আবার সাহিত্যের ফ্যাশান্ বদ্‌লাবে, তখন তোমার নাম নিয়ে সবাই হাসাহাসি কর্‌বে, এবং সে-দৃশ্য তোমায় দেখ্‌তেও হ'বে। ট্র্যাজিডি তোমারটাই বড়। যদি কখনো কিছু লিখি, এমন-কিছুই লিখ্‌বো, যা সময়ের সমবয়সী। সকালের ফ্যাশান্ বিকেলে বদ্‌লায়, কিন্তু আর্ট চিরকালের।"

অভিলাষের সঙ্গে তর্ক কর্‌ছি দেখে আপনারা ভাববেন না যে ওর মতের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র বৈষম্য আছে। কিন্তু ওর সকল কথা সত্য বলে' জানা সত্ত্বেও আমি ওর সঙ্গে তর্ক কর্‌তে লাগ্‌লুম, কারণ তর্ক-করারই একটি সৌখীন সুখ আছে। বিশেষত যখন হার নিশ্চিত বলে' জানি, তখনই আমার মজা লাগে সব চেয়ে বেশি।

বল্‌লুম, "আর্ট্ জিনিষটে সকালের না বিকেলের না মহাকালের, সে আলোচনায় কোনো দর্‌কার নেই। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে তুমি এ-পর্য্যন্ত কিছু লেখো নি, কারণ লিখ্‌তে তুমি পারো না। যে লিখ্‌তে পারে, সে না লিখে' পারে না।"

অভিলাষ এতক্ষণ চেয়ারের পিঠে হেলান্ দিয়ে দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে বসে' ছিলো; এই কথা শুনে' খাড়া হ'য়ে উঠে' বস্‌লো। কথাগুলোতে বেশ জোর দিয়ে বল্‌লে, "পারি নে মানে? নিশ্চয়ই পারি। তোমার চেয়ে উনিশগুণ পারি—জানো?"

"তবে লেখো না কেন?"

"লি খি নে কে ন? কখন্ লিখ্‌বো? কী করে' লিখ্‌বো? কোথায় বসে' লিখ্‌বো? ভোর ছ'টা থেকে রাত বারোটা অবধি যে-কোনো সময়ে আমাদের বাড়ি যদি যাও, সোর শুনে' ভাব্‌বে, বাড়িতে আগুন লেগেছে বা নতুন জামাই এসেছে। রোজ সকালে বাজার

করতে হয় ; দুপুরে ইউনিভার্সিটি-লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ি, কেননা, বাড়িতে অসম্ভব, বিকেলে ল-ক্লাশের পর ট্যুশানি ; তারপর বাড়ি ফিরে' তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করে' থেকে রাত বারোটা থেকে সকাল চারটা অবধি গল্প লিখ্‌তে বলো ? দারিদ্র্য কথাটার মানে যে কী, তা তো জানো না !"

"কিন্তু এই দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে'ই তো মানুষ খাঁটি সোনা হয়।"

অভিলাষ টেবিলের ওপর প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে' অসহিষ্ণুভাবে বলে' উঠ্‌লো, "থাক্, থাক্,—ও-সব cant আউড়িয়ো না।"

আমি হেসে বল্‌লাম, "রাগ কোরো না, অভিলাষ, ও-কথাটা আমার নিজের নয়। কোন্ বাঙ্‌লা নভেলে যেন পড়েছিলাম—তোমার কাছে quote কর্‌লাম মাত্র।"

অভিলাষ চেয়ার ছেড়ে উঠে' অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগ্‌লো। আমি মনে মনে এই ভেবে খুসি হ'লাম যে লোকটাকে এতক্ষণে পথে আনা গেছে। ও এখন যে-সব কথা বল্‌বে, সেগুলো আঁচ করে' নিয়ে চোখা-চোখা জবাব আগে থেকেই শান দিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌লুম।

অভিলাষ চল্‌তে-চল্‌তে হঠাৎ আমার সুমুখে এসে থেমে বল্‌তে লাগ্‌লো, "দারিদ্র্য-সম্বন্ধে কথা-বলার তুমিই উপযুক্ত লোক বটে—যে ইচ্ছে করলে একশো টাকার নোট্ দিয়ে নৌকো তৈরী করে' জলে ভাসাতে পারে। বাপ যা'র ব্যারিস্‌টার্, মামা যা'র হাইকোর্টের জজ্, পার্ক্ স্ট্রীটে, দার্জিলিঙে আর রাঁচিতে যা'র বাড়ি আছে সখ্ করে' যে তিরিশ টাকার মেস্-এ থাকে, সময় কাটাবার জন্যে যে গল্প লেখে দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে' মানুষ কতটা সোনা হয়, সে-কথা বিচার কর্‌বার অধিকার তা'রই তো আছে !"

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন

"আহা—সোনা-টোনার কথা কি আমি বলেছি ছাই যে ও-কথা বলে' আমাকে জব্দ কর্‌ছো! আর, দুর্ভাগ্যবশত গরীব হ'তে পারি নি বলে' যে এক-আধটা গল্পও লিখ্‌তে পার্‌বো না, এই বা কোন্ আব্‌দার?"

ততক্ষণে অভিলাষের মাথায় রক্ত চড়ে' গেছে; আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বলে' উঠ্‌লো, "আর সৌভাগ্যবশত গরীব হয়েছি বলে'ই যে আমাকে গল্প লিখ্‌তেই হ'বে, এই বা কোন্ জুলুম?"

"এ-জুলুম তোমার উপর কে খাটিয়েছে?"

"কেন? এই একটু আগেই তো তুমি বলছিলে যে আমি আদপেই লিখ্‌তে পারি নে, নইলে অ্যাদ্দিনে কিছু-না-কিছু বেরুতোই। তেতলার ঘরে ইজি-চেয়ারে শুয়ে'-শুয়ে' আকাশের দিকে তাকিয়ে এ-কথা ভাবা খুবই সোজা;—কিন্তু আমার অবস্থায় পড়্‌লে তুমি—গল্প-লেখা দূরের কথা—তল্পিতল্পা গুটিয়ে তিব্বতে পালাতে, কিম্বা তা না পারলে আত্মহত্যে কর্‌তে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, তাই। তুমি কি মনে করো আমি কখনো লিখতে বসি নি? কতবার যে বসেছি, হয়-তো অনেকদূর এগিয়েওছি,—হঠাৎ এমন একটা-কিছু ঘটে' বসলো, যা'র পর পাগল হ'য়ে না যাওয়াটাই আশ্চর্য্য! কুচি-কুচি করে' সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে' এসেছি। কত-দিন এমন হয়েছে—বাইরে থেকে মনে-মনে প্রায় আগাগোড়া একটা গল্প তৈরি করে' নিয়ে বাড়ী ফিরেছি—কাগজ-কলম নিয়ে লিখে' ফেললেই হয়;—বাড়িতে ঢুকে'ই শুনি তুমুল ঝগ্‌ড়া বেধেছে—মা-বাবায় বা বাবা-দাদায় কি বৌ-দি আর ছোট বোন্-এ। সারা বাড়ী তোলপাড়। কোথায় গেলো গল্প, আর কোথায় কি? বাড়িতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই

এম্‌নি ঝড় বইছে। ভাগ্যিস্ মানুষের ঘুমুতে হয়, নইলে রাতকেও ওরা রেয়াৎ কর্‌তো না। টাকার বিষম টানাটানি, তাই মেজাজ সবারি তিরিক্ষি। কেউ কখনো হাসে না, আস্তে কথা বলে না। যদি তুমি গিয়ে কাউকে মিষ্টি করে' কথা বলো, তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখ্‌বে। এমন কি বুড়ি ঝিটা পর্য্যন্ত সব সময় কারো-না-কারো মাথা চিবোচ্ছে। বাবা বুড়ো হয়েছেন; বাইশ বছর বয়সে তেত্রিশ টাকা মাইনেয় লাইফ-ইন্‌সিয়োরেন্স্-আপিসে ঢোকেন; ঠেল্‌তে-ঠেল্‌তে সাতান্ন বছর বয়সে এক শো-তে এসে ঠেকেছেন—এখানেই খতম! পয়লা তারিখে মাইনে পান;—দশুইব মধ্যে সব ফর্সা, একটি পয়সাও থাকে না। তবু দেনা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আমরা খাই কী, জানো? ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ—ক্বচিৎ এক টুক্‌রো মাছ। একদিন বিকেলে বাবাব কাছে তিনটি পয়সা চেয়েছিলাম; তিনি জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, 'কী কর্‌বি?' বল্‌লুম, 'চা খাবো।' পয়সা তিনি দিলেন, কিন্তু রাত্তিরে শুন্‌লুম, মা-কে বল্‌ছেন, 'অভিলাষ এ-বেলা ভাত খেয়েছে? তা'লে চা খাবাব জন্য পয়সা চেয়ে নিয়ে গেলো কেন?' শুনে' ইচ্ছে হয়েছিলো, গলায় আঙুল দিয়ে সব উগ্‌রে ফেলে দি।

"অথচ আমাব বাবা লোক খারাপ ছিলেন না। আমারই ছেলে-বেলাতে তাঁকে অন্যবকম দেখেছি। মেজাজ খিট্‌খিটে হ'তে-হ'তে এখন তিনি একটি পাকা tyrant হ'য়ে উঠেছেন। হ'বেনই বা না কেন? আমাদের দেশে অন্য কোনো দেবতা মুখ তুলে' না চাইলেও মা-ষষ্ঠীর অনুগ্রহ প্রচুব। সব মিলে' আমবা ন' ভাইবোন্। বোন পাঁচটি। দু'জন নাকি এরি মধ্যে বড় হ'য়ে উঠেছে—আর বেশিদিন রাখা যা'বে না। ছোট দু' ভাই ইস্কুলে যায়; কারণ তারা ছেলে, বড় হ'লে আপিসে কলম-পেষা তা'দের পেশা করে' নিতে হ'বে। মেয়েদেরকে কর্‌তে

হ'বে বিয়ে, কাজেই বরকে চিঠি লেখ্‌বার মত বিদ্যে হ'লেই তাদের চলে। বাবার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে' আমি সেই দু' বোন্‌কে ইস্কুলে দিয়েছি ;—আমিই পড়াই এবং পড়ার সব খরচ চালাই। আর তিনটি বোন্ শিশু—তা'রা সুখে কাদায় গড়ায়, আর দুঃখে কাঁদে ;—কুকুর ছানার মত সে কী বিশ্রী, করুণ কান্না, ভাই। পড়ে'-পড়ে' মার খায়, ভালোমত জামা-টামাও পর্‌তে পায় না! মা বলেন, 'ওদের ঈশ্বরের নামে ছেড়ে দিয়েছি।' বেশ, তা'ই দাও। আমি বি-এ পাশ কর্‌লুম পর বাবা কোন্-এক আপিসে আমাব জন্যে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের এক চাকৃরি ঠিক করে' এলেন। আমি তো কিছুতেই যাবো না, জোব করে'ই এম্-এতে ভর্ত্তি হ'লুম। বাবা বল্‌লেন, 'আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা।' গেলাম। কিছুদিন একটা মেস্-এ গিয়ে কাটালাম। ভালোই ছিলাম। শেষে একদিন মা নিজে গিয়ে আমাকে নিয়ে আসেন। পরে শুন্‌লাম, আমি বত্রিশ টাকা স্কলার্‌শিপ্ পেয়েছি শুনে' বাবার মন নাকি ভিজেছে।...এই টাকার খাঁকৃতি কি বাবার চিরকালই ছিলো? এই তো সেদিন দেনা শোধ কর্‌বার জন্য দাদার বিয়ে দিলেন, পেলেন নগদ দু' হাজার। কড়্‌কড়ে টাকা। অতগুলো টাকা কোথা দিয়ে কী করে' যে ফুটুরফাটুর হ'য়ে গেলো, কিছুই টের পেলাম না ; অথচ এখনো দেখি, দেনার কথা বলে' বাবা দেয়ালে মাথা ঠোকেন। বাবার হাতে পড়্‌লেই টাকার যেন পাখা গজায়—অথচ সব টাকাই তাঁর নিজের হাতে খরচ করা চাই। মা-কে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন না। আমার কাছ থেকে মাসে-মাসে স্কলারশিপ্-এর সমস্ত টাকা গুণে নেন্। জানি যে বাজে খরচ হ'বে, তবু না দিয়েও পারি নে। আমি যে টুশানি করি, তা বাবা জানেন না ;—সে টাকা আমি গোপনে মা-কে নিয়ে দি ;—বাবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত পরিবারের ঐ ক'টি টাকা মাত্র

সম্বল।...আর কেউ রোজগার করে না; দাদার লাট-সাহেবী মেজাজ, কোনো কাজই নাকি তাঁর রোচে না। আই-এস্‌সি পাশ করার পর হেস্ত-নেস্ত হ'য়ে বেঙ্গল্ টেক্‌নিকেল্-এ ঢুকেছিলেন। পড়্‌ছিলেন তো পড়্‌ছিলেন, ফাইনেল্-এর বছর হঠাৎ কী মর্জ্জি হ'ল—দিলেন ছেড়ে। তারপর কিছুদিন শর্টহ্যাণ্ড্ টাইপ্‌রাইটিং শিখ্‌ছিলেন,—সেখান থেকেও কা'র সঙ্গে যেন ঝগড়া-টগ্‌ড়া করে' বেরিয়ে এলেন। গত ষোলো মাসের মধ্যে তিনি এক বিয়ে ছাড়া আর এমন-কিছু করেন নি, যা লোকের কাছে বলা যেতে পারে।...অথচ আজ শুন্‌লাম, বৌ-দি নাকি এরি মধ্যে—এরি মধ্যে—"

অভিলাষ কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে হঠাৎ থেমে গেলো। আমি বল্‌লুম, "এ আর আশ্চর্য্য কি, অভিলাষ? বরং না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।"

অভিলাষ বোমার মত ফেটে পড়্‌লো: "হ্যাঁ, তুমি লাখ্ টাকার মালিক কিনা—তুমি তো এ-কথা বল্‌বেই! কিন্তু আমাদের কাছে—it means one more mouth to feed, বুঝ্‌লে? one more mouth,...তা-ছাড়া, এ আমি ভাবতেও পারিনে বাগীশ,—বৌ-দি যে নিতান্ত ছেলেমানুষ!"

দেখ্‌লুম, একটু ওভাবডোজ্ হ'য়ে গেছে। আমার উদ্দেশ্য ছিলো, অভিলাষের আঁতে একটু ঘা দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর তর্ক জমিয়ে-তোলা;—কিন্তু ব্যাপার যেদিকে গড়ালো তা'তে তর্ক চলে না; আর যদি বা চলে, তা-ও সু-তর্ক, এবং তা অত্যন্ত সতর্ক ভাবে চালাতে হয়। ও-সব ভেবে-চিন্তে কথা-বলা আমার ধাতে নেই। এদিকে আবার সন্ধ্যে হ'য়ে আস্‌ছে, মনটা উস্‌খুস্ কর্‌তে লেগেছে। কথার স্রোত ঘুরিয়ে দেবার জন্য একটা-কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি হাঁ কর্‌বার আগেই অভিলাষ ধাঁ করে বল্‌তে সুরু করে' দিলে:

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

এর পরও তুমি আমাকে গল্প লিখ্‌তে বলো? আমি যে বেঁচে আছি, ভদ্দরলোকের মত চলাফেরা কর্‌ছি, তোমার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে' যে কথা বল্‌লাম, এ-ই কি যথেষ্ট নয়? এতদিনে আমার কোথায় যাওয়া উচিত ছিলো, জানো? রাঁচিতে। হাওয়া বদ্‌লাতে নয়, পাগ্‌লা গারদে। তবে হাওয়া-বদলো হ'ত বটে। বাড়িতে বল্‌তে গেলে দু'টি মাত্র ঘর;—একটিতে মা-বাবা থাকেন—তা'রি মেঝেতে—যে দু'টি বোন্ ইস্কুলে পড়ে, তা'দের পড়াশোনা, শোয়া-বসা, গল্প-গুজব—সব। অন্য ঘরটির মাঝখানে পর্দা খাটানো হয়েছে;—এক ধারে দাদা সস্ত্রীক প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে সবগুলি শিশু গড়াগড়ি করে। আমার নিজের একটি ঘর—নীচে, মাটির নীচেই বল্‌তে পারো। ছোট্ট একটা কুঠুরি—ঠাণ্ডা, অন্ধকার; ভিৎ রাস্তা থেকে এক আঙুলো উঁচু নয়;—দু'পাশে প্রচুর আবর্জ্জনা, ঘরের ভেতর মশা, মাছি, ছারপোকা, উই, ব্যাঙ, ইঁদুর—কিছুরি অসদ্ভাব নেই। সেখানে একটি টেবিল, চেয়ার ও তক্তপোষ নিয়ে আমার একলার রাজত্ব। সরস্বতীকে ঐ ঘরেই আহ্বান কর্‌তে হ'লে গন্ধেই বোধ হয় তাঁর গা ঘিন্‌ঘিন্ করে' উঠ্‌বে। এমন কি, ও-ঘর আমার পর্য্যন্ত সয় না;—সারাটা দিন তাই বাইরে-বাইরেই থাকি;—বছরে দশ মাস ছাতে শুই, এবার ঠিক করেছি শীত-কালেও শোবো।"

অভিলাষ যা'তে দেখ্‌তে না পায়—মুখটা একটু ঘুরিয়ে একটা হাই তুলে' ফেল্‌লুম। আমার কাছে ও এ-সব কথা বল্‌ছে কেন? ও-যে কতক্ষণ ধরে' বল্‌ছে, তা-ও মনে নেই। আগে যা-যা বলেছিলো, সব ভুলে' গেছি। পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে, এ যেমন সত্য, সংসারে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা আছে—এ-ও তেম্‌নি। এ আর বলার দরকার কী? চট্ করে' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো,

"তোমার নিজের দোষেই তো এ-সব হচ্ছে, অভিলাষ। তুমি নিজে যা রোজগার করো, তা দিয়ে তুমি একা তো বেশ আরামেই দিন কাটাতে পারো! কেন তুমি বাড়িতে দাও? কেন তুমি সবার কথা ভাবতে যাও?"

কী কুক্ষণেই কথাটা বলেছিলাম;—বিষুবিয়সের মুখে লাভার মত অভিলাষের মুখ দিয়ে কথা ছুটতে লাগ্‌লো: "কেন ভাবতে যাই? যে-হেতু তা'রা আমার মা, ভাই, বোন্, বাবা;—তা'রা যতই হীন ও হেয় হোক্, তারাই আমার আপন। যদি সবাইকে সুখী কর্‌তে না পারি তো আমার নিজের সুখের মুখে ছাই পড়ুক্। মা আজ বারো বচ্ছর হিস্‌টিরিয়ায় ভুগছেন; এক এক দিন যখন ফিট্ ওঠে, মনে হয়, এই বুঝি গেলেন। আমি না থাক্‌লে তাঁর দেখাশোনা করে কে? অভাবের তাড়নায় বাবা প্রায় পাগল হয়ে গেছেন; ছোট ভাইবোন্-গুলোকে তাঁর অত্যাচার থেকে বাঁচাবার আমি ছাড়া কেউ নেই।...কিন্তু তুমি তো এ-কথা বল্‌বেই। তুমি বড়লোক, তুমি aristocrat, তুমি স্বার্থপর। তোমার মুখের দিকে কেউ তাকিয়ে নেই, তাই তোমারো কারো পানে তাকাবার দর্‌কার হয় না। তুমি রোজগার করলে তবে তা'র খাওয়া হ'বে, এমন যদি কেউ থাক্‌তো, তা'লে তুমি ও-কথাটা উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌তে না। জানো, এ-পর্য্যন্ত তুমি সিগ্রেটে যত টাকা পুড়িয়েছ, তা'তে আমার মা-র চিকিৎসা হ'তে পার্‌তো; মদে যত টাকা ঢেলেছ, তা'তে আমার বোন্ দু'টির ভালো বিয়ে হ'তে পারে; মেয়েমানুষে যত টাকা উড়িয়েছ, তা'তে ছোট ভাইগুলোর এখন থেকে সুরু করে' বিলেত থেকে পাশ করে' আসা পর্য্যন্ত খরচ চলে। আমার মুখের দিকে তাকাতে তোমার লজ্জা করে না?...আর তুমি কিনা আমাকে জিজ্ঞেস্ করো, আমি গল্প লিখি নে কেন?"

এতক্ষণ অভিলাষ অনবরত পায়চারি কর্‌ছিলো ; এইবার ধুপ করে' ইজি চেয়ারটার ওপর বসে' পড়্‌লো।

আমার ভয় হ'তে লাগলো, পাছে ও কেঁদে ফেলে। ও যে-সব কথা বলে' ওর বক্তব্যের উপসংহার কর্‌লে, তা'রো যে উত্তর না ছিলো, এমন নয় ; কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আর বাক্‌বিস্তার করা আমার কাছে নিরর্থক মনে হ'ল। ওকে সাম্‌লে নেবার জন্য একটু সময় দিয়ে আমি বল্‌লুম, "কথা কইতে-কইতে একেবারে সন্ধ্যে হ'য়ে গেলো, দেখ্‌ছি। চলো হে, একটু বেরুই। বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গেছে।"

অভিলাষ তাই বলে' সত্যি- সত্যি কাঁদ্‌ছিলো না। ভাগ্যিস। আমার কথা শোনামাত্র সে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বল্‌লে, "যা বলেছো। দু' ঘণ্টা ধরে' আমার পেটটা চোঁ চোঁ করছে। চলো, বেরুনো যাক্‌।"

ক্ষিদেটা ওর জীবনের প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা। ওর সকল কর্ত্তব্যবুদ্ধি, সংসার-চিন্তা ইত্যাদি ক্ষিদের কথা উঠ্‌তেই এমন বেমালুম মিলিয়ে গেলো যে আমি একটু অবাকই হ'লাম। দেখা গেলো, ও এক সইতে পারে না ক্ষিদে, আর সাম্‌লাতে পারে না হাসি।

অভিলাষের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তার যে-রিপোর্ট্ আপনারা এইমাত্র পড়্‌লেন, আশা করি তা থেকে আমার সঙ্গে ওর চরিত্রগত পার্থক্যটা বেশ সম্‌ঝে নিয়েছেন। এটা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে, যে-সরল বিশ্বাস ও আশা নিয়ে আমরা ভূমিষ্ঠ হই, কারো মনেই সেটা বেশিদিন তিষ্ঠোয় না ; অর্থাৎ আশা করে' নিরাশ হ'তে-হ'তে এক-সময় আমরা নিজেরাই

অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি; অভিলাষ তখনো সে-অবস্থায় পৌঁছয় নি; পিতামাতা, কর্ত্তব্য, বিবাহ প্রভৃতি বস্তুগুলির ওপর ওর আস্থা একেবারে অটুট; এমন কি, নিজের বুদ্ধি ও ঋদ্ধির ওপর ও পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবান। আমার কাছে সেই লোকই সব চেয়ে বড় হেঁয়ালি, নিজকে যে বড় বলে' ভাব্তে পারে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, আমি সব জিনিষেরই futility বা'র করেছি, আর অভিলাষ utilityর ভার বইছে।

এ-হেন অভিলাষ আমাকে গোটা-কয়েক কড়া কথা শোনালে তা'তে দুঃখ পাওয়ার মত মূর্খতা আমার নেই; তথাপি মেছোবাজার দিয়ে কর্ণ্‌ওয়ালিস্ স্ট্রীটের দিকে চল্‌তে চল্‌তে ও আমাকে বল্‌লে, "ঝোঁকের মাথায় আজ কতগুলো কথা তোমায় বলে' ফেলেছি—"

বাধা দিয়ে বল্‌লুম, "ঝোঁকের মাথায় লোকে যা করে, পরে তা'র জন্য অনুতাপ কর্‌তে হয়, এ-convention এখনো কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লে না?"

"ঠাট্টা নয়, সত্যি। আমি ভেবে দেখ্‌লুম যে, আভিজাত্যের যে অহঙ্কার, তা'র একটা মানে আছে, কিন্তু দারিদ্র্যের যে অভিমান, সেটা তা'কে মানায় না, কারণ আসলে সেটা একগুঁয়েমি। দাদার ওপর রাগ করে' এসে তোমাকে ঐ সব কথা বলা—এ নেহাৎ বোকামি।"

"দয়া করে' এখুনি চুপ করো, অভিলাষ; নইলে একটু পরেই তুমি সেন্টিমেন্ট্‌ল্ হ'য়ে পড়বে। আর, তুমি যা'কে বোকামি বল্‌ছো, তা যদি বা সইতে পেরেছিলাম, আমি যা'কে ন্যাকামি বলি, তা কিছুতেই সইতে পার্‌বো না। পারো তো চসার্-এর গ্রামার্-সম্বন্ধে আমাকে একটু enlighten করো।"

এই কথা শুনে' অভিলাষ হেসে ফেল্‌লো; এবং আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে সেই ইতরজনবহুল, সঙ্কীর্ণ, নোঙ্‌রা ফুটপাথ্ দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো।

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

আপনারা বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌ছেন যে অভিলাষের মনটি হচ্ছে সেই ছাঁচের, কবিরা যা'কে বলে' থাকেন, "কোমল"। আমার মতে, ওর ঐ মমতাশীল হৃদয়ই ওর কাল হ'ল। কর্ত্তব্য-টর্ত্তব্য-সম্বন্ধে যে-সব বুলি ওর মুখে লেগে রয়েছে, সেগুলো হ'ল গিয়ে কথার কথা; আসল কথা হচ্ছে এই যে ওর মনটা বড্ড স্নেহ-প্রবণ; যুধিষ্ঠিরকে যে পরিজন-পরিত্যাগ করে' একাকী স্বর্গারোহণ কর্‌তে হয়েছিলো, পুরাণের এ-রূপকটি ও তলিয়ে দেখে নি। পরিবারের জন্য ওর এই অনাবশ্যক উৎকণ্ঠা তা'দের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিন্দুমাত্র বাড়াচ্ছে না, তথাপিও তাদের মুখের দিকে চেয়ে নিজের ভবিষ্যৎ দু'পায়ে মাড়াচ্ছে। তা'র কারণ, ভাই-বোন্ ইত্যাদির প্রতি ওর অপরিসীম স্নেহ। ও জানে না যে সব চেষ্টাই নিষ্ফল; ও যে তা'দের জন্য এতখানি কষ্ট গায়ে পেতে নিচ্ছে, এই চিন্তাতেই ও সুখ পায়। ভালোবাসা ভালো জিনিষ, কিন্তু মদেরো বাড়াবাড়ি কর্‌তে নেই।

কর্ণ্‌ওয়ালিস্ স্ট্রীট্-এর মোড়ে এসে অভিলাষ শুধোলে, "কোথায় যা'বে?"

"চীনে-হোটেলে। সেখানে শস্তায় নানারকম অদ্ভুত খাবার পাওয়া যায়, অধিকন্তু—"

"বল্‌তে হ'বে না—বুঝেছি। তা-ই চলো।"

দেখ্‌তে-দেখ্‌তে অভিলাষ যেন অন্য একটি মানুষ হ'য়ে গেলো। ওর সমস্ত ঝাঁজ ও ঝাল কি করে' যে এত অল্প সময়ে গলে' জল হ'য়ে গেলো, আমি তা ভেবে পেলাম না। বাস্-এ আস্‌তে-আস্‌তে ও এমন লঘুচিত্ততার পরিচয় দিতে লাগ্‌লো যেন ও নতুন বিয়ে করে' এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি চলেছে।

সবে সন্ধ্যা উৎরেছে, 'ক্যান্টন্'-এ তখনো ভিড় সুরু হয় নি। ছোট

একটি ঘরে পাখার নীচে গিয়ে বস্‌তেই আমার মানসিক আব্‌হাওয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেলো। অভিলাষের জন্য চা আর চিংড়ি-কাট্‌লেট্‌ অর্ডার্‌ দিয়ে আমি প্রথমে এক পেগ্‌ ব্র্যাণ্ডি খেয়ে সুস্থ হ'য়ে নিয়ে খাবারে মনোনিবেশ কর্‌লুম। অভিলাষ ইস্কুল-পালানো ছোট ছেলের মত বকর্‌বকর্‌ করে'ই চলেছে।

অভিলাষের পেলেট্‌ সাবাড় হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমার গেলাস তখনো কাবার হয় নি। শুধোলাম, "আর-কিছু খা'বে ?"

অভিলাষ ঢেঁকুর তুলে' বল্‌লে, "নাঃ—আবার বাড়িতে গিয়ে ভাত খেতে হ'বে—নইলে মা ভাব্‌বেন, অসুখ করেছে।"

তারপর কী মনে করে' বলে' ফেল্‌লে, "দেখি, এক চুমুক দাও তো !"

গেলাসটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলুম। ও সেটাকে মুখে তোল্‌বার আগে খানিকক্ষণ শুঁকে' বিতৃষ্ণভাবে মুখবিকৃতি কর্‌লে। গেল্‌বার সময় ওর চোখ-মুখের এমন চেহারা কর্‌লে, যেন ওর গায়ে কেউ পিন্‌ ফুটিয়ে দিচ্ছে।

বল্‌লুম, "তোমার খেয়ে কাজ নেই, অভিলাষ। দাও আমাকে।"

"ইস্‌ !" বলে' ও ঢক্‌ঢক্‌ করে' গেলাসটা খালি করে' ফেল্‌লে।

আমার ঘাড়েও তখন বোধ হয় ভূত চেপেছিলো ; আমি ওইয়েটার্‌কে ডেকে দু'টো 'পাঞ্চ্‌'-এর অর্ডার দিলুম। অভিলাষও, দেখ্‌লুম, আপত্তি কর্‌লে না।

কিন্তু এক চুমুক খেয়েই ও নাসিকা কুঞ্চিত করে' বলে' উঠ্‌লো, "তেতো !"

আপনারা বল্‌বেন, আমার তখন উচিত ছিলো ওকে বারণ করা, বা দরকার হ'লে জোর করে' ওকে থামানো। কিন্তু আমি কেন থামাতে

যাবো, বলুন্? আমি তো ওকে খেতে বলি নি; এখন বারণই বা কর্‌বো কেন? ওর যা খুসি করুক্।

শুধু বল্‌লুম, "হ্যাঁ, একটু তেতো তো লাগ্‌বেই। বিয়ার্ আছে কিনা। Take some salad."

অভিলাষ যেমন-তেমন করে' ওটা শেষ করে' ফেল্‌লো। সবটারই একটা চক্ষুলজ্জা আছে। আমাকে অনায়াসে খেতে দেখ্‌ছে; অথচ ও যদি না পার্‌তো, তা'লে আমার চোখে ওর পৌরুষের হানি হ'ত। অন্তত ও তা-ই ভাব্‌ছিলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে' দাঁড়াতেই টের পেলুম, বেশ ধরেছে। অভিলাষের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, এরি মধ্যে ও টেবিলের ওপর মাথা রেখেছে। তখুনি মনে-মনে ভাব্‌লুম যে আমিও যদি বেহুঁশ হ'য়ে পড়ি, তা'লে অভিলাষকে নিয়ে একটা কেলেঙ্কারিই হ'য়ে যা'বে। তাই খুবই স্বাভাবিকতার ভাণ করে' অভিলাষের ঘাড়ে হাত দিয়ে বল্‌লুম, "এই, ওঠো। ঐ একটুখানি খেয়েছ—কিছুই হয় নি তোমার।"

ও-কথা বল্‌বার সময়ই মনে-মনে জান্‌তুম যে অভিলাষ বেসামাল্ হয়েছে। হ'বারই কথা। কিন্তু ও-সব কথা বলে' ওর পৌরুষের অভিমানকে একবার চাড়িয়ে দিতে পার্‌লে ও চল্‌বে ঠিকমত।

ও মাথা তুলে' বল্‌লে, "কা?...হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি।"

আমরা ঘর থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় একটা সাহেব যথারীতি একটি মেম্‌কে বাহুপাশে আবদ্ধ করে' উল্টো দিকের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। মেমের বয়েস কাঁচা, পায়ে মোজা আছে কি নেই বোঝা যায় না, স্কার্ট্ হাঁটুতে গিয়ে ঠেকেছে, বাহু দু'টি সম্পূর্ণ নগ্ন। যেমন আজকালকার দিনে হ'য়ে থাকে।

অভিলাষ বল্‌লে, "কী সুন্দর, দেখেছো?"

আমি কিছু না বলে' ওকে একরকম ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগ্‌লুম।

রাস্তায় বেরিয়ে ও আবার বল্‌লে, "মেমটার কী চমৎকার পা, দেখে-ছিলে? আঙুলের ডগাগুলো ঝক্‌ঝক্‌ করছে।...আজ রাত্তিরে আর বাড়ি ফিরবো না।"

না-বোঝবার ভাণ করে' বল্‌লুম, "বেশ তো। চলো না আমার মেস্‌-এ।"

"না, না। তোমার কোনো জানাশোনা ইয়ে নেই? চলো না, রাতটা কাটিয়ে আসি।"

গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লুম, "না হে আজ্‌কে থাক্‌।"

"কেন, থাক্‌বে কেন? চ—লো না!"

মিথ্যে কথা বল্‌লুম, "টাকা নেই যে।"

অভিলাষ আমার পিঠে বেশ জোরেই একটা চড় মেরে বল্‌লে, "টাকা? টাকা নেই? সে-জন্য ভাবছো? Never mind. I've got a tenner—or rather two..."

জিজ্ঞেস্‌ করলাম, "এ টাকা কিসের?"

"কাল্‌কে ট্যুশানির টাকাটা পেয়েছিলাম; পকেটেই রয়ে' গেছে।"

"এ তুমি খরচ করবে? তারপর?"

"তারপর আবার কী? Oh, I shall manage anyhow, তুমি চলোই না।"

আমার নিজেরো তখন মাথার একটু গোলমাল হয়েছিলো বই কি! অভিলাষ মেয়েমানুষের পেছনে টাকা খরচ করতে যাচ্ছে, এ-কথা ভাবতেই আমার নেশা যেন চারগুণ চড়ে' গেলো। হোটেলের দরজাতেই একটা ট্যাক্‌সি দাঁড়িয়েছিলো; দু'জনে তা'তে গিয়ে উঠে' বস্‌লুম।

ওখানে গিয়ে অভিলাষ প্রথম কী কথা বল্‌লে, জানেন? বল্‌লে, "একটা বোতল আনিয়ে দাও না ভাই—বিলিতি। এই নাও।" বলে, মেয়েটির হাতে একটা দশ টাকার নোট্‌ গুঁজে' দিলে।

তারপর সারারাত যে-ঢলাঢলিটা হ'ল,—কখন্‌ যে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম, ভোরের বেলা নিজে কী করে' উঠ্‌লাম, অভিলাষকেই বা কী করে' তুলে' টেনে হিঁচ্‌ড়ে ট্যাক্‌সিতে তুলে' কত কষ্টে যে আমার মেস্‌-এ ফির্‌লাম—সে-সব না বলাই ভালো; সব মনেও নেই। এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হ'বে যে বেলা দশটার সময় স্নান করে', জামা-কাপড় বদ্‌লে', লাল চোখ ও বিষম মাথা-ধরা নিয়ে অভিলাষ যখন বাড়ির দিকে রওনা হ'ল, তখন তা'র পকেটে কুড়ি টাকার একটি কড়িও ছিলো না।

অভিলাষ সেই যে আমার মেস্‌ থেকে বেরুলো, তা'র পর আর তিন মাসের মধ্যেও ওর দেখা পাই নি। মাঝে একদিন শুধু ওর একটি ছোট ভাইকে দিয়ে আমার জামা-কাপড় পাঠিয়ে ওরগুলো নিইয়ে গিয়েছিলো। আর খোঁজখবর নেই।

কেন যে ও আর আমার পথও মাড়ায় নি, তা'র কারণ আপনারা সবাই অনুমান করতে পার্‌ছেন; আমি বলে' আর লজ্জা পেতে যাই কেন? কিন্তু ওর অনুতাপের জ্বর যে ক' ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠেছিলো, তা আমি শুন্‌লুম আর-একটি ছেলের কাছে। ছেলেটির সঙ্গে মুখ-চেনা ছিলো; হঠাৎ একদিন ট্রামে দেখা। আমি জানতুম, সে অভিলাষদের

ক্লাশে পড়ে। গায়ে পড়ে'ই আলাপ করলুম: "আপনি অভিলাষের খবর কিছু জানেন?"

"কেন বলুন্ তো?"

"এম্নি। অনেকদিন ওকে দেখি নে। ও ভালো আছে তো?"

"হ্যাঁ, ভালোই তো আছে।"

"খুব পড়্‌তে আরম্ভ করেছে বুঝি? বাড়ি থেকে আর বেরোয়-টেরোয় না?"

"না, তেমন আর পড়্‌তে পার্‌ছে কই? সময়ই পায় না—আরো দু'টো ট্যুশানি নিয়েছে কিনা!"

"বলেন কি? সময় পায় কখন্?"

"দু'টোই সকালে। একটা সাতটা থেকে ন'টা, আর একটা সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা। একটা মাড়োয়ারির ছেলেকে ইংরিজি পড়ায়—ওরা টাকার কুমীর—চল্লিশ টাকা করে' দেয়। আর একটি মেয়ে প্রাইভেট আই-এ পরীক্ষা দেবে—তা'কে ইকনমিক্স শেখাতে হয়, ওখানে পায় তিরিশ। আছে বেশ।"

"বেশ বই কি। খালি ট্যুশানি করে'ই তো শ'খানেক টাকা পাচ্ছে। তা'র ওপর স্কলারশিপ্ তো আছেই।—কিন্তু এত খাটুনিতে ওর শরীর টিঁক্‌ছে তো?"

"তা টিঁক্‌ছে। ও রোজ পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে' ছাতে দশ মিনিট মুলরের সিস্‌টেম্ করে। তার পর আদা আর ছোলা খেয়ে নিজের পড়াশুনো করে—যতক্ষণ না পড়াতে যাবার সময় হয়। আচ্ছা, নমস্কার।"

ছেলেটি নেবে গেলো বলে'—নইলে আর-একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌তাম, অভিলাষের বৌ-দির খবর কিছু জানে কিনা।

যাক্, ভালোই হ'ল। কুড়িটে টাকা গরচা' দিয়ে ও লাভ কর্‌লো ঢের। সেদিন ঐ কাণ্ডটা না ঘট্‌লে ও এখন টাকা রোজগার করার জন্য অমন উঠে'-পড়ে' লেগে যেতো না নিশ্চয়ই। মনে-মনে ভেবে একটু ভালোই লাগ্‌লো, অ্যাদ্দিনে ওদের হাল হয়তো একটু ফিরেছে; অন্তত বাড়িটে বদল করেছে নিশ্চয়ই, ওর দাদা-বৌদি একটি আলাদা ঘর পেয়েছেন, ছোট মেয়েগুলো আর কাদায় গড়ায় না, ওর মা-রও বোধ হয় চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে।...কিন্তু কুড়ি টাকার জন্য এতখানি প্রায়শ্চিত্ত!

এখানে যদি গল্পটা শেষ কর্‌তে পার্‌তাম, তা'লে আমার পরিশ্রম কম্‌তো, আপনারা খুসি হ'তেন, নীতি-রীতিগুলোও রক্ষা পেতো,—মোটের উপর সব দিকই বাঁচ্‌তো। অভিলাষের চরিত্র যুবকদের আদর্শ-স্থানীয় বলে' কীর্ত্তিত হ'ত, অভিভাবকরা আমায় বাহবা দিতেন, সমালোচকরা শত-মুখে প্রশংসা কর্‌তেন, মেয়েদের এ-গল্প লুকিয়ে পড়্‌বার দরকার হ'ত না। কিন্তু আপনাদের, অভিলাষের এবং সব চেয়ে বেশী—আমার দুর্ভাগ্য যে এ-গল্পের এখানে শেষ নয়, আরো একটু আছে। আপনারা আমার উপর চট্‌তে পারেন, কিন্তু আমি নিরুপায়। পরে যা হ'ল, তা না বলে' আমি পারি নে। অবিশ্যি শেষের দিকটা যে আমি 'চেপে যেতে না পার্‌তুম, এমন নয়; কিন্তু অভিলাষ গল্পটা এ-পর্য্যন্ত পড়ে' বলে' গেছে যে বাকিটুকু আমি না লিখ্‌লে ও নিজে লিখে' গল্পের সঙ্গে জুড়ে' দেবে। তাই,—যা থাকে কপালে—আমিই লিখে' ফেলি।

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

ফাল্গুনের শেষের দিক। কল্‌কাতায় গরম পড়ি-পড়ি কর্‌ছে। দুপুর-বেলা শুয়ে'-শুয়ে' কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ভাব্‌ছি, এইবেলা দার্জ্জিলিঙ্‌ পালাই। কথাটা ভাবামাত্র গরমটা যেন অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে কল্‌কাতার আকাশ, বাতাস, পথ-ঘাট, লোক-জন সব আমার চোখে ও মনে বিষিয়ে উঠ্‌লো। মনে হ'ল, আর এক দণ্ড এখানে থাক্‌লে মরে' যাবো। আজ্‌কেই দার্জ্জিলিঙ্‌ যাওয়া যায় না? কেন যায় না? যায় বই কি! আজ্‌কেই যাবো।

তক্ষুণি উঠে' সুট্‌কেইস্‌টা গুছোতে বস্‌লাম। হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে' উঠ্‌লো, "কোথাও যাচ্ছ নাকি?"

"এ কী? অভিলাষ?"

অভিলাষই। রোদে ঘেমে-টেমে এসে হাজির। এতদূর অবাক হ'লাম যে মিনিট দু'য়েক পর কথা কল্‌তে পার্‌লাম, "বে—শ। এসো, এসো। এই দুপুরের রোদে কোত্থেকে? অ্যাদ্দিন একেবারে ভুলে' ছিলে যা-হোক্‌। ..হ্যাঁ, আজ দার্জ্জিলিঙ্‌ যাচ্ছি। এইমাত্র ঠিক কর্‌লাম। বোসো। ভালো আছ তো?"

"আছি ভালোই। উঃ, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।" বলে' কুঁজো থেকে নিজেই এক গ্লাশ জল গড়িয়ে খেয়ে পকেট থেকে একটা সিগ্রেট্‌ বা'র করে' ধরালে।

না বলে' পার্‌লাম না, "ও কী? তুমি আবার সিগ্রেট্‌ ধর্‌লে কবে থেকে?"

"আজ থেকে।"

সুট্‌কেইস্‌টা ঠেসে বন্ধ করে' তক্তপোষের নীচে ঠেলে রেখে আমি নিজেও একটা সিগ্রেট্‌ ধরালাম।—"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ অ্যাদ্দিন যে-কারণে খাই নি, আজ বুঝ্‌লুম সেটা কোনো কারণ নয়।"

"নয় নাকি? এ ক'মাসে কি তুমি এই শিক্ষা পেলে?"

"হ্যাঁ, এই শিক্ষাই পেলাম।...তা'র পর আমি আর আসি নি কেন, জানো? ভাব্লুম, একটা experiment করে' দেখা যাক্। কর্লুম।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী?...এ তিন মাস আমি যত খেটেছি, একটা ধোপার গাধাও তত খাটে না। তিন-তিন্টে ট্যুশানি—ভদ্দরলোকে কর্তে পারে? তবু মাসকাবারে যখন টাকাগুলো পেতাম, মনটা ভালোই লাগ্তো। বাড়িতে মাসে-মাসে সওয়া শ' করে' টাকা দিতে লাগ্লাম। বাবাকে বল্লাম, 'এইবার বাড়ি-বদল করি।' বাবা ধমক দিয়ে বল্লেন, 'হ্যাঁ—বাবুগিরি করে' ফতুর হও আর কি! বোনেদের বিয়ে দিতে হ'বে, সে খেয়াল আছে?' বল্লুম, 'আচ্ছা বেশ, তা'লে মাসে একশো টাকা করে' ব্যাঙ্কে রাখুন্!' বাবা হুম্কি দিয়ে বলে' উঠ্লেন, 'কী আমার নবাবের পুত্তুর রে! ব্যাঙ্কে টাকা না রাখ্লে তাঁর মন ওঠে না! ইদিকে সবগুলো লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরুক্!' জিজ্ঞেস্ কর্তে ইচ্ছে হ'ল, এই টাকা আস্বার আগে কে অনাহারে মরেছে? কিন্তু চুপ করে' রইলাম—ওদের যা ভালো লাগে করুক্।"

"সেই রাগেই বুঝি—"

"দূর ছাই—শেষ পর্য্যন্ত শোনোই না। এক মাস গেলো, কিন্তু যেমনকে-তেমন। ছোট বোনগুলোর গায়ে একটা ভালো জামাও উঠ্লো না। উন্নতির মধ্যে, দেখ্লুম, এক চাকর রাখা হয়েছে—ওকে বাজারের জন্য রোজ একটি টাকা দে'য়া হয়;—তা'র আট আনাই বোধ হয় চুরি করে; যা আনে, তা-ও মুখে তোলা যায় না। শুন্লাম, এ-মাসে নাকি মুদির হিসাব একেবারে কাবার করে' দে'য়া হয়েছে। যাক্, তবু ভালো। পরের মাসে চাকর তুলে' দিলাম; সমস্ত টাকা মা-র হাতে দিয়ে বল্লাম,

'তুমি একটু বুঝে'-সুঝে চালিয়ো। ওদের জন্য আগে কতগুলো জামা তৈরি করাও—তারপর অন্য খরচ।' নতুন জামা দেখে বাবা রেগে, পুরোনো খবরের কাগজ ছিঁড়ে', মুখ খারাপ করে' এক কেলেঙ্কারি বাধিয়ে তুল্লেন—আমরা সবাই মিলে' নাকি তাঁর সর্ব্বনাশ করছি। সে-ও সইলো। তারপর কয়েকটা দিন শান্তিতেই কাটলো—সবার মুখেই একটু হাসি-হাসি ভাব, দু' টুকরো করে' মাছ পাতে পড়ছে—যে দু'টি বোন্ ইস্কুলে পড়ছে, তা'রা দেখতে-দেখতে যেন সুন্দর হ'য়ে উঠলো! ভাবলাম—যাক্,—সাধ সাধক। তৃতীয় মাসে শুনি, আবার নাকি মুদির দেনা জমেছে, কাপড়ের দোকান থেকে সাতদিনের মধ্যে টাকা না পেলে নালিশ করবে বলে' শাসিয়ে গেছে। শাসাক্ গে,—মা-কে বল্লাম, ওদের যেন গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে দে'য়া হয়। বলে' আমার সারা মাসের রোজগার মা'র হাতে তুলে' দিলাম।

"পরের দিন সকালে দেখা গেলো, মা-র হাতবাক্সের ভেতর একটি পয়সাও নেই, আর নেই দাদা। বিনা কাজে বসে' বৌ-র সঙ্গে প্রেম করতে আর বোধ হয় তাঁর ভালো লাগছিলো না, তাই আমার সারা মাসের রোজগার নিয়ে তিনি অবকাশ-যাপনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। তারপর সে যা চ্যাঁচামেচি, কান্নাকাটি, হৈ-চৈ শুরু হ'ল—সে এক দেখবার জিনিষ! বাবা বল্লেন, 'ও-হারামজাদাকে আমি জেলে দেবো, এই চল্লাম থানায়।' জোর-জবরদস্তি করে' আমিই ঠেকিয়ে রাখলাম। ছেলের নামে নালিশ করা যে বাপের পক্ষে খুব গৌরবের কথা নয়, এ-কথা তখন তাঁকে বোঝায়, কা'র সাধ্যি! মা সেই যে ফিট্ হ'য়ে পড়লেন—তিন দিনের মধ্যে তিনি একটিবার চোখ মেলেন নি। মনে-মনে প্রার্থনা করলাম, ও-চোখ যেন তাঁকে আর না মেলতে হয়! কিন্তু এবারেও তিনি মরলেন না। মরলেই বাঁচতেন—তাই।' ভালো হয়ে

মা বারো দিন কিচ্ছু না খেয়ে ছিলেন,—এক ফোঁটা জলও না ;—কত কষ্টে যে তাঁকে খাওয়ালাম ! এদিকে এই সব তোলপাড় হওয়াতে বৌ-দিরো কাণ্ড হ'য়ে গেলো—সাত মাসেই। মরা একটা ছেলে, পুতুলের মত হাত-পা—চোখ তখনো ফোটে নি। ইচ্ছে হ'ল, ন্যাকড়ায় জড়িয়ে ডাস্‌ট্‌-বিন্‌-এ ফেলে দি।

"যাক্—'one more mouth to feed' হ'ল না।"

"আর, হ'লেও ক্ষতি ছিল না। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন !...যাক্ গে। তুমি আজই দার্জ্জিলিঙ্ যাচ্ছ ? আর কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাও না—তারপর একসঙ্গেই যাওয়া যা'বে।"

"তুমিও যা'বে নাকি ?"

"হ্যাঁ, ইংরিজি মাসটা কাবার হ'তে দাও। থেকে যাচ্ছ তো ?"

"তুমি যখন বল্‌ছো।...তারপর, তোমার দাদা আর ফেরেন নি ?"

"ফিরেছেন বই কি। কাল ! যা scene হ'বার, হ'ল। তারপর সব ঠাণ্ডা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে' এসেছে বলে' মনে-মনে সবাই খুসি। দাদাকেও মোটেই লজ্জিত-ফজ্জিত দেখ্‌লাম না। বরং দেখ্‌লাম, সব ছেলে-পিলেদের কাছে ডেকে তাজমহলের গল্প কর্‌ছেন। আজ সকাল থেকে বাড়িতে আবার সেই সাবেকি জীবন সুরু হয়েছে—একঘেঁয়ে, মামুলি।...চলো, আজকে..." অভিলাষ পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বা'র করে' এক-চোখ টিপ্‌লে।

জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম, "এ-টাকা পেলে কোথায় ?"

"দাদার সার্টের পকেট থেকে মেরে দিয়েছি। এখানাই বোধ হয় বাকি ছিলো ;—আমারই তো টাকা !"

তথৈব

ভটৈথব

ট্যাক্‌সিটা মোড় ফেবার সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ দিকে ঝুঁকে' পড়ে' তাবপর ঠিক হ'য়ে বসে' নিয়ে পবিতোষ বলে' উঠ্‌লো, "সুতরাং ?"

গায়েব ওসবেব পাঞ্জাবির ওপব একটু যে সিগ্রেটের ছাই পড়েছিলো, বাঁ হাতের দু'টি আঙুল দিয়ে তা-ই ঝাড়্‌তে-ঝাড়্‌তে শ্রীহর্ষ জবাব দিলে, 'সুতবাং কাল কল্‌কাতা ছাড়্‌ছি। এটা হচ্ছে সেই মাস, শিশুপাঠ্য বইতে যা'কে বলে' থাকে শরৎকাল। দেখ্‌তে পাচ্ছি কল্‌কাতাব আকাশই ম্যাপেব মহাসমুদ্রেব মত নীল হ'য়ে উঠেছে—কাজেই বাঁচির আকাশ অ্যাদ্দিনে ধারালো ইস্পাতেব মত ঝক্‌ঝক্‌ কব্‌তে সুরু করেছে। তা ছাড়া, সেখানে আছে ইলা, যা'ব চোখ দু'টি সেই আকাশেবই মত —কিম্বা তা'ব চেয়েও—"

"তা ইলা তো আব দু'দিনেই মিলিয়ে যাচ্ছে না! ববং বাঁচির আকাশেব বঙ্‌টা ইলাব চোখেব আবেকটু কাছাকাছি আসুক্‌, ইঁদারাব জল আবো ঠাণ্ডা হোক্‌—"

"সঙ্গে-সঙ্গে ইলাব হৃদয়টিও ঠাণ্ডা হ'য়ে যাক্‌ আব কি! না হে— কাল আমি যাবোই। ইলা লিখেছে—যাক, কি লিখেছে তা আব না-ই শুন্‌লে। আজ্‌কেই যেতাম, কিন্তু নাট্য-মন্দিরে কী একটা নূতন প্লে হচ্ছে, খুব নাকি চলেছে শুন্‌লাম। কী না বইটাব নাম ?"

" 'ষোড়শী' ?"

"হ্যাঁ, 'ষোড়শী'ই বটে। শবৎ চাটুয্যে লেখেন ভালো। ..তা, ওটা দেখে যেতে হ'বে। কখন্‌ আবম্ভ ? তোমাব সঙ্গে যে যাচ্ছি, ওদিকে দেরি হ'য়ে যা'বে না তো ?"

"কিসেব দেবি হ'বে ? আজকে বেস্পতিবাব—সাড়ে-আটটায় আবম্ভ, এখন তো ছ'টাও বাজে নি। এই—ডা'ন্‌ তরফ্‌।"

"এলাম নাকি ?"

"প্রায়। ও, একটা কথা বল্‌তে তোমায় ভুলে' গেছি। আজ্‌কে সকালে আমার দাদা-বৌদি এসেছেন। তাঁরা থাকেন মুঙ্গের—বহুদিন পর এবার দেশে এলেন। দাদা করেন ইস্কুলমাষ্টারি—বার-বার যাওয়া আসার খরচ পোষাতে পারেন না। বৌদি মানুষটি বেশ।"

"বটে?" শ্রীহর্ষ একটা হাসিকে ঠোঁটের মাঝ-পথে এনেই ছেড়ে দিলে।

তারপর ট্যাক্‌সিওলার হাত থেকে খুচ্‌রো নিতে-নিতে বল্‌লে, "চলো দেখে আসা যাক্।"

হরিশ মুখার্জির রোড্‌-এর ওপর ছোট একটি দোতলা বাড়ি। বাইরের বস্‌বার ঘরটি এমন ভাবে সাজানো, যা'তে অধিবাসীদের চট্‌ করে' বড়লোক বলে' ভুল হ'তে পারে, কিন্তু আসলে সে-সাজসজ্জা ভেতরকার দারিদ্র্যের লজ্জা ঢাক্‌বার একটা কৌশলমাত্র। ঘরটির মেঝেয় সতরঞ্চি পাতা, মাঝখানে একটি ফর্সা কাপড়ে-ঢাকা বেতের গোল টেবিল, তা'র ওপর রঙীন্ চীনেমাটির ফুল্‌দানিতে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা। চার্‌দিকে গদি-আঁটা বেতের চেয়ার, দু'একখানি সোফাও আছে। দেয়ালে গৃহস্বামীর দু'চারজন পূর্ব্বপুরুষের এন্‌লার্জড্ ফোটোগ্রাফ, একখানা মোনা লিসা ও একটি landscape ছবি। জান্‌লাগুলি সব বন্ধ ছিলো; পরিতোষ সেগুলো খুলে' দিতে-দিতে বল্‌লে "বাড়িতে কেউ নেই বলে' মনে হচ্ছে। তুমি একটু বোসো, হর্ষ—আমি দেখে আস্‌ছি। যদি সবাই বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তা'লেই হয়েছে। তোমাকে খেতে বল্‌লাম—"

আপন মনে বিড়্‌বিড়্ কর্‌তে-কর্‌তে পরিতোষ লাল বনাতের পর্দ্দা সরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুক্‌লো। যেন সে জীবনের ভার আর বইতে পার্‌ছে না, এইভাবে ঈষৎ কাঁধ নেড়ে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে গিয়েও না ফেলে, শ্রীহর্ষ একটি চেয়ারে বসে' পড়্‌লো।

পাশের বাড়ির চিল-ছাত ডিঙিয়ে, মাঝখানকার পাঁচিলটা টপ্‌কে, পশ্চিমের জান্‌লা বেয়ে একরাশ সোনার গুঁড়োর মত খানিকটা সূর্য্যাস্তের আলো তখন সেই ঘরে লুটিয়ে পড়েছে। সে আলো যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়, হাতের মুঠোয় ভরে' ধরে' রাখা যায়, হাতে তুলে' নিয়ে মুখেও মাখা যায়। শাদা রজনীগন্ধার গুচ্ছ অনেকগুলো দীপশিখার মত জ্বলে' উঠ্‌লো, মোনা লিসার ছবির কাঁচে আগুন ধরে' গেছে, শ্রীহর্ষর ফেনার মত শাদা চাদরের যে-অংশ মেঝেয় লুটোচ্ছে, সে-টুকুতে কে যেন এইমাত্র আবীর ঢেলে দিয়ে গেলো। প্রকৃতির শোভা-টোভা শ্রীহর্ষর মনকে কোনোদিনই বিশেষ টান্‌তে পারে নি ;—কিন্তু আজ যেন তা'র কী হয়েছে—সে চুপ করে' সেই লাল রজনীগন্ধার দিকে তাকিয়ে প্রায় আবিষ্টের মতই বসে' রইলো।

আসলে পাঁচ মিনিট মাত্র গেছে ; কিন্তু শ্রীহর্ষর মনে হ'তে লাগ্‌লো সে অন্তত আড়াই ঘণ্টা ধরে' ঐ চেয়ারে বসে' আছে। সন্ধ্যার আলোও নিবে' আস্‌ছে—অন্ধকার হ'য়ে এলো বলে'—পরিতোষ হতভাগাটা এতক্ষণ ধরে' কর্‌ছে কি ?

বিরক্ত হ'য়ে শ্রীহর্ষ উঠে' দাঁড়িয়ে আলোটা জ্বাল্‌বার জন্য সুইচ-এর ওপর হাত রাখ্‌লো। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড্-এর জন্য সুইচ্‌টা টেপ্‌বার মত শক্তিও তা'র দেহে ছিলো না।

অতসীর পেছনে লাল বনাতের পর্দ্দা, মুখে, গলায়, হাতে টাট্‌কা রক্তের মত গাঢ় লাল আলোর ছিটে, কপালের সিঁদুর টক্‌টকে লাল, শাড়ির পাড় আরো উজ্জ্বল লাল। সারা ঘর সোনার ধূলিতে ধূলিময়, অতসীর চোখ দু'টি স্বপ্নের মত, চার বছর আগেকার মত।

অতসী ঘরে ঢুকে'ই ভয়ানক চম্‌কে উঠে' একটুক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো ; তারপর টেবিলটির দিকে এগিয়ে এলো।

টক্ করে' শব্দ হ'ল, উগ্র হল্‌দে আলোয় ঘর ভেসে গেলো, মোহ গেলো কেটে।

পরিতোষ বল্‌তে লাগ্‌লো, "ইনি শ্রীমতী অতসী মিত্র, আমার বৌ-দি, আর ইনি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ সরকার বি-এ (অক্সন্), ডি-লিট্ (লণ্ডন্)।"

শ্রীহর্ষ শেষ পর্যন্ত শুনে' আস্তে-আস্তে দু'টি হাত একত্রিত করে' অর্দ্ধোচ্চারণ করলে, "নমস্কার।" তারপর অতসী প্রতিনমস্কার করলে কিনা, তা না দেখ্‌বার ভাণ করে' বল্‌লে, "ওহে পরিতোষ, আমার দেরি হ'য়ে যা'বে না তো? I say—আমি বরং এখুনি চলে' যাই।"

পরিতোষ বল্‌লে, "সে কী কথা? না খেয়ে যাবে কী হে? মা, দেখ্‌লাম, তোমার জন্য কত-সব আয়োজন করছেন্।"

শ্রীহর্ষ তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে' দাঁড়িয়েছে। যে-জান্‌লাটি দিয়ে একটু আগে সোনার গুঁড়োর মত আলো আস্‌ছিলো, সেই জান্‌লা দিয়ে বাইরে মাথা গলিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "আজ্‌কের দিনটা হঠাৎ ভারি গরম পড়েছে—না? চলো না পরিতোষ, বাইরে থেকে একটু ঘুরে' আসি। মার্কেট্-এ যা'বে? নাঃ—আইস্-ক্রীমগুলো আর তেমন খাসা নেই।"

অতসী ফুলদানি থেকে রজনীগন্ধার গুচ্ছটি একবার তুলে' আবার ঠিক করে' বসাতে-বসাতে প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে' বল্‌লে, "আপনি কি 'ষোড়শী' দেখ্‌তে যা'বেন, শ্রীহর্ষবাবু? চলো না ঠাকুরপো, আমরাও যাই।"

শ্রীহর্ষ জান্‌লা থেকে সরে' এসে টেবিলের উল্টো দিকে অতসীর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালো। তারপর অতসীর চোখের ওপর চোখ রেখে—যে-শুক্‌নো, নীরস গলায় বিলেতে থাক্‌তে সে ল্যাণ্ড লেডিকে

থ্যাঙ্কু বল্‌তো—সেই স্বরে বল্‌লে, "আপনি যাবেন ? তা বেশ, চলুন্‌ না—আমার একটা পুবো বন্ধ্‌ই আছে"—তারপর পরিতোষের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "ডক্টর্‌ চ্যাটার্জিব বাড়িব মেয়েদেব আস্‌বার কথা ছিলো কিনা—তা ওঁদেব আজ হঠাৎ প্রফেস্যর্‌ পুচ্চিনির বাড়িতে নেমন্তন্ন হ'য়ে গেলো। পুচ্চিনির নাম শোনো নি ? মস্ত বড় orientalist—ৎসুরিকে একবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। চমৎকাব লোক—সারাটা জীবন কাজের ঘানিতে ঘুর্‌লেন, কিন্তু মনে যদি একটু ঘুণ ধরেছে ! তাঁর দু'হাতেব আঙুলে যে ক'টা কড়া আছে, প্রায় ততটা ভাষা জানেন—মায় তামিল-তিব্বতী। আব অদ্ভুত অধ্যবসায় ! ছেলেবেলায় মিলান্‌-এব বাস্তায় খববেব কাগজ ফিবি কবে' বেড়াতেন, তাবপব আল্‌প্‌স্‌ ডিঙ্গিয়ে জেনেভায়—কিন্তু সে যাক্‌ !...আপনি যাচ্ছেন তা'লে ? শিশিববাবুকে কখনো দেখেন নি বুঝি ? হ্যাঁ, দেখ্‌বাব মত বটে—বাঙ্‌লা দেশেব পক্ষে আশ্চর্য্যই। তবে এ-দেশেব stage এখনো যদ্দূব crude হ'তে হয়—এখনো সীন টাঙায—হাসিই পায় দেখ্‌লে। তা আপনাব—ওহে, পবিতোষ, তোমাব দাদাব সঙ্গে তো পবিচয় হ'লো না !"

ইতিমধ্যে অতসী একটি সোফায় গিয়ে বসেছিলো, সে-ই জবাব দিলে, "উনি বায়োস্কোপ দেখ্‌তে গেছেন—এম্‌প্রেস্‌-এ—"

পবিতোষ ভুরু কুঁচ্‌কে বলে' উঠ্‌লো, "এম্‌প্রেস্‌-এ ? 'জয়দেব' দেখ্‌তে ? নাঃ, দাদা একেবাবে গেঁজে গেছেন দেখ্‌ছি। তোমাকে নিয়ে গেলেন না যে বৌদি ?"

মুখ যা'তে লাল হ'য়ে না ওঠে, সেই চেষ্টা কব্‌তে-কব্‌তে অতসী বল্‌লে, "আমি যাই নি। মাণিকেব একটু জ্বর হয়েছে কিনা"—চোবাবালিতে ডুব্‌তে-ডুব্‌তে হঠাৎ যেন অতসীব পায়েব নীচে পাথব

ঠেক্‌লো—"এই তো সারাদিন পর একটু ঘুমিয়েছে, জেগে উঠ্‌লেই আমাকে খুঁজ্‌বে।—আপনি বুঝি বায়োস্কোপ-টায়োস্কোপ বিশেষ দ্যাখেন না, শ্রীহর্ষ বাবু?"

"খুব কম। সিনেমা জিনিসটাই আমার কাছে কেমন জোলো-জোলো ঠেকে, তবে কয়েকটা ফিল্‌ম্‌ দেখেছি বটে খুব ভালো। সেবার নোয়েল্‌ কোয়ার্ডের পাল্লায় পড়ে'—সেই যে হে, যা'র কথা তোমায় বল্‌ছিলাম, পবিতোষ—ছোক্‌রা নাটক লিখে' এরি মধ্যে দিব্যি নাম করে' ফেলেছে—হ্যাঁ, নোয়েল্‌ কোয়ার্ডের পাল্লায় পড়ে' একটা ছবি দেখ্‌তে যাই—নাম, 'Grass'। সে এক আশ্চর্য্য জিনিষ! পৃথিবী তৈরী হওয়া থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত মানুষের—না, প্রাণী-জাতির ইতিহাস! এ-দেশে এখনো আসে নি ওটা, না?...না হে, সাতটা বাজ্‌তে চলেছে—"

"ভয় নেই তোমার, রান্না এই হ'ল বলে'। কা বৌদি তা'লে তোমার থিয়েটার যাওয়ার কথাটা সব ভূয়ো?"

"না—ভাব্‌ছিলাম, মা যদি একটু ওর কাছে বসেন—থাক্‌ গে, আজ না-ই বা গেলাম—" অতসীর আবার বোধ হ'ল, তা'র গলার প্রতি শিরাটি বেয়ে সমস্ত রক্ত যেন সুড়্‌সুড়্‌ করে' মুখে উঠে' আস্‌ছে। হাত দিয়ে একবার মুখ মুছে' নিয়ে বল্‌লে, "যাও না ঠাকুর-পো, একবার দেখে এসো রান্নার কদ্দূর। মিছিমিছি এঁকে আট্‌কে রেখে লাভ কী?—আমরা কেউ যাচ্ছি না যখন।"

"কেন, চলুন না। পরিতোষ না হয়—ম্‌-মাণিককে না হয় পরিতোষ রাখ্‌বে!"

যে-দুর্বোধ্য অর্থে-ভরা দেখা-যায়-কি-না-যায় হাসি এক মেয়েরাই হাস্‌তে পারে, সেই হাসি হেসে, চোখ কপালে টেনে, বাঁ হাতের কড়ে'

আঙুল দিয়ে শূন্যে টোকা মেরে অতসী বল্‌লে, "ওঃ! পরিতোষ! রাখবে! তা'লেই হয়েছে!"

পরিতোষ আর শ্রীহর্ষে চট্ করে' চোখের বেতার হ'য়ে গেলো।

পবিতোষ উঠ্‌তে উঠ্‌তে বলে' গেলো, "চা, হর্ষ? আপত্তি নেই? বৌদি? না? ইস্—কোর্ম্মার স' গন্ধ বেরিয়েছে! অ্যাপিটাইট্, হর্ষ?"

পরিতোষ যে-মুহূর্ত্তে ঘর ছেড়ে গেলো, সে-মুহূর্ত্তে অতসী সোফা থেকে উঠে' পড়্‌লো, এবং সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীহর্ষ পেছন দিকে হাঁটতে-হাঁটতে একেবাবে জান্‌লার কাছে গিয়ে শার্সির কাঁচের ওপর মাথা হেলান্ দিয়ে দাঁড়ালো। শ্রীহর্ষর চাদরের প্রান্তভাগ স্পর্শ না করে' তা'র যতটা কাছে দাঁড়ানো সম্ভব, অতসী তা'র ততটা কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, এবং গলা দিয়ে স্বরস্ফুরণ না করে' যতটা জোরে কথা বলা সম্ভব, ততটা জোরে বলে' উঠ্‌লো, "শীগ্‌গির! কবে দেশে ফির্‌লে?"

কঙ্কাল কথা কইতে পার্‌লে যে স্বরে কথা বল্‌তো, সেই স্বরে শ্রীহর্ষ জবাব দিলে, "জুন্ মাসে।"

"কি কর্‌ছ?"

"আপাতত আল্‌সেমি।"

"এখানে আছ কোথায়?"

আপ্রাণ চেষ্টাসত্ত্বেও শ্রীহর্ষ সত্যি কথা না বলে' পার্‌লে না—"বকুলবাগান।"

"ও, তোমার মামার বাড়িতে?"

"হ্যাঁ।"

"রেবা—রেবা কি এখন এখানে?"

"আমি বিলেত যাওয়ার আগেই রেবার বিয়ে হয়। বছর খানেক পর খবর এলো সে ছেলে হ'তে মারা গেছে।"

"সত্যি ?" অতসী প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো। তাড়াতাড়ি নিজকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, "তা তুমি—তুমি এখানেই আছ ?"

শ্রীহর্ষ বাইরের দিকে তাকিয়ে যেন নিজের মনে মনেই বল্‌লে, "কোথায় আর যাবো ?"

অতসীর গলা চিরে' বেরিয়ে এলো, "কিন্তু তুমি এখানে-এ-বাড়িতে আর এসো না—বুঝ্‌লে ? আর কক্ষণো এসো না,—আমার এই একটা কথা তুমি রাখো, শ্রী।"

শ্রীহর্ষ মনে-মনে ভাব্‌লে, অতসী জীবনে এই দ্বিতীয়বার তা'কে এ-কথা বল্‌লে। একবার—ক' বছর আগে ? ক'দিন আগে ?—একবার অতসীর বাবা যখন তা'কে নীরবে বাইরে যাবার দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রীহর্ষ একটু হেসে শুধু বলেছিলো, "কিন্তু আমি তো আপনার কাছে আসি নি।" তারপর অতসী তা'কে—থাক্, থাক্, সে-সব কথা সে আর মনে কর্‌তে চায় না।—কিন্তু সেদিনো অতসী এম্‌নি করে'ই এই কথাই বলেছিলো, "কেন তুমি আমার জন্যে অপমান সইতে যাবে ? তুমি আর এসো না—কক্ষণো এসো না—কক্ষণো এসো না,—আমার এই একটা কথা তুমি রাখো, শ্রী।"

সেই অতসী। আর কিছু নয়, শ্রীহর্ষ আজ শুধু তা'কে একবার ভালো করে' বুঝিয়ে দিতে চায়, কত বড় ভুল সে করেছে, সে যা হারিয়েছে তা কত মূল্যবান—অথচ একটু ইচ্ছে কর্‌লেই সে-সবই তা'র হ'তে পার্‌তো।

তাই, কণ্ঠস্বরে হঠাৎ অপূর্ব্ব কোমলতা এনে, একটু নত হ'য়ে অতসীর দু'টি চোখ তা'র দৃষ্টি দিয়ে বিঁধে রেখে, সেদিন ও-কথার উত্তরে সে যা বলেছিলো, আজ একটু বদ্‌লে সেই কথাগুলো উচ্চারণ কর্‌লে, "তাই হ'বে, সী। তোমার জন্য সহস্রবার মর্‌তে পেলেও আমার

তৃপ্তি হ'বে না।"—তারপর বেশ ধীরে-ধীরে উল্টো দিকের দেয়ালের কাছে গিয়ে আবার সেই শুক্‌নো স্বরে বল্‌তে লাগ্‌লো, "হ্যাঁ, বুঝ্‌লেন—'মোনা লিসা'র কত যে নকল হয়েছে, তা'র ইয়ত্তা নেই। প্যারিসের ল্যুভ্‌র্-এ আসল ছবিখানা আছে—সে-ঘরে আর কোনো ছবি নেই। সে যে কী জিনিস, এই wretched p ınt দেখে তা কল্পনাও করা যায় না। ছবিটার কত দাম নিয়েছে হে পরিতোষ ? একখানা ভ্যান্ ডাইক্ রাখ্‌লেই পারতে! জানি নে কেন, ফ্লেমিশ্ পেইন্টিং আমার কাছে সব চেয়ে ভালো লাগে। একবার ব্রাসেল্‌স্-এ—কিন্তু কদ্দূর, পরিতোষ ? আর তো থাকা যায় না।"

"রান্না রেডি। কিন্তু চা ? ওটাকে অ্যাপিটাইট্-কিলার বলে' বর্জ্জন কর্‌বে না তো ?..."

* * * *

দরজার কাছে এসে অতসী মিষ্টি হেসে বল্‌লে, "কাল আবার আস্‌ছেন তো, শ্রীহর্ষ বাবু ? আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লে পরিতোষের দাদা খুব খুসি হ'বেন;—বিলেত-টিলেত-সম্বন্ধে তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা এখনো যে কী অসাধারণ, দেখ্‌লে অবাক্ হ'য়ে যাবেন। এমন কি, মাণিককে পাঠাবেন বলে' এখন থেকেই একটা এন্‌ডাউমেন্ট্ করেছেন।"

পরিতোষ হতাশভাবে বল্‌লে, "হর্ষ কাল্‌কেই রাঁচি চলে' যাচ্ছে;—কত করে' বল্‌লাম—"

অতসীর মুখ ভালো করে' ম্লান হ'তে না হ'তেই আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো।—"তাই তো! কিছুতেই আর থাকতে পারেন না বুঝি ?

ফিরে' এসে ওঁর যা আপ্‌শোষটাই হ'বে। যাক্—তবু ভাগ্যিস্ আমার সঙ্গে দেখা হ'ল।"

বল্‌তে-বল্‌তে অতসী দেহের এমন একটি ভঙ্গী কর্‌লে যে শ্রীহর্ষ কখন্ যে রাস্তায় বেরিয়ে হারিয়ে গেলো, তা পরিতোষের চোখেই পড়্‌তে পারলো না।

রাস্তার প্রত্যেকটি লাইটপোস্‌ট্ তখন শ্রীহর্ষর কানে চীৎকার করে' বল্‌ছে, "যাও, যাও, পালাও—পালাও এখান থেকে, শীগ্‌গির যাও!" কোথায় যাবে সে? যেন এক্‌শোটা ভূতে তা'কে তাড়া করেছে, এই ভাবে ছুটতে-ছুটতে—হ্যাঁ, ছুটতে-ছুটতেই সে রসা রোডে এসে উপস্থিত হ'ল। "এই, ট্যাক্‌সি।" কোথায় যা'বে? নাট্য-মন্দির? চুলোয় যাক্ নাট্য-মন্দির! "যাও—হাঁকাও, জোর্‌সে হাঁকাও!" কোথাও যা'বে না—এম্‌নি ঘুরে বেড়াবে খানিকক্ষণ, যতক্ষণ না তা'র ঘুম পায়।

এইমাত্র যা'কে চিতেয় তুলে' দিয়ে, নিজ হাতে কাঠে আগুন ধরিয়ে শুধু এক মুঠো ছাই হাতে করে' নিয়ে এলাম, বাড়ি ফিরে'ই যদি দেখি, সে চেয়ারে বসে' আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে—সে বিস্ময়ও বুঝি এর চেয়ে নিদারুণ, এতখানি মর্ম্মান্তিক নয়! তা'র চেয়েও আশ্চর্য্য বোধ হয় এই যে একটা সাধারণ বাঙালী মেয়ে একদিন তা'র মনে যে-শিকড় গেড়েছিলো, এতদিনেও সে সেটাকে উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে পার্‌লো না। একদিন দক্ষিণা হাওয়া দিয়েছিলো, ফুল ফুটেছিলো—তারপর চার বছরের অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ! ফুলগুলি তো মরে' গেছে, কিন্তু তা'র গন্ধ এখনো ঘুরে' বেড়ায় কেন?…এই চার বছরে শ্রীহর্ষ সারা পৃথিবী চষে' বেরিয়েছে; পাশ করেছে দু'টো, কিন্তু প্রেম করেছে প্রায় দু'শো। তারপর দেশে ফেরামাত্র জুটলো ইলা—সে কোনোমতে একটা চাক্‌রি বাগাতে পার্‌লেই তা'কে বিয়ে কর্‌বে, এ-কথা সে তা'কে বেশ পরিষ্কার

করে'ই বুঝতে দিয়েছে। শ্রীহর্ষ তো জান্তো, অতসী তা'র মন থেকে একেবারে মুছে' গেছে—শিশুর আঙুলের ঘষায় স্লেটের সকল আঁকিবুঁকি যেমন মুছে' যায়; অতসী মরে' গেছে; এক ফাল্গুনে যে-ফুল ফোটে, আরেক ফাল্গুনে সে আবার দেখা দেয় বটে, কিন্তু যে-মানুষ আজ মরে, কাল তো সে ফিরে' আসে না। সত্যি কথা বল্‌তে কি, এই চার বছর সে অতসীকে বিশেষ স্মরণও করে নি;—অতসীর প্রতি যে-রোষ ও আক্রোশ নিয়ে সে বম্বে থেকে জাহাজে উঠেছিলো, বিলেতে মাসখানেক কাটানোর পর তা'র কোনোটাই বেঁচে ছিলো না; তারপর কিছুদিন রেস্তর্াঁয় বসে' অতসীর কথা বলে' জেইন্ বা জুলিয়ার সঙ্গে সে হাসা-হাসি কর্‌তো বটে, কিন্তু ক্রমে অতসীকে অতখানি প্রাধান্য দিয়ে ধন্য কর্‌তেও তা'র মন বিমুখ হ'য়ে উঠ্‌লো। তারপর—শ্রীহর্ষ সেই সব দিনগুলিকে তন্ন-তন্ন করে' খুঁজে দেখ্‌লে—তারপর সে বিদেশে যদ্দিন ছিলো, অতসীর কথা কদাচিৎ মনে পড়েছে, আর যা-ও পড়েছে, তা কোনো সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা, লজ্জা, অনুতাপ, বাসনা—কিছুর সঙ্গেই নয়। এম্‌নি।

সেই অতসী! দু'নদীর জল এক গ্রাসে মেশালে যেমন কিছুতেই তা'দের আর আলাদা করে' নে'য়া যায় না, তেম্‌নি তা'দের দু'জনের জীবনের ছাড়াছাড়ি হওয়াও অসম্ভব—এই ধারণা নিয়ে পনেরো থেকে বাইশ বছর পর্যান্ত সে কাটিয়েছে। এক সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না উঠেছিলো—ছাতে বসে' থাকৃতে-থাকৃতে হঠাৎ অতসী তা'র বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদ্‌তে সুরু করে' দিলে। শ্রীহর্ষ ব্যাকুল হ'য়ে বলেছিলো, "ও কী? কী হ'ল?" অতসী তখন মুখ তুলে' কান্নার ভেতর দিয়ে হাস্‌তে-হাস্‌তে জবাব দিয়েছিলো, "কিছু মনে কোরো না, শ্রী; আজ আমার এত ভালো লাগ্‌ছে যে আমি না কেঁদে পার্‌ছি না।"

সেই অতসী! সেই সী! সে তা'কে ডাক্‌বার জন্য তা'র নামের শেষের অক্ষরটি বেছে নিয়েছিলো; সে তা'র কাছে কবিতার সেই চির-রহস্যময়ী "সী", শত জান্‌লেও তা'র জানা ফুরোয় না, আকাশের মেঘের মত সে ক্ষণে-ক্ষণে রঙ্‌ বদ্‌লায়, জলের মত সে অবাধ, আলোর মত সে সহজ। সে তা'র চুল বা চোখ বা হাসি বা কাপড়-পরার ভঙ্গী কিছুই নয়, সব মিলে' বা সব বাদ দিয়ে সে এমন একটা-কিছু, মানুষে যা'কে চেনে না এবং কবি বা যা'র একটু আভাস পায় মাত্র। সেই সী!

কিন্তু শ্রীহর্ষরো শেষে কবিতা লেখ্‌বার মত নৈতিক অবনতি হ'ল নাকি? এতক্ষণ সে গা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে' ছিলো, এইবার খাড়া হ'য়ে উঠে' বসে' একটা সিগ্রেট্‌ ধরালে। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে শেষে কিনা একটা সাধারণ বাঙালী মেয়ের কাছে এসে সে হালে পানি পাচ্ছে না, তার নৌকোডুবি হ'তে চলেছে! অসম্ভব! এ সে কিছুতেই হ'তে দেবে না। নিজের ওপর রাগ করে' সে একটা স্কচ্‌ গান গুন্‌-গুন্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো। গানের অংশবিশেষ নিয়ে তা'র বিলিতি বন্ধুদের সঙ্গে কত যে হাসাহাসি করেছে, সে কথা মনে করে' সে শব্দ করে' হেসে উঠ্‌লো।

ট্যাক্‌সিটা তখন চৌরঙ্গীর ঠাসা রাস্তা দিয়ে আস্তে-আস্তে যাচ্ছিলো; হঠাৎ ট্রামলাইনের পাশে এক সাহেবী মূর্ত্তিকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে শ্রীহর্ষ ট্যাক্‌সি থামিয়ে নেমে পড়্‌লো।

"হেল্‌-ও! গু'ড্‌ নিং।"

সাহেব আই, সি, এস্‌ পাশ করে' সবে কালো দেশের মাটিতে পা দিয়েছে, অক্সফার্ডে শ্রীহর্ষর সঙ্গে পড়্‌তো। একবার শ্রীহর্ষর ঘরে বসে' তা'রা দু'জন এক ভাড়াটে লেইডি-ফ্রেণ্ড্‌কে নিয়ে চা খাচ্ছিলো, এমন

সময়—ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে যায় এবং তাদের প্রত্যেকের ছ'গিনি করে' ফাইন্ হয়। সেই থেকে তা'দের ছ'জনে খুব ভাব!

এমন সময়ে এ-হেন বন্ধুর দেখা পেয়ে শ্রীহর্ষ যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লো। ছ'জনেই যদ্দূর খুসি হ'তে হয়! রাস্তা পার হ'য়ে তা'রা ঢুক্‌লো গিয়ে কন্টিনেণ্ট্যল্ হোটেলে। খেতে-খেতে কথার বর্ষণ, হাসির শিলাবৃষ্টি! সে কত পুরোণো কথা। চার্লি কী কর্‌ছে, ভেঙ্কটরত্নম্ অঙ্কে কী ভীষণ নম্বর পেয়েছিলো, নিরামিষভোজী সুন্দর সিংকে একদিন ওরা ফাঁকি দিয়ে মাংস খাইয়ে দিয়েছিলো—তারপর টের পেয়ে লোকটা কেমন ক্ষেপে গিয়েছিলো, পামেলার বিয়ে হ'ল কিনা—ঈজিপ্টলজির ছাত্র ঐ হ্যাঁদারামটার সঙ্গেই তো!—মার্গারেট্ কেনেডি আর কোনো বই লিখ্‌লে কিনা, কার্লো প্যারিসে গিয়ে সত্যি ছবি আঁকা শিখ্‌ছে তো! রোজামণ্ড্ ল্যেমান্-এর সঙ্গে আর দেখা হয়েছিলো? কে? রোজামণ্ড—? ও, সেই নভেলিস্‌ট। হ্যাঁ—তা'র শরীর ভালো না, এখন ব্রিস্‌টলে আছে, বুড়ো বাপকেও নিয়ে গেছে সঙ্গে—খাসা মেয়ে! খাসা চেহারা! সেই দাড়িওলা জাঁদ্‌রেল চেহারার কৃশ ভদ্রলোক সেই যে মিরটাম্লাপাথিণ্ডিভিস্কি না কি কাঁচকলার নাম—ভদ্রলোক ওকে দেখেই ক্ষেপে গেলেন—এম্‌নি লাখ কথা!

কিন্তু লাখ কথার এক কথাটা শ্রীহর্ষ বল্‌লে বাইরে এসে: "জানো, এইমাত্র আমার বয়্‌হুড্ সুইট্‌হার্ট্-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।"

"কা'কে বিয়ে করেছে? বুড়ো বড়লোক, না গরীব আর্টিস্‌ট্?"

"গরীব, কিন্তু আর্টিস্‌ট্ নয়।"

"তারপর? তোমার অবস্থাটা কি? সেই যে কি একটা পদ্য আছে—মনে নেই?—

'When the swift-spoken *when?* and the slowly-breathed *hush*!

Make us half-love the maiden and half-hate the lover,'

না কী?—তেম্‌নি কি? কা'র লেখা হে ওটা? হ্যাঙ্গিট্‌! নাম-টামগুলো আমার কোনো কালেও যদি মনে থাক্‌তো!"—বল্‌তে-বল্‌তে সাহেব গলা ছেড়ে গেয়ে উঠ্‌লো, "My Rosemarie, I love you!"

*　　　*　　　*　　　*

ড্রেসিং টেবিলের ধারে ছোট চেয়ারটির গায়ে চাদর আর পাঞ্জাবী ছুঁড়ে' ফেলে শ্রীহর্ষ দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়্‌লে—"উহ্‌ হ্‌!"

বাঁচ্‌লে। এক দমকে চার ঘণ্টা কলম পিষে' পরীক্ষার হল্‌ থেকে বেরিয়েও এত ক্লান্ত সে হয় নি। সারাটা দিন আকাশে সাঁতার কেটে ছোট পাখীটি যে-ক্লান্তি নিয়ে সন্ধ্যের সময় তা'র নাড়ে ফিরে' আসে, শ্রীহর্ষর দুই চোখে সেই ক্লান্তি ঘুম হ'য়ে ঢুলছে। শাদা, নিভাজ, মখ্‌মলের মত কোমল তা'র বিছানার দিকে তাকিয়ে সে গভীর আরামে একটা হাই তুল্‌লে। আঃ—এইবার শোয়া যাক্‌।

ড্রেসিং-আয়নার দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ চমকে উঠ্‌লো। আয়নার ভেতর থেকে ইলা তীক্ষ্ণ-উজ্জ্বল দুই চোখ মেলে তা'র দিকে তাকিয়ে আছে, তা'র ঠোঁটের এক কোণ ঈষৎ বাঁকা। বিলেত-ফেরত ডক্টরের বুকটাও একবার ধ্বপ্‌ করে' উঠ্‌লো। ও, ইলার সেই ফোটোগ্রাফ্‌! শ্রীহর্ষ সেটা শিয়রের কাছে রেখে শোয়, কিন্তু কে যেন ভুলে' সেটা আয়নার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। কি কাণ্ড! আর একটু হ'লেই সে ভয় পেয়ে গেছ্‌লো আর কি!

ছবিটি সরিয়ে এনে সে ভালো করে' দেখ্‌তে লাগ্‌লো। হ্যাঁ, সুন্দর বটে! অতসীর চেয়ে—কথাটা সে যেন নিজের অজানিতেই ভেবে ফেল্‌লো—অতসীর চেয়ে অন্তত দশগুণ সুন্দর! এই মেয়ে তা'কে বিয়ে কর্‌তে পার্‌লে বেঁচে যায়, এ-কথা ভাব্‌তে আত্মপ্রশংসায় সে নিজের মনে একটু হাস্‌লে। অতসীকে এই ছবিখানা দেখালে কেমন হয়;—তা-ই বা কেন?—আসলটিই কি দেখানো যায় না? অতসী কী মনে কর্‌বে? মুহূর্ত্তের জন্য একটা অনির্দ্দিষ্ট ব্যাকুলতা কি তা'কে ম্লান করে' দেবে না? একটুখানি ক্ষোভ, দুঃখ বা ঈর্ষা—কিছুই কি হ'তে নেই? আচ্ছা পরখ্‌ করে'ই দেখা যাক্‌ না। এক মাসের মধ্যেই ইলাকে সে বিয়ে কর্‌বে—এই কল্‌কাতায়। সে-বিয়েতে অতসীর নেমন্তন্ন হবে—স্বামীপুত্রসমভিব্যাহারে সে আস্‌বে—ঝল্‌সানো চোখ আর নিঙ্‌ড়ানো হৃদয় নিয়ে ফিরে' যাবে।

দূর হোক্‌ অতসী! ইলা—ইলা! সে প্রায় চেঁচিয়ে ডেকে উঠেছিলো! ছবিটি হাতে তুলে' সে একবার চুম্বন কর্‌লো। ছবির ঠাণ্ডা ঠোঁট তা'র এ-আদরে একটুও সাড়া দিলে না। তা'র কেমন যেন ভয়-ভয় কর্‌তে লাগ্‌লো। ইলার ঠোঁটও এম্‌নি ঠাণ্ডা, নিরুত্তর হ'য়ে গেলো না তো? না, না—আর দেরি নয়! সে আজই রাঁচি যা'বে;—এক্ষুণি! ইলার সুস্নিগ্ধ চিঠির কথা স্মরণ করে' সমস্ত হৃদয় তা'র গান গেয়ে উঠ্‌লো।

সাড়ে-দশটা! রাঁচি এক্‌স্‌প্রেস্‌ ছেড়ে গেছে। কম্পিত হস্তে সে সেদিনকার "স্‌টেইট্‌স্‌ম্যান্‌"-এর পাতা ওল্টাতে লাগ্‌লো। হ্যাঁ—এই যে, একখানা স্পেশ্‌ল্‌ দিয়েছে—এগারোটা বাইশ মিনিটে হাওড়া ছাড়্‌বে, কাল বেলা দশটা-নাগাদ পুরুলিয়া—দুপুরবেলা স্নানাহারের পর ঝাউয়ের ছায়ায় দু'খানা রকিং চেয়ার টেনে নিয়ে সে আর ইলা—।

তিন মিনিটের মধ্যে সে জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল্‌লো। বিছ্‌না? থাক্‌গে—অত হ্যাঙাম কর্‌বার সময় নেই। তারপর এইমাত্র পরিত্যক্ত পাঞ্জাবি পরে', চাদরটা কোনোমতে গায় জড়িয়ে আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সে চুলটা একটু আঁচ্‌ড়ে' নিতে লাগ্‌লো। ড্রেসিং আয়নায় নিজেকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে সে বেশ খুসিই হ'ল। লোকে বলে, সে নাকি দেখ্‌তে খুব সুন্দর! হ্যাঁ, তা-ই বটে। ছোট চেয়ারটিতে বসে' পড়ে' সে নিজের মুখ ভালো করে' দেখ্‌তে লাগ্‌লো। চওড়া কপাল—তা'তে ছোট-ছোট নীল শিরাগুলো একটু-একটু দেখা যায়, চুল আসলে কালো, কিন্তু এখন একটু হাল্কা বাদামীর আমেজ লেগেছে, চোখ দু'টো খাঁটি বাঙালী—অর্থাৎ মিশ্‌মিশে কালো, নাকটা গ্রীক্‌, ওপরের ঠোঁট নীচেটার চাইতে একটু পুরু হওয়াতে মুখে কেমন একটা লুব্ধতার ছাপ পড়েছে—কীট্‌স্‌-এরও নাকি ঐ রকম ছিলো—থুত্‌নিটা ঈষৎ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় হঠাৎ দেখ্‌লে লোকটাকে দৃঢ়চিত্ত বলে' ভুল হয়; রঙ্‌ চিরকালই ফর্সা, তবে বিদেশ ঘুরে' এসে আরো হয়েছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় নানা লোকে তা'কে জিজ্ঞেস করেছে, "তুমি কোন্‌ জাতি? এ-প্রশ্নের তা'র এক বাঁধা জবাব ছিলো, "Guess"। কেউ বলেছে ইতালিয়ান্‌, কেউ স্প্যানিশ্‌, কেউ বা জু, বেশির ভাগই বলেছে ফ্রেঞ্চ্‌, একজন বলেছিল পোল্‌, এমন কি অনেকে তা'কে ইংরেজ বা আইরিশ্‌ও ভেবেছিলো—কিন্তু বাঙালী বলে' কেউ মনে করে নি। এবং সে যখন তা'র পরিচয় ব্যক্ত কর্‌তো, তখন সবারই চোখে সে যে বিস্ময় ফুটে' উঠ্‌তে দেখেছে, তা'র মানে এই: "সত্যি? বাঙালীর এমন চেহারা হয়?"...নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে সে গর্বিতভাবে হাস্‌লে।

আচ্ছা, অতসীর কি কপালের নীচে দু'টো চোখ ছিল না?

আজ্‌কে—এখন, এই মুহূর্তে একা বিছ্‌নায়—না, না, একা তো নয়! স্বামীপুত্র নিয়ে বিছ্‌নায় শুয়ে'-শুয়ে' কি ওর মনে একটুখানি অনুতাপও হচ্ছে না? সব মিলে' শ্রীহর্ষ কি যথেষ্ট লোভনীয় নয়? কিন্তু অতসী তো ইহজীবনে আর ছাড়া পাবে না। অতসীর কাছে সে এখন আকাশের চাঁদের মতই সুস্পষ্ট অথচ দুষ্প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই ক্ষ্যাপার মত সে যতই না কেন তা'র পানে হাত বাড়িয়ে কাঁদুক, কখনো নাগাল পা'বে না। বাঃ, কী মজা!

আচ্ছা, এক কাজ কর্‌লে কেমন হয়? অতসীকে কি খুব স্পষ্ট করে' জানিয়ে দে'য়া যায় না যে, সে যা হাতের মুঠোয় নিয়ে তারপর পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছে, তা তা'র বুকের মণি হ'লেই মানাতো, কিম্বা তা-ও মানাতো না! কীর্ত্তিতে প্রশংসায় গৌরবে সম্মানে আনন্দে উজ্জ্বল তা'র জীবনের সবগুলো রশ্মি একত্র করে' সেই মায়াময় দীপ্তি সে অতসীর মুখের ওপর ছুঁড়ে' মার্‌বে; অতসী চম্‌কে উঠ্‌বে, ব্যথায় তা'র বুকের কলকব্জাগুলি মোচড় দিয়ে উঠ্‌বে; যা সে হারিয়েছে, অথচ যা তা'র হ'তে পার্‌তো, তা'রি জন্যে প্রবল ব্যাকুলতায় সারা মন তা'র ফেটে পড়্‌বে। সে ভারি মজা হয়, না?

এ কি? এগারোটা-বারো? হোক্‌গে—আজ সে যাচ্ছে না। আজ তো নয়ই, শীগ্‌গিরও না। ইলাকে লিখে' দেবে তা'র অসুখ করেছে—আর পরিতোষ, পরিতোষকে যা-তা একটা-কিছু বলে' দিলেই চল্‌বে। গুছোনো স্যুটকেইস্‌টির দিকে একবার তাকিয়ে সে আলো নিবিয়ে দিলে।

জাগরণ ও নিদ্রার মাঝামাঝি যে-একটা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা আছে, সেইটুকু সময়ে তা'র মাথায় খেলে গেলো,...**"half-love the maiden and half-hate the lover!"**

পরদিন সকালে—শ্রীহর্ষর তখন ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু তখনো সে বিছ্‌না ছেড়ে ওঠে নি—পরিতোষ নিজেই এসে হাজির। তা'কে দেখেই শ্রীহর্ষর আশা হ'ল যে সে তা'কে আবার কল্‌কাতায় আরো কিছুদিন থেকে যাবার জন্য অনুরোধ কর্‌তে এসেছে ;—তা হ'লে শ্রীহর্ষর পক্ষে সবি সহজ হ'য়ে আসে! বানিয়ে কথা-বলার ব্যাপারে সে চিরকালই কেমন একটু কাঁচা।

কিন্তু পরিতোষ প্রথম যে-কথা শুধোলে, তা হচ্ছে এই "কাল্‌কে 'ষোড়শী' কেমন লাগ্‌লো ?"

অসম্ভব নয়—শ্রীহর্ষর মনে হ'ল—অতসী হয়-তো পরে পরিতোষকে নিয়ে নাট্য-মন্দিরে গিয়েছিলো, এবং তা'কে দেখ্‌তে পায় নি। তাই একটু ভয়ে-ভয়ে সে বল্‌লে, "মিড্‌লিং। কিন্তু লোকে বল্‌লে, শিশির-বাবুর অভিনয় নাকি খুব কম রাত্তিরেই এমন perfect হয়েছে। গেলেই পার্‌তে।"

"কোথায় আর যাওয়া হ'ল ভাই! তুমি চলে' যাওয়ার পর বৌদির শুধু পায়ে ধর্‌তে বাকি রেখেছি—অথচ উনি কেন যে কিছুতেই রাজি হ'লেন না ভগবানই জানেন। তারপর আমার আর একা-একা যেতে ইচ্ছে কর্‌লো না।"

"তা করবে তো না-ই। থিয়েটার-ফিয়েটার দেখ্‌তে গেলে একজন সঙ্গী নইলে ভালো লাগে না। আমি একা ছিলুম বলে'ই বোধ হয় ততটা ভালো লাগেনি। কিন্তু শিশিরবাবু—হ্যাঁ, আশ্চর্য্য বটে, মানে বাঙ্‌লা

দেশের পক্ষে। বিলেত যাওয়ার আগে আমি একদিন মাত্র বাঙ্‌লা থিয়েটার দেখেছিলুম—কিন্তু যাই বলো, শিশিরবাবুর দৌলতে বাঙ্‌লা থিয়েটার এক ধাপে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছে…", শ্রীহর্ষর মুখে খই ফুটতে লাগ্‌লো। পরিতোষ কিছুতেই অন্য কোনো কথা পাড়্‌বার ফুর্‌সৎ পাচ্ছিলো না, এমন সময় চাকর এসে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে যে, এখন চা আন্‌তে হ'বে কি না।

লুনাচার্‌স্কি'র কীর্ত্তি-কাহিনীর মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে শ্রীহর্ষ জবাব দিলে, "হ্যাঁ, নিয়ে এসো। দু'জনের মত। না হে, উঠ্‌তে হয়।"

পরিতোষ ড্রেসিং টেবিলের পাশের ছোট চেয়ারটিতে বসে' ছিলো; সেই সময় মেঝের ওপর দৈবাৎ চোখ পড়্‌তেই সে বলে' উঠ্‌লো, "এ কী?" তারপর নীচু হ'য়ে ইলার ফটোগ্রাফ্‌টি তুলে' চোখ মিট্‌মিট্ করে' বল্‌লে, "এত অনাদর যে?"

শ্রীহর্ষ ফোটোটি নিজের হাতে নিয়ে গলাটা হঠাৎ ছুঁচ্‌লো করে' বল্‌লে, "ও ডিয়ার্, ডিয়ার্!" কি করে' পড়্‌লো হে? আমি তো শোবার আগেও একবার দেখে রেখেছিলাম!"

"লক্ষণ বিশেষ ভালো নয় হে। ইলাকে লিখে' দাও—না, লিখে' আর দেবে কি?—আজ তো যাচ্ছই। দেখা হ'লে বোলো—"

শ্রীহর্ষ ভাব্‌লে, এ সুযোগ হারানো উচিত নয়। চুলগুলির ভেতর হাত চালাতে-চালাতে সে অলসভাবে বল্‌লে, "না হে, আজ যাওয়া হয় কি না সন্দেহ।"

"কেন?" পরিতোষ সত্যিই অবাক হ'ল।

ভাব্‌বার জন্য একটু সময় পাবে বলে' শ্রীহর্ষ বিছ্‌না থেকে উঠে' পড়্‌লো, তারপর চটিজোড়া খুঁজে বা'র কর্‌তে যতটা সম্ভব দেরি করে',

জানলার কাছে গিয়ে থাম্‌কা একবাব থুতু ফেলে বল্‌লে, "বোলো না ভাই বিপদের কথা।" বলে'ই থেমে গেলো।

পরিতোষ উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে শুধোলে, "কী?"

এতক্ষণে শ্রীহর্ষর মনে গল্পটা আগাগোড়া তৈরী হ'য়ে গিয়েছিলো; সে তাড়াতাড়ি বল্‌তে লাগ্‌লো, "কাল হঠাৎ মিঃ কাউলিঙ্‌য়ের সঙ্গে দেখা। নাট্যমন্দিরের পথে একবাব স্যাঙ্গু ভ্যালিতে গেছ্‌লাম সিগ্রেট্‌ কিনতে—ফুটপাথ্‌-এ নাব্‌তেই দেখা। ছিলো লীড্‌স্‌ ইউনিভার্সিটিতে একটা লেক্‌চাবার, এখন নাকি রেঙ্গুন্‌-এ প্রফেস্সব্‌ হয়েছে—মাইনে টান্‌ছে লম্বা। বল্‌লে, ওখানে একটা চাক্‌বি খালি হয়েছে, আমি যদি—ইত্যাদি। কাউলিঙ্‌ এখানে কিছুদিন থাক্‌বে, ওকে পটাতে পারলে চাক্‌বিটা বাগানো যায় বোধ হয়। ছ'শোতে স্‌টার্ট্‌—লোভ হচ্ছে হে! তাই ভাব্‌ছিলুম—" কি বলে' যে শ্রীহর্ষ কথাটা শেষ কব্‌লে, ভালো কবে' বোঝা গেলো না।

পবিতোষ কিন্তু খুসি হ'তে একটুও দ্বিধা কর্‌লে না। পবম উৎসাহে বলে' উঠ্‌লো, "বাঃ, ওয়ান্‌ডাফুর্‌ল। যা-ই বলো, কপাল বটে তোমাব। মাসে ছ'শো, পাশে ইলা— বাঃ, এই পৃথিবীটা 'is paradise anow'! আর কী চাই!"—

শ্রীহর্ষ পবিতোষের উৎসাহে বাধা দিয়ে বল্‌লে, "এই যে, চা।" তারপব চা-য়ে এক চুমুক দিয়ে এক টুক্‌বো রুটি আঙুল দিয়ে নাড়্‌তে-নাড়্‌তে গম্ভীর ভাবে বল্‌লে, "Seriously, এটাব জন্য চেষ্টা কব্‌বো, ভাব্‌ছি। একটা-কিছু না কবলে চল্‌বে না যখন। তাই আজ বোধ হয় আমার যাওয়া হ'ল না। কিন্তু "

তথৈব

শ্রীহর্ষ যেন সত্যি-সত্যি চলে' যা', আর যেন কখনো না আসে—সে-রাত্রে সে যতক্ষণ জেগে ছিলো, এবং ঘুমোবার পরও স্বপ্নের মধ্যে—অতসী এই প্রার্থনা করেছে। নিজের কাছে সে বার-বার বল্‌ছিলো যে শ্রীহর্ষকে সে ঘৃণা করে—কিম্বা তা-ও করে না,—মোট কথা, তা'র বর্ত্তমান জীবনের সুনির্দ্দিষ্ট আয়োজনে শ্রীহর্ষর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। পূর্ণিমার আকাশে একটা মস্ত কালো পাখী ডানা ঝাপ্‌টে উড়ে' গেলে নীচে নদীর বুকে মুহূর্ত্তের জন্য যে-ছায়াখানি টল্‌মল্‌ করে' ওঠে, এ-দেখা, মুমূর্ষু গোধূলির সুবর্ণ-লগ্নে এই চকিতের দৃষ্টি-বিনিময়, যেন তা'র চেয়েও ক্ষণিক, তা'র চেয়েও অবাস্তব হয়। এ-জীবনটা যেন একটা প্রকাণ্ড গোলকধাঁধা;—লক্ষ-লক্ষ পথ এঁকে-এঁকে, বার-বার পরস্পরকে অতিক্রম করে' চলে' গেছে,—আমরা সারা-জীবন অন্ধের মত ঘুরে'-ঘুরে' হেঁটে চলেছি—বেরুবার পথ এক মৃত্যুই জানে। আজ হঠাৎ শ্রীহর্ষর পথ অতসীর পথের ওপর এসে পড়েছে;—কিন্তু—অতসী প্রার্থনা করে—তা'র পথের পরের বাঁকই যেন তা'কে অন্য দিকে নিয়ে যায়। এ-ফাঁড়া কাট্‌লে হয়তো চিরজন্মের মত সে বেঁচে যাবে।

কিন্তু পরের সন্ধ্যায় আবার শ্রীহর্ষকে দেখে সে যতটা প্রকাশ করেছিলো, আসলেও ততটা বিস্ময় অনুভব করেছিলো কি? অতসীই জানে। তা'র না-যাওয়ার যে-সব অনিবার্য কারণ শ্রীহর্ষ বিড়্‌বিড়্‌ করে' উচ্চারণ কর্‌লে, সে-গুলো যেন সে গায়েই মাখ্‌লো না। শেষ পর্য্যন্ত না দেখে কিছুই বলা যায় না—এই ধরণের একটা অনিশ্চিত সন্দেহের

উদ্বেগ কি তা'র মনে আগাগোড়াই ছিলো? গতরাত্রে যখন সে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীহর্ষর বিদায়-কামনা কর্‌ছিলো, তখন সেই প্রার্থনার অন্তরালে আর-একটি ক্ষীণ ঈষৎ-স্ফুট প্রার্থনা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলো—তা কিসের জন্য? অতসী নিজেই ভেবে পেলো না।

বছর-দু'য়েকের একটি নিকার-পরা ছেলেকে কোলে করে' যে ভদ্রলোকটি ঘরে এলেন, পরিচয় না থাক্‌লেও শ্রীহর্ষর তাঁকে চিন্‌তে ভুল হয় নি। প্রত্যেক মানুষের মুখেই কিছুকাল পরে তা'র পেশার একটা বিশিষ্ট ছাপ পড়ে' যায়; কিন্তু ইস্কুলমাষ্টারিতে সে-ছাপ যত শীগ্‌গির ও যত দৃঢ়ভাবে পড়ে, তেমন আর-কিছুতেই নয়। ভদ্রলোকের মুখে ইস্কুলমাষ্টারির সবগুলি লক্ষণ করতলে অজস্র রেখার মত সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। অকালেই যেন বুড়িয়ে গেছেন, কপালের নীচেকার চাম্‌ড়ায় এখুনি চির্ ধরেছে, চশ্‌মার পেছনের চোখ দু'টি মাছের চোখের মতই বড় ও পরিষ্কার কিন্তু তেম্‌নি নিষ্প্রাণ। শ্রীহর্ষ গতরাত্রে আয়নায়-দেখা একটি প্রাণ-রসোচ্ছল মুখশ্রীর কথা না ভেবে পার্‌লে না; নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে তা'র ঠোঁটে হাল্‌কা একটি হাসি উঠে' এলো।

মাণিককে সতরঞ্চির ওপর নামিয়ে রেখে সুরথ একটু ভয়ে-ভয়ে শ্রীহর্ষর দিকে এগিয়ে এসে নিতান্ত মামুলিভাবে আলাপ আরম্ভ কর্‌লে, "আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌বার সৌভাগ্য হ'বে, আশা করিনি, ডক্টর্ সরকার। কাল ফিরে এসে পরিতোষের মুখে যখন শুন্‌লাম—এত খারাপ লাগ্‌ছিলো। যাক্, আপনি এখান থেকে শীগ্‌গির যাচ্ছেন না যখন—"

"কিছুই ঠিক নেই আমার। যদি ডাক পড়ে তা'লে দিন-সাতেকের মধ্যে রেঙ্গুনের জাহাজেও চাপ্‌তে হ'তে পারে। ওদের নাকি আবার পূজোর ছুটি-ফুটি না থাক্‌বার মধ্যেই। আর, এটা ফস্‌কালে করে যে আবার একটা জুট্‌বে, কেউ বল্‌তে পারে না।"

"আপনাদের আবার ভাবনা কী ডক্টর্ সরকার! আপনারা হ'লেন গিয়ে দেশের গৌরব, যে-কোনো কলেজ আপনাকে পেলে ধন্য হ'য়ে যা'বে।"

লজ্জিত হ'লে মানুষ যা-যা করে বলে' শ্রীহর্ষ জান্‌তো, সে ভেবে-ভেবে তা-ই কর্‌লে। প্রথমে মাথা নীচু কর্‌লে, তারপর চুলে একবার হাত বুলিয়ে আম্‌তা-আম্‌তা করে' জবাব দিলে, "না, না, ও-সব গৌরব-টৌরব কিছু কাজের কথা নয়। দয়া করে' কেউ একটা নক্‌রি দেয় তো তবে' যাই।"

পরিতোষ ফস্ করে' বলে' ফেল্‌লো, "কেন বে বাপু, তোমার এমন কী দায় ঠেকেছে যে চাক্‌রির জন্য মাথা খুঁড়ে' মর্‌তে হ'বে? আমি যদি তুমি হ'তুম, তা'লে কী কর্‌তুম জানো?—অর্থাৎ, কিছুই না। কিছু-না-করার বিদ্যেটা কিছুতেই তোমার আয়ত্ত হ'ল না;—ছট্‌ফটানি তোমার একটা ব্যাধি।"

"এ-ব্যাধি ও-দেশে সব লোকেরই আছে কিনা—আমারো বোধ হয় ছোঁয়াচ লেগেছে। সত্যি, হাতে কোনো কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে প্রতিটি দণ্ড আমাব কাছে যেন বিষম দণ্ড মনে হয়। আপনিই বলুন্ সুরথ বাবু, না খাট্‌লে কি আর দিন কাটে?"

"আপনি এ-কথা বল্‌তে পারেন, ডক্টর্ সরকার"—সুরথ একবার কাশ্‌লে—"কিন্তু আমরা—যা'রা খালি খেটে-খেটে জীবনটা ক্ষয় কর্‌ছি, তা'দের পক্ষে একটু আরাম বা বিশ্রাম এম্‌নি দুর্লভ যে ক্রমে কাজ বল্‌তেই আমাদের গায়ে যেন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে।"

"অথচ সেই কাজই তো করে' যেতে হচ্ছে! নিষ্কৃতি যখন নেই-ই তখন প্রতিদিন নিজের সঙ্গে কলহ না করে' ভালোয়-ভালোয় একটা আপোষ করে' ফেলাই কি শ্রেয় নয়? দেখুন্, ওদের সঙ্গে আমাদের

গোড়াতেই তফাৎ। অর্থাৎ মনের দিক থেকে—বাইরের বিত্ত বা রিক্ততার কথা ছেড়ে দিলেও। কাজ জিনিষটা আমাদের কাছে হচ্ছে একটা সাজা, আর ওদের কাছে মজা। জীবনকে আমরা একটা অসুখ বলে' ভাব্‌তে শিখি, আর ওদের মতে বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সুখ। না কর্‌লেই নয় বলে' আমরা কাজ করি, তাই কাজে মন বসে না—এবং সেই কাজের চাপে মন আমাদের মরে' যায়।"

শ্রীহর্ষ বোধ হয় বাড়ি থেকে প্রতিজ্ঞা করে' বেরিয়েছিলো যে আজ সে তাক্ লাগাবে। লাগালেও। সুরথ তা'র বাক্‌চালনায় অবাক হ'য়ে হাঁ করে' তাকিয়ে আছে, পরিতোষ তা'র সমস্ত চোখ মুখ দিয়ে শ্রীহর্ষর কথায় সায় দিচ্ছে। শ্রীহর্ষ একবার অতসীর দিকে তাকালে—সে তা'দের দিকে পেছন ফিরিয়ে বসে' মাণিককে হাঁটুর ওপর বসিয়ে তা'র সঙ্গে গল্প কর্‌ছে।

মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীহর্ষ এই একটুখানি দমে' যাচ্ছিলো, কিন্তু সুরথের প্রবল কৌতূহল ও প্রকাশ্য প্রশংসা ঠেল্‌তে না পেরে সে আবার আলাপে জমে' গেলো। অতসী খানিকক্ষণ সেই ভাবে চুপ করে' বসে' রইলো, তারপর এক সময় উঠে' মাণিককে নিয়ে ওপরে চলে' গেলো। যাবার সময় পরিতোষের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে জানিয়ে গেলো যে মাণিকের দুধ খাবার সময় হয়েছে।

তিন ঘণ্টা পরে অতসী একা বাইরের ঘরে বসে' ছিলো। একটু আগে আড্ডা ভেঙেছে—স্বামীর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে যেন শ্রীহর্ষর প্রশংসা উথ্‌লে পড়্‌ছে, পরিতোষেরো খুসি আর ধরে না—তা'রি বন্ধু কিনা! শ্রীহর্ষ অতসীরই শুধু কেউ নয়—কিছু নয়। অতসীর চেঁচিয়ে হেসে উঠ্‌তে ইচ্ছে কর্‌লো।

ইস্—ঘরটা কী নোঙরা হয়েছে! সিগ্রেটের টুক্‌রো আর ছাইয়ে

সারা ঘর একাকার! এখনো তেম্‌নি বুড়ো আঙুলে টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়ে! সে একটা টুক্‌রো হাতে তুলে' দেখ্‌লে;—সেই স্‌টেইট্‌ এক্‌স্‌প্রেস্‌! নাঃ—কাল থেকে একটা অ্যাস্‌-ট্রে-ক্রে কিছু রাখ্‌তে হ'বে। চাকরটাকে ডেকে এক্ষুণি ঝাট দে'য়াতে হয়—থাক্‌ গে, সে নিজেই দেবে'খন। কাল্‌কের ফুলগুলো একেবারে শুকিয়ে গেছে, বদ্‌লে ফেল্‌তে হয়! ফুল্‌দানি থেকে সেই রজনীগন্ধার গুচ্ছ তুলে নিয়ে ফেল্‌বার জন্য বাইরের দরজার কাছে যেতেই ফুলগুলো আপনা হ'তেই তার হাত থেকে খসে' পড়ে' গেলো।

"এ কী? আবার এসেছো কেন?"

শ্রীহর্ষ পাথরের মত মুখ করে' বল্‌লে, "সিগ্রেট-কেইস্‌টা ফেলেই যাচ্ছিলাম।"

মানুষের সর্ব্বনাশ যখন হয়, একটা মুহূর্ত্তেই হয়। সেই মুহূর্ত্ত অতসীর জীবনে এসেছে। একটা মুহূর্ত্তের জন্য তা'র মনের শাসন আল্‌গা হ'য়ে গেলো; কেন, কেউ বল্‌তে পারে না—সেই মুহূর্ত্তে, সে কে এবং কোথায়, সবি যেন সে একেবারে ভুলে' গেলো। সেই পুরোনো হাসি হেসে সেই পুরোনো কণ্ঠস্বরে বল্‌লে, "সত্যি?"

প্রকাণ্ড একটা বাড়ির তলাকার মাটি পদ্মার ধারালো জল যেমন চুপে চুপে খেয়ে যায়, তারপর একদিন হঠাৎ একটা ঢেউয়ের ঝাপটেই সারাটা বাড়ি গুঁড়িয়ে চুরমার হ'য়ে যায়, তেম্‌নি অতসীর মুখে এই একটি কথা শুনে' শ্রীহর্ষের সুদৃঢ় আত্ম-আস্থা ও প্রগাঢ় আত্মস্থতা ফেটে ভেঙে চৌচির হ'য়ে গেলো। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে-মুখ ছিলো জগন্নাথের মূর্ত্তির মতই দারুময়, সেখানে প্রাণরঞ্জিত মাংসের সজীব আভা ফুটে উঠ্‌লো, চঞ্চল রক্তের চলাফেরায় সে-মুখ গরম হ'য়ে উঠেছে। শ্রীহর্ষের কণ্ঠে আর সেই শান-বাঁধানো পালিশ-করা স্বর নেই; ছোট্ট

একটু "হ্যাঁ" বল্‌তে গিয়েই তা এস্রাজের আওয়াজের মত কেঁপে উঠ্‌লো।

যেন ঘুমের ঘোরে অতসী কথা কয়ে' উঠ্‌লো, "ভালোই হ'ল। তবু তোমাকে দেখ্‌লাম। কিন্তু ছি-ছি—তুমি এ কী ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছো বলো তো?"

শ্রীহর্ষর ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়্‌তে লেগেছে। চুপ করে' সে দাঁড়িয়ে রইলো।

"আজ্‌কে সন্ধ্যায় তোমার নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে কী কাণ্ডটাই না কর্‌লে! চেঁচিয়ে হাত পা ছুঁড়ে, মাপা-জোকা মুখভঙ্গী করে' নিজেকে বেশ সঙ্‌ সাজিয়েছিলে যা-হোক! তোমার সব কসরৎ দেখে আমার এত হাসি পাচ্ছিলো! কিন্তু কেন বলো তো? কা'কে জয় করবার জন্যে?"

শ্রীহর্ষ নিরুত্তর।

"দ্যাখো শ্রী, বাইরের জাঁক-জমক ঠাট্‌-ঠমকের তখনই সব চেয়ে প্রয়োজন বেশি, আসল জিনিষটির যখন মরণ-দশা ঘটে। সজ্জার আতিশয্য-মাত্রই হৃদয়ের দারিদ্র্যের পরিচয়। নিজকে পদে-পদে জাহিব করে' চল্‌বার তোমার তো কোনো দর্‌কার নেই! কিন্তু আমি কা'কে কী বোঝাচ্ছি? কপাল আর কা'কে বলে!" অতসী রুদ্ধশ্বাসে থেমে গেলো।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ্‌চাপ্‌। রাস্তা দিয়ে খট্‌খট্‌ আওয়াজ কর্‌তে-কর্‌তে একখানা ট্যাক্‌সি ছুটে গেলো, আকাশ থেকে একটা তারা হঠাৎ ছুটে' পড়্‌লো, একটা আকস্মিক দম্‌কা হাওয়ায় সাম্‌নের একটুখানি অন্ধকার যেন শির্‌শির্‌ ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো। তারপর শ্রীহর্ষ ডাক্‌লে, "সী।"

"কী, শ্রী?"

তারপর আবার দু'জনে চুপ ক'রে পরস্পরের নিঃশ্বাস-টানার শব্দ শুন্‌তে লাগ্‌লো। দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কিন্তু আব্‌ছা আলোয় কেউ কারো মুখ ভালো করে' দেখ্‌তে পাচ্ছে না। অথচ, একজন একটু হাত বাড়ালেই আর একজনের আঙুলে গিয়ে ঠেকে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পরিতোষের চীৎকার শোনা গেলো, "বৌদি!"

অভিনয় ভেঙ্গে গেলো, মুখোস্ খসে' গেছে। এইবার নিজেকে সে লুকোবে কী করে'?

শ্রীহর্ষর ভাব্‌বার ক্ষমতা যখন ফিরে' এলো, তখন সে আবিষ্কার কর্‌লে যে সে অনেক সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ কর্‌ছে। মনকে চব্বিশ ঘণ্টা শিখিয়ে পড়িয়ে তোতাপাখীর মত তৈরি রাখার দরকার নেই আর;—মন খালাস পেয়ে তা'র ওপর এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে সুরু করেছে, এখন আর তাকে কোনো মতেই বাগানো যাচ্ছে না।

কিন্তু বদ্‌মেজাজি বাপের কড়াকড়ির মাঝখান থেকে সে যা কেড়ে নিয়েছে, আজ এক ভালোমানুষ স্বামীর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে' তা কুড়িয়ে নিতে হ'বে—এই কথা ভাব্‌তেই ঘৃণায় তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। এ-সব ব্যাপারে কোনো ভাঙা-চোরা জোড়া-তালিতে সে বিশ্বাস করে না; মানুষের মনটাকে টাকা-আনা-পাইতে ভাগ করা চলে না বলে' সে-ক্ষেত্রে হিসেব-করা ব্যবসাদারি খাটে না, তা'র এ সংস্কার বিলেতের দু'টো ডিগ্রীও ঘোচাতে পারে নি। নির্জ্জলা একাদশী বরং ভালো, কিন্তু একবেলা আলুসেদ্ধ-ভাতে সে নারাজ।

কাজ কি আর ফ্যাসাদ বাধিয়ে? মান থাকৃতে থাকৃতে সরে' পড়া যাক্! কিন্তু আগের রাত্রে প্যাক্-করা স্যুট্কেইস্‌টির দিকে তাকিয়ে সে নিজকে বিশ্বাস কর্‌বার মত ভরসা পেলো না।...

সুরথ বিছ্‌নার সামনে আলো নিয়ে দিলীপরায়ের 'মনেরপরশ' পড়্‌তে-পড়্‌তে উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে শ্রীহর্ষকে মেলাবার চেষ্টা করছিলো;—অতসী এসে তা'র হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিয়ে ধুপ করে' তা'র পাশে বসে' পড়্‌লো।

সুরথ একটু বিরক্ত হ'য়েই বলে' উঠ্‌লো, "ও কী? আহা—দাও বইখানা, একটা ভারি মজার—"

"কী ছাই বই নিয়েই যে আছ দিন-রাত!" অতসী বইখানা বেশ জোরেই টেবিলের ওপর ছুঁড়ে' ফেল্‌লে। তারপর স্বামীর গা ঘেঁষে আধ-শোয়া অবস্থায় ছোট খুকীর মত আব্‌দারের সুরে বল্‌লে, "সাড়ে দশটার পর বই খুল্‌লে প্রত্যেক মিনিটে এক আনা জরিমানা—বুঝ্‌লে? আজ থেকে এই নিয়ম হ'ল। জরিমানার পয়সা আমার কাছে জমা থাক্‌বে, এবং পরে তা মাণিকের পোষাকের বাবদ খরচ হবে।"

সুরথের বাস্তবিকই উপন্যাসের পরিচ্ছদটা শেষ কর্‌তে ভয়ানক লোভ হচ্ছিলো, কিন্তু অতসীর কোমল ও ঈষদুষ্ণ গাত্রস্পর্শ তা'র কাছে ভালোই লাগ্‌ছিলো, তাই সে কোনো কথা বল্‌লে না।

অতসী হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, "তোমার নামে একটা নালিশ আছে।"

সুরথ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস্ করলে, "কী ?"

অতসী স্বামীর একখানা হাত গালের ওপর টেনে নিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, "ঐ যে তোমাদের ডক্টর্ সরকার না কী—"

"হ্যাঁ, তাঁর কী হয়েছে ?"

"ঐ লোকটাকে কাল আবার আস্‌তে বলেছো নাকি ?"

"কাল বলে' বিশেষ-কিছু নয়, পার্‌লে রোজই যেন আসেন, এই অনুরোধ—"

"আমাকে উদ্ধার করেছো একেবারে। লোকটাকে একটুকো ভালো লাগে না।"

"সে কি কথা, অতসী ? এমন চমৎকার—"

"চমৎকার না হাতী। ভদ্রলোক যেন আর না আসেন—বুঝ্‌লে ?"

সুরথ চশ্‌মা-জোড়া চোখ থেকে নামিয়ে রেখে একটু বিস্ময়সহকারে প্রশ্ন কর্‌লে, "কেন বলো তো ?"

"কেন আবার ? আমার ইচ্ছে। তোমরা যা-ই বলো, আমার ভালো লাগে না—"

সুরথ প্রাণ খুলে' হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো। হাসি থাম্‌লে পর বল্‌লো, "সত্যি, তোমরা বাঙালী মেয়েরা জবুথবু কাপড়ের বস্তা হ'য়েই রইলে ! তোমাদের যা-সব কেরদানি ঐ রান্নাঘর আর ভাঁড়ার পর্যন্তই। তা'র বাইরে একটু পা বাড়াতে হ'লেই তোমরা হিম্‌শিম্ খেয়ে একেবারে বেকুব্ বনে যাও। বাইরের প্রকাণ্ড জগৎ থেকে আমাদের মেয়েরা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে বলে'ই তো আমাদের দেশের এত দুর্গতি।...আর দ্যাখো গে বিলেতে ! সাধে কি ওরা সারা পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব খাটাচ্ছে !"

অতসী স্বামীর আঙুলগুলো নিয়ে খেলা কর্‌তে-কর্‌তে বল্‌লে, "বিলেতে যা ইচ্ছে তা-ই হোক্ গে ! আমাদের এই ভালো।"

সুরথ একটা হাই তুলে বল্লে, "তা তোমার ইচ্ছে না হয়, ডক্টর্ সরকারের কাছে বেরিয়ো না। কিন্তু এমন লোক আমাদের দেশে খুবই বিরল। যেমন বিদ্বান, তেম্নি বিনয়ী! ওর মত লোকের কাছে আমাদের কত শেখ্বার, কত জান্বার আছে। চেহারাটা দেখ্লেই কেমন শ্রদ্ধা হয়! কী আশ্চর্য্য—তোমার এই সেকেলে কুণ্ঠা এখনো কাট্লো না, এখনো ঘেরাটোপ্ দে'য়া কলা বৌ হ'য়ে থাক্তে পার্লে বেঁচে যাও! নাঃ—এ-দেশের কোনো আশা নেই।"

কিন্তু এ-সব কথা বল্বার সঙ্গে-সঙ্গেই সুরথ বেশ একটু তৃপ্তির সঙ্গেই এ-কথা ভাব্ছিলো যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তো অনেক লোকেরই থাকে, কিন্তু অতসীর মত স্ত্রী দুর্ল্ভ—বাস্তবিকই দুর্ল্ভ।

অতসী আর কোনো কথা বল্লে না; শুধু মুখে এমন একটি অপরূপ হাসি টেনে এনে স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে' পড়্লো যে ঘাগী ইস্কুলমাষ্টারেরো মনের জীর্ণ দেয়াল ফেটে হঠাৎ ফুটে' উঠ্লো অজস্র পুষ্পমঞ্জরী; একটি ভঙ্গুর চুম্বনের বৃন্তে ভর্ করে' হৃদয়-বসন্তের প্রশান্ত আকাশের নীচে একবার তাদের বর্ণবিকশিত শতদল মেলে ধরে' প্রজাপতি-জন্ম সাঙ্গ কর্লে।

অতসী আলো নিবিয়ে দিয়ে স্বামীর পাশে এসে শুয়ে' পড়্লো। তার মন এতক্ষণে হাল্কা হয়েছে। মনকে সে এই ব'লে প্রবোধ দিলে যে প্রকারান্তরে সে স্বামাকে সব কথা বুঝ্তে দিয়েইতোছিলো—তথাপি তিনি যদি কোনো সন্দেহের কারণ খুঁজে' না পেয়ে থাকেন, সে কি তা'র দোষ? মন বেচারা প্রথমটায় আপত্তিসূচক ঘাড় নেড়েছিলো, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে তা'কে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের মতের সঙ্গে সায় দিইয়ে ছাড়্লে। মনের পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে মিষ্টি করে' বল্লে, "দ্যাখো বাপু, আর বেয়াড়াপনা কোরো না, আজ থেকে তোমার

সঙ্গে সন্ধি।” দু’মিনিটের মধ্যে সে তার নিয়তকলহপরায়ণ মনের সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে ফেল্‌লে—সে আশ্চর্য্য !

স্বামীর সঙ্গে এই আলাপ হ’বার পর অতসী যেন রাস্তার ঐ গ্যাস্‌পোস্‌ট্‌টার মতই স্পষ্ট করে’ তা’র পথ দেখ্‌তে পাচ্ছে ;—দড়িদড়া সব টল্‌মল্‌ করে’ উঠ্‌ছে, হাওয়ার বেগে পাল ফুলে’ উঠ্‌লো, নীল দিগন্তরেখা একখানি আকাশবিস্তৃত স্মিতহাস্যে যেন এই যাত্রাকে অভিনন্দন কর্‌ছে—নৌকো ছাড়্‌লো বলে’।...স্বামীকে অতসী যে সামান্য দু’একটি কথা বলেছে, তা’তে সে যেন নিজের কাছ থেকে মুক্তি পেলো ; শাদা কথায় বল্‌লে এর চেয়ে স্পষ্ট করে’ সে স্বামীকে জানাতে পার্‌তো না, কিন্তু তিনি নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্তচিত্তে তা’কে আশীর্ব্বাদ—হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদই করেছেন। যাক্‌—স্বামীর অনুমতি সে পেলো।

হঠাৎ মাণিক ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠ্‌লো ; অতসী তা’কে বুকের ওপর চেপে ধরে’ চুমোয়-চুমোয় ছেলেটার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে’ আন্‌লে। একটু পরেই মাণিক ঠাণ্ডা হ’য়ে গেলো। অতসী ভাব্‌লে—মাণিক কেন আরো খানিকক্ষণ কাঁদলে না ? ও যদি আজ মা-র সঙ্গে জেদ্‌ করে’ সারারাত ভরে’ খালি কাঁদে, অতসী তা’লে সারারাত ওর পাশে জেগে বসে’ থাকে, ওকে শান্ত কর্‌বার নানা অদ্ভুত ও কষ্টসাধ্য উপায় আবিষ্কার করে। মাণিকের কাছে কী যেন তা’র অপরাধ—তা’রি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্য তা’র চিত্তের স্নেহ-উৎসুকতার আজ সীমা নেই।

পরদিন।

রাস্তায় আস্‌তে-আস্‌তে শ্রীহর্ষ নিজকে বারবার জিজ্ঞেস্‌ করেছে, "কেন যাচ্ছি ?" ঘরে ঢুকতে-না-ঢুক্‌তেই জবাব পেয়ে গেলো।

একটা-কিছু বলে' কথা আরম্ভ করতে হয়, তাই শ্রীহর্ষ বললে, "পরিতোষ কোথায় ?"

"সে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেছে ;—কোন্‌ এক আপিসের বড়বাবুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে। আর তা'র দাদা ওপরে ঘুমুচ্ছেন—ডেকে দেবো ?"

শ্রীহর্ষ হাসলে। মৃদুস্বরে বলতে লাগ্‌লো, "বিছনায়-পড়া আর ঘুমিয়ে পড়া যা'দের কাছে এক হ'য়ে গেছে, তা'রাই সুখী। ঘণ্টাখানেক ছটফট্‌ করে' আমি এই উঠে এলুম। হঠাৎ মনে হ'ল, একবার তোমাকে দেখে আসি।"

"দেখ্‌লে তো! এইবার ফিরে' যাও।"

"তুমিও চলো না।"

"তা যাচ্ছি, কিন্তু তা'র আগে তোমাকে ভীষণ একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

"বলো।"

"আমাকে সন্ধ্যের আগে একটা চাকর কি অন্য কারু সঙ্গে এখানে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হ'বে। তুমি থাকবে অনুপস্থিত।"

"তা বেশ।"

"তা'লে যাও ;—ঐ গলিটাতে ঢুকে' একটা রিক্‌শ বা গাড়ি যা পাও ঠিক করে' আমার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকো।—যাও না, বসে' রইলে কেন ?"

শ্রীহর্ষ সোফার ওপর আরো একটু আরাম করে' বসে' নিলে।

"সে কী ? বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি ? সত্যি যে—আঃ, যাও না!

না—না, সে ঠিক হ'বে না। দু'জনে একসঙ্গে বেরুনোই ভালো। তা তুমি একটু বোসো, আমি এই আস্‌ছি।"

রুদ্ধশ্বাসে ওপরে ছুটে' গিয়ে অতসী সুরথের পায়ে ধাক্কা মেরে বলে' উঠ্‌লো, "ওগো—ওঠো—শুন্‌ছ ?"

সুরথ জড়িতস্বরে জবাব দিলে, "হুঁ।"

"শোনো—আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি। আমার এক সই আছে—এই কাছেই, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড্-এ—তা'র কাছে, বুঝ্‌লে ?

"হুঁ।"

আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অসামান্য ক্ষিপ্রতার সহিত চুলটা ঠিক করে' নিতে-নিতে অতসী বল্‌তে লাগ্‌লো, "আর দ্যাখো, আমার ফির্‌তে দেরি হ'লে মাণিককে একটু দেখো—বুঝ্‌লে ? যদি কান্নাকাটি করে তো খেলা দিয়ো—দেবে তো ?"

"আচ্ছা।" বলে' সুরথ পাশ ফিরে' আবার পরমসুখে ঘুমোতে লাগ্‌লো।

রিক্‌শতে ওঠ্‌বার সময় শ্রীহর্ষর পকেট্ থেকে কী একখানা কাগজ টুক্ করে' রাস্তায় পড়ে' গেলো। অতসী বলে' উঠ্‌লো, "ওটা কি পড়্‌লো, দ্যাখো তো ?"

শ্রীহর্ষ নত হ'য়ে সেটা তুল্‌লে; তারপর কুটি-কুটি করে' ছিঁড়ে' ফেলে দিয়ে অতসীর পাশে বসে' বল্‌লে, "ও কিছু নয়। একটা চিঠি।"

চিঠিখানা ইলার।

অভিনয়

অভিনয়

—কী বলো ? ভালোবাসা মানেই কি ভাণ নয় ?—অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা ! কিন্তু জানো তো, বহুকাল একই ভাণ কর্‌তে-কর্‌তে সেটা এম্‌নি কায়েমি হ'য়ে পড়ে যে সেটাকে বিশ্বাস না করে' নিজেদেরো উপায় থাকে না—বাইরের লোকের তো নয়ই। এর উদাহরণ আমরা পাই দাম্পত্য-জীবনে। আর যা'কে তোমরা প্রেমে-পড়া বলো—আচ্ছা, কোনো ছোট ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছ কখনো ? ধরো, তাকে নিয়ে খেলার মাঠে গেলে, সেখানে তোমার সমবয়সী আরো অনেকে জুটে' গেলো। তখন সে—সেই ছোট ছেলেটি—কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করে গম্ভীর হ'য়ে থাক্‌তে—তা'র বাল্যত্ব কোনো ফাঁকে আত্মপ্রকাশ না করে, সে জন্য তা'র উদ্বেগের অন্ত নেই। তেম্‌নি মানুষ যখন প্রেমে পড়ে, তখন সে ভাবে, 'আমি প্রেমে পড়েছি—সুতরাং আমার—এই করা বলা—এবং ভাবা উচিত, এবং এই উচিত নয়।' অর্থাৎ মানব-হৃদয়ের এই বিশেষ অবস্থা-সম্বন্ধে তা'র মনে পূর্ব্বার্জ্জিত যে-ধারণা থাকে, তা'র সঙ্গে নিজকে মিলিয়ে চলাই হয় তার লক্ষ্য। বল্‌ছি না, এ-চেষ্টা তা'র সম্পূর্ণ সচেতন—বরঞ্চ, অতি-আধুনিক ফ্রয়েডী ভাষায় তোমরা যাকে বলো সাব্‌-কন্সাস—তা-ই। কিন্তু তবু—বুঝ্‌লে না ?

বিজন ব্লটিঙ্‌-এর প্যাড্‌-এর ওপর একটা কলমের কালিহীন ডগা দিয়ে আঁচড় কাট্‌ছিলো ; চোখ তুলে' বল্‌লে, বুঝি, আর না-ই বুঝি, তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে আমার বেজায় অরুচি। সুতরাং ? কী বল্‌তে চাও তুমি ?

প্রতুল কথা বল্‌তে-বল্‌তে পিঠ খাড়া করে' বসেছিলো, এইবার ইজিচেয়ারের পেছনে গা এলিয়ে দিলে। ওপরের কথাগুলো সে বল্‌ছিলো সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে, কিন্তু হঠাৎ তা'র কণ্ঠস্বরে যেন সন্দিগ্ধতার দুর্ব্বলতা দেখা দিলে।

অভিনয়

—না—ধরো—এই ভাব্‌ছিলাম—হ্যাঁ, শোনো। এই ব্যাপারটা আগাগোড়া যেম্‌নি হাস্যাস্পদ, তেমনি করুণ। অবিশ্যি বয়েস যখন কম থাকে, তখন সবি মনে হয় ট্র্যাজিক কিন্তু এই নর-নারীঘটিত ব্যাপারে আর যা-ই থাক্—ট্র্যাজিডির মাল-মশ্‌লা এক ফোঁটাও নেই। এমন একজন লোকের কথা ধরা যাক্, যে এ-সত্যটি বুঝ্‌তে পেরেছে, কাজে-কাজেই 'বাছুরে প্রেমে'র বয়েস যা'র উৎরেছে। তা'র কাছে সবি প্রহসন—না জেনে সঙ্‌ সাজি, বা জেনেশুনে' নাটকে পার্ট করি, এ দু'য়ে তা'র কাছে কোনো প্রভেদ নেই। বরঞ্চ সজ্ঞানে অভিনয় করারই সে পক্ষপাতী, কারণ তা হ'লে চোরাবালিতে ডোব্‌বার আশঙ্কা নেই।

প্রতুলের মতামত আমার একটুকো মনে ধর্‌ছিলো না। ন্যাকামি বর্জ্জন কর্‌তে গিয়ে ও একেবারে উল্টো দিকের শেষ সীমানায় গিয়ে পৌচেছে—সেখানে আলো আছে কিন্তু তাপ নেই, তাতে প্রাণ বাঁচে না। ন্যাকামি হচ্ছে বিশেষ একটা বয়সের আনুসঙ্গিক ধর্ম্ম ;—কেউ-কেউ সে বয়েসটা কাটিয়ে উঠ্‌তে বিলক্ষণ দেরি করে—তখন সেটা বাস্তবিক অসহ্য হ'য়ে ওঠে। কিন্তু প্রতুলেরটা হচ্ছে একটা ব্যাধি—যে-ব্যাধির কোনো চিকিৎসা করা সম্ভব নয়, কেননা রোগী নিজে সেটা উপভোগ করে।

তাই আমি বল্‌লাম, তা হ'লে চোরাবালির অস্তিত্বটা তুমি বিশ্বাস করো ?

—তুমি বুঝি ভেবেছ চোরাবালি বল্‌তে আমি হৃদয়-টিদয় সম্পর্কিত কোনো অঘটন বোঝাতে চাচ্ছি! যে-লোক পদ্য লেখে, তা'র কাছ থেকে অবিশ্যি এই ধরণের নির্ব্বুদ্ধিতার বেশি কিছু আশা করা উচিত নয়। না হে—কেলেঙ্কারি, কেলেঙ্কারির কথা বল্‌ছি। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার কর্‌লাম যে এতদিন পুতুল-নাচের প্লে কর্‌ছিলাম। তখন নিজের ওপর কী রকম ঘেন্না ধরে' যায়, বলো তো।

বিজন জিজ্ঞেস্ করলে, তাই বুঝি তুমি জীবনটাকে একটা রঙ্গমঞ্চ করে' তুলতে চাচ্ছ?

—ছিঃ, বিজন! শেইক্স্পীয়্যর-এর তর্জ্জমা করে' নিজের বলে' চালাতে লজ্জা করেনা তোমার? তা—মন্দই বা কী? অথচ মুস্কিল কী জানো, অভিনয় করছি জানলে জিনিষটাকে তেমন আর উপভোগ করা যায় না। সেইজন্যই তো ক্লোরোফর্ম্ম্ দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে ঝিমিয়ে না ফেললে কেউ প্রেম করতে পারে না—

—বলা উচিত ছিলো যে, যে-ক্লোরোফর্ম্ম-এ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ঘুমিয়ে পড়ে, তা'র নাম প্রেম।

—ও একই কথা। হ্যাঁ, আত্ম-সচেতন হ'লে সেই হয় বিপদ। সুখ পাওয়া যায় না। আর, after all, এতে খানিকটা সুখ আছে, সে-কথা মানতেই হ'বে।

বিজন বিবাহিত। সে চোখ মিটমিট করে' প্রতুলের দিকে তাকিয়ে মুখভঙ্গীসহকারে বললে, আছে নাকি?

বিজন আশা করেছিলো, তা'র এই মন্তব্যের ফলে প্রতুলের কাছ থেকে দাম্পত্যজীবনের ব্রহ্মানন্দস্বাদ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে পাবে, কিন্তু প্রতুল তা'র কথাটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে' গেলো দেখে সে বোধ হয় একটু দুঃখিত হ'ল।

—ধরো, সেই লোকটি একটা experiment করে' দেখলে, এ-রকম সজ্ঞানে অভিনয় করার ফল কী রকম দাঁড়ায়! ভালো তা'র তেমন লাগবে না, এ জানা কথা—এক-এক সময় নিজেরি হাসি পাবে। মনে করো, একটি মেয়ে—তা'র সঙ্গে তা'র বিশেষ আলাপ-পরিচয় নেই, খুব যে ভালো লাগে, তা-ও নয়—তা'র কাছে সে প্রেম-নিবেদন করলে। বললে—পাঁচজনে যা বলে, সে-ও সে-সব বললে—চোস্ত ভাষায়। অথচ

আগাগোড়া মেয়েটির চোখের রঙ, ঠোঁটের আকৃতি, কণ্ঠস্বর—প্রত্যেকটি জিনিষ তা'র কাছে বিশ্রী ও কর্কশ মনে হচ্ছে!—'Sfunny!

প্রতুল থাম্‌লে—বোধ হয় দম নেবার জন্য। কিন্তু আমাদের দু'জনকেই চুপ করে' থাক্‌তে দেখে সে আবার বল্‌তে লাগ্‌লো, Funny বটে, কিন্তু দর্শকের কাছে। এ ক্ষেত্রে যে অভিনেতা, সেই আবার দর্শক কিনা—তাই জিনিষটা এক-এক সময় এত খেলো হ'য়ে পড়ে যে, তা নিয়ে হাস্‌তেও প্রবৃত্তি হয় না। কী বলো তোমরা?

বল্‌লাম, উত্তম পুরুষে কথা বল্‌লেই ভালো শোনায়, প্রতুল—তা ছাড়া, সেটা সহজ বেশি।

বিজন প্রচণ্ড উৎসাহে টেবিলের ওপর একটা চড় মেরে বলে' উঠ্‌লো, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—এবং স-detail বল্‌বে। খবরের কাগজের রিপোর্ট নয়—একটা বেশ গোলগাল, 'পুরুষ্টু' গপ্‌প বানিয়ে ফেলো তো বাবা! যদি জোড়াতাড়া দিতে হয়—তা-ই সই। Start!

প্রতুল একটু ন্যার্ভাস্‌ হ'য়ে পড়্‌লো কিনা, বোঝা গেলো না। একটা সিগ্রেট তো ধরালে, এবং ওব মাপাজোকা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে দেশ্‌লায়ের কাঠিটা চোখের সাম্‌নে রেখে শেষ পর্য্যন্ত পোড়ালে। যখন আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে, তখন ওর আত্মস্থতা ফিরে' এসেছে।

এইখেনে প্রতুলের ব্যক্তিগত চরিত্র-সম্বন্ধে একটু ভূমিকা করা দরকার। ওর সম্বন্ধে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঙালী-সন্তান হ'য়েও ও কখনো কবিতা লেখে নি—ষোলো বছর বয়েসেও নয়। (এবং এখন ও তেইশ পেরিয়েছে—সুতরাং ফাঁড়া কেটে গেছে, বল্‌তে পারেন) ওর চতুর্দ্দশ জন্মদিনে ওর এক মামা ওকে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' উপহার দেন্‌—তখন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ওর ভালো লাগে নি, এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হ'তে পারে। আজ পর্য্যন্ত ও-কবিতার

—যা ইস্কুলের ছেলেমেয়েদেরো মুখে-মুখে—একটি লাইন্‌ও ও বল্‌তে পারে না। ও তাই বলে' মাঁদার-গাছ নয়—ভেতরকার কাঠিন্যকে রক্ষা কর্‌বার জন্য ও চারদিকে ছুঁচ্‌লো কাঁটার বর্ম্ম রচনা করে নি। সাহিত্য ও পড়ে এবং বোঝে ; জীবনের ওপর লোভ ওর প্রচণ্ড। ওর কথাবার্ত্তা শুনে' ওকে cynic মনে হ'তে পারে, কিন্তু ও তা নয়। ও বিশ্বাস করে যে বাঁচাই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা—উপভোগ কর্‌বার ঢের জিনিষ এখেনে আছে, এবং তা'র কণামাত্র হারাতে ও নারাজ।

তবে বল্‌তে পারেন, মেয়েদের সম্বন্ধে ওর ধারণা—কী বল্‌বো? একটু 'পেগান্‌' কি? কথাটা ঠিক তাচ্ছিল্য নয় ; যে-টুকু তাচ্ছিল্য ও দেখায়, তা শুধু মেয়ে-মহলে প্রতিপত্তি অর্জ্জন কর্‌বার জন্য, সুতরাং আসলে তাচ্ছিল্যের ঠিক বিপরীত। ও অনেক ভেবে-চিন্তে—এবং ও বলে, অভিজ্ঞতার থেকেও—একটা থিওরি খাড়া করেছে এই : কোন্‌ মুহূর্ত্তে কী বল্‌তে বা কর্‌তে হয়, তা জান্‌লে যে কোনো মেয়েকে বশ মানানো যায়। এ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, তবে আমাকে যদি জিজ্ঞেস্‌ করেন—যাক্‌ গে। ওর গল্পটাই শোনা যাক্‌ বরং।

—হ্যাঁ, সত্যি। একবার, তোমরা যা'কে হৃদয় বলো, তা নিয়ে একটা experiment কর্‌তে গেছ্‌লাম। আমিই। নিজের কীর্ত্তি নিজমুখে কীর্ত্তন কর্‌তে আমার অবিশ্যি বিন্দু-বিসর্গ আপত্তি নেই, কিন্তু তবু অন্যের নামে চালাতে পার্‌লে আমার সুবিধে হ'ত। তোমরা নেহাৎ ধরে' ফেল্‌লে বলে'ই—! জানো তো, নিজের কোনো ইতিহাস বাইরের লোকের মত নিরপেক্ষভাবে দেখ্‌তে ও বিচার কর্‌তে পার্‌লে—

বিজন অসহিষ্ণুভাবে বলে' উঠ্‌লো, কথায়-কথায় ফিলসফি করিস্‌নি, গাধা—গপ্‌পটাকে এগোতে দে।

—যদিও বাস্তবিকপক্ষে আমরা অধিকাংশ লোকই গল্পের মধ্যে

ফিলসফি আবিষ্কার কর্‌তে না পার্‌লে ক্ষান্ত হই নে, তবু তোমার কথা শিরোধার্য্য করা গেলো। শোনো তা'লে। সময়—১৯২৬ সন, গরমের ছুটী; স্থান, বরিশাল। নায়ক, আমি: নায়িকা, বিনোদিনী, সংক্ষেপে বিনু।

আমার বাল্যকাল বরিশালে কেটেছে, তা তোমরা জানো। বিনু ছিলো আমাদের—এটা অত্যন্ত commonplace হ'তে চলেছে, কিন্তু আমার সাধ্য কি সত্যের ওপর কল্পনার পোঁচ চালাই!—বিনু ছিলো আমাদের পাশের বাড়ির মেয়ে। ছোট শহর—তাই পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে অন্তরঙ্গ হৃদ্যতা ছিলো। আমার বাল্যের অসংখ্য সঙ্গী ও সঙ্গিনীর মধ্যে বিনু একজন। না, প্রতাপ-শৈবলিনী নয়। বিনুর প্রতি আমি বিশেষ প্রসন্ন ছিলাম না, কারণ ও বেশি দৌড়তে পার্‌তো না, এবং লুডো খেলায় ওর চোরামি কর্‌বার ক্ষমতা ছিলো অসাধারণ। কোনো-দিন যদি আমি জিৎতে পার্‌তাম। বল্‌তে ভুলেছি, বিনু আমার চেয়ে বছর খানেকের বড়।

১৯২০ সনে ওর বিয়ে হয়—একচোটে খুল্‌না-চালান হ'ল। তবু বছরে এক-আধবার বরিশালে আসতো—দেখ্‌তাম। আমার সঙ্গে বড়-বড় বিষয় নিয়ে আলাপ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তো, আমি উৎসাহ দিতাম না।

তারপরেই তো কল্‌কাতায় চলে' আসি—পড়্‌তে। '২৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বিনু তা'র স্বামীর সঙ্গে কিছুদিন কল্‌কাতায় ছিলো। আমাকে পত্র লেখে দেখা কর্‌বার জন্য। গিয়েওছিলাম।

সেই উপলক্ষ্যে আমি প্রথম আবিষ্কার করি যে বিনুও নারী। অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যৌবনাবস্থার সবগুলো লক্ষণ তখন ওর মধ্যে দেখে-ছিলাম। ও তখন উনিশ পূর্ণ করেছে। অল্প বয়েসে ওর বিয়ে হয়:

সুতরাং বিয়েটা ওর পক্ষে—সাধারণত যেমন হ'য়ে থাকে, flirtation-এর শেষ নয়। আরম্ভ মাত্র। আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারি, নিদ্রিত স্বামীর পাশে শুয়ে' একদা প্রভাতের প্রথম মলিন আলোতে নিজের যৌবনশ্রী দেখে ও মুগ্ধ হয়েছিলো। সেদিন ও অভ্যেসমত স্বামীকে চুম্বন করে' জাগায় নি, আস্তে বিছ্‌না থেকে উঠে' আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে—

বিজনের হুঙ্কার সুসময়ে এসে পৌঁছুলো—এই, আবার।

—Sorry। আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম এই যে, বিনুর কুমারী জীবন পুরুষসম্পর্করহিত হওয়ায় কতগুলো প্রবৃত্তি তা'র চাপা পড়ে' ছিলো, এবং সেই কারণেই, যে-ই তা'র স্বামী তা'কে স্পর্শ করলে, অম্‌নি, শুন্‌তে পেলাম, তা'র মন পতঙ্গের মত গুঞ্জন করে' উঠেছে। চার বছর ধরে' যে স্ত্রী, তা'র মধ্যে তেরো বছরের ইস্কুলের মেয়ের লঘুতা আমার ভালো লাগে না। কি বল্‌লে, বিজন? না, ছেলেপিলে ওর হয় নি, এখন পর্যান্তও নয়। কী? ডাক্তার—চুলোয় যাক্‌ ডাক্তার।

মেয়েদের ফাজ্‌লেমিগুলো সাধারণত কী-রকম বাজে হয় লক্ষ্য করেছো তো? খালি বক্‌বক্‌ করে, এক কথা বার-বার বলে এবং সব কথা বলে। কোনো-কোনো কথা যে অনুচ্চারিত হ'লেই বেশি মর্ম্মভেদী হয়, সে-চৈতন্য ওদের নেই। বিয়ের পর মেয়েদের এ-দোষ অনেকটা কেটে যায়, আর বিনুর আমাদের এ-দোষ হ'ল বিয়ের পর থেকে। তা'র কারণ—।

বিজন বল্‌লে, আমরা বুঝেছি। কিন্তু কিসে যে তুমি তা'র পরিচয় পেলে, তা বুঝ্‌লাম না।

—কিসে পেলাম? এই ধরো একদিনের কথা। বিনু কথায়-কথায় বিয়ের কথা পাড়্‌লে। আমার বিয়ের। কবে করবো—এবং কা'কে, এই সব মামুলি আলাপ। তারপর অত্যন্ত স্থূলভাবে বলে'

ফেল্‌লে, 'তা তোমরা আজ-কালকার ছেলে—কী যে কাণ্ড করে' বসো, তা'র ঠিক নেই। হয়-তো লভ্-এই পড়্‌লে,' (কথাটাকে ও স্পষ্ট ল্‌অভ্ উচ্চারণ কর্‌তো) 'কে জানে, হয়-তো বা এরি মধ্যে পড়ে' গেছ!'

আমি গম্ভীরভাবে বল্‌লুম, 'পড়েইছি তো।'

বিনু শতবসনা হ'য়ে শুধোলে, 'কা'র সঙ্গে?'

আমি জবাব দিলুম, 'তোমার সঙ্গে।'

মুহূর্ত্তে ওর ফর্সা মুখ কপালের সিঁদুরের মত টক্‌টকে লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। আঁচলে মুখ ঢেকে অর্দ্ধস্ফুটকণ্ঠে 'ছি-ছি' বল্‌তে-বল্‌তে ও ঘর থেকে ছুটে' বেরিয়ে গেলো।

আমি মনে-মনে খুব খুসি হ'লাম। বোধ হয় বাকি জীবন ও আমার সঙ্গে সমীহ করে' কথা কইবে।

কিন্তু এক মিনিট্ যেতে-না-যেতেই ও আবার সে ঘরে এলো। এসে কী বল্‌লে, জানো? বল্‌লে—'সত্যি?'

আমি আর বিজন হো-হো করে' হেসে উঠ্‌লাম।

—তোমরা তো হেসে বাঁচ্‌লে, কিন্তু আমার যে সেদিন কত কষ্টে হাসি চাপ্‌তে হয়েছিলো, তা এখনো মনে পড়ে।

তবু স্বীকার করি, (প্রতুল বলে' চল্‌লো) ওর দেহশ্রী আমাকে সামান্য একটু আকর্ষণ করেছিলো—যেমন আকর্ষণ করে বিলিতি মাসিক-পত্রের কোনো চটক্‌দার বিজ্ঞাপন বা পথে যেতে-যেতে কোনো সাজানো-গুছোনো চায়ের দোকান। উপমা দু'টো বিনুর পক্ষে স্তুতিবাচক নয়, কিন্তু যথার্থ প্রযুজ্য। সন্ধ্যার প্রথম তারা দেখ্‌লে যা'র কথা মনে পড়ে, বিনু সে-ধরণের মেয়ে নয়;—কোনো গরম দুপুরবেলায় বিছনায় ছট্‌ফট্ করে' কিছুতেই যখন সময় কাটে না, তখনকার সঙ্গী ও;—মনে হয়,

ও থাকলে হয়-তো পায়ের কাছে বসে' পায়ের আঙুলের নখ কেটে দিতো, না-হয়—

বিজন শূয়োরের অনুকরণে এমন একটা বিশ্রী শব্দ করে' উঠ্‌লো যে প্রতুল জিভের ডগায় আগতপ্রায় কথাগুলোকে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌লে।

—যা-ই হোক্, সে-যাত্রা কোনোমতে বাঁচা গেলো। বিনু ফির্‌লো খুলনায়, আর আমিও ওর কথা ভাব্‌বার বিশেষ সময় পেতাম না, কারণ—

বিজন বল্‌লে, কারণ তখন তুমি রমার মারে ঘায়েল!

—কী করি, বলো? মারজিৎ তো আর হই নি! কিন্তু সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

বিজন জোগান্ দিলে, হ্যাঁ? ১৯২৬ সন—গ্রীষ্মকাল।

—১৯২৬ সন, গ্রীষ্মের ছুটি। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে অনেকদিন বাদে বরিশাল এসেছি। জান্‌তুম না যে বিনু এখানে আছে। কিন্তু আমি যাবার পরদিন সকালবেলায় ও হঠাৎ আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত।

আমাকে দেখে ওর খুসি আর ধরে না। বল্‌লে, 'তবু ভাগ্যিস্ তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল! মাসখানেক যাবৎ এখানে আছি—রোজই শুনি, তুমি শীগ্‌গিরই আসছ। ঠিক সময়ে এসেছ যা হোক্। কালই চলে' যাচ্ছি কিনা!'

বলা উচিত বোধ কর্‌লাম—'সত্যি?'

—'ওপর থেকে হুকুম এসেছে, তা অমান্য করে কা'র সাধ্যি! যেতেই হ'বে।'

—'ওপরওয়ালাটি কোথায়? খুল্‌নায়? তাই তো, গরজটা তা'লে একপক্ষের নয়!'

বিনু হেসে বল্‌লে, 'তা তো বুঝ্‌তেই পার্‌ছ!'

ও যে ন্যাকামি করে' আরক্তমুখে আমার কথার তীব্র প্রতিবাদ করে' উঠ্‌লো না, এ-জিনিষটি আমার ভালো লাগ্‌লো। আমাদের বিনুও তা'লে মানুষ হ'য়ে উঠেছে! এতদিনে ওর সঙ্গে মেলামেশা করা যায়!

বিনুর সেদিন আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিলো; খাওয়া-দাওয়ার পর ও আমার ঘরে এসে বস্‌লো। বিনু বড় বেশি কথা বলে বলে' প্রাক্‌বিবাহ যুগে পারিবারিক মহলে ওর ভারি একটা বদনাম ছিলো—সে-দোষ ছ' বছর হিন্দু-বধূত্বে শিক্ষানবিশী করে'ও ও কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি। ওর রসনায় ধার বা ঝাল ছিলো না, ছিলো অনিবার চটুলতা-ভোঁতা কথার অবিশ্রাম অজস্রতাতেই তা'র সুখ।

—'পরীক্ষা কেমন হ'ল? ভালো তো হ'বেই—কল্‌কাতায় গরম কেমন? তোমার চেহারা ভালো হয়েছে, কিন্তু চুলগুলোকে অমন বিশ্রী করে' ছেঁটেছ কেন? —বাঃ বেশ তো এই নাগ্‌রাই-জোড়া—কত দিয়ে কিনেছ? আড়াই টাকা? শস্তাও তো খুব!—আজকাল আবার পাণও খাও নাকি? আমি খাই নে—মানে দু'টো একটা খাই—জানো, ডাক্তাররা বলে, শুপুরি থেকেই নাকি ক্যান্‌সার্ রোগের জন্ম—মা গো! একবার খুল্‌না গেলেও তো পারো—বেড়াতে? কল্‌কাতা থেকে ক' ঘণ্টার পথই বা! ইচ্ছে থাক্‌লে যেতে কী? এইবার যা'বে? জায়গাটা অবিশ্যি খারাপ—ও কী?'

বিনুর অর্থহীন প্রলাপ শুন্‌তে-শুন্‌তে আমি অনেকগুলো হাইকে পিষে' মার্‌ছিলাম; মাঝে-মাছে ভদ্রতা করে' হুঁ-হাঁ করতে হচ্ছিলো। কিন্তু একসময় চোখে পড়্‌লো, বড় রাস্তা দিয়ে একটি মেয়ে—সঙ্গে ছোট একটি ছেলে—হেঁটে যাচ্ছে। ঘুমের খোলসটা গা থেকে খসে' গেলো, এবং অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে বার-কতক ওদিকে তাকালাম।

কিন্তু তা বিন্নুর চোখ এড়ালো না। তাই কথাটা মাঝ-পথে থামিয়ে ও বলে' উঠ্‌লো, 'ও কী ?'

আমি সম্পূর্ণ সজাগ হ'য়ে একবার নড়ে'-চড়ে' ঠিক হ'য়ে বস্‌লাম।

বিন্নু রসিকতা করলে, 'লোভ হচ্ছে ?'

আমি পাল্টা রসিকতা করে' বল্‌লাম 'হ্যাঁ। তোমাকে দেখে।'

সুখের বিষয়, বিন্নু সেদিনের মত ছুটে' বেরিয়ে গেলো না ; শুধু একটু আত্ম-প্রসাদের হাসি হাস্‌লে। মেয়েদের মজ্জাগত যে-ভ্যানিটি, বুঝ্‌লাম, আমার এ-কথা বিন্নুর সেখানে একটু সুড়্‌সুড়ি দিয়েছে।

এতক্ষণে আমার বিন্নুকে ভালো করে' দেখ্‌বার সুযোগ হ'ল। নারী-সৌন্দর্যের বর্ণনায় আমি পটু নই, সুতরাং শুধু এইটুকু বলে' আমি ক্ষান্ত হ'ব যে ওর চেহারা আমার ভালো লাগে নি। বড় বেশি স্পষ্ট, বড় বেশি সহজ—কোথাও একটু আব্‌ছায়া বা রহস্য নেই। ওর চোখের দৃষ্টিতে কোনো দুর্বোধ্য ইঙ্গিত নেই, ওর চোখ দুটি যেন বহুবার পড়া বইয়ের দু'টি পাতা—একবার তাকালেই মুখস্থ হ'য়ে যায়।

বিন্নু মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে, 'লোভের অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়।'

ঠিক এই মুহূর্তে আমার ঘাড়ে এসে ভূত চাপ্‌লো। ভাব্‌লাম—কেন নয় ? উপস্থিত মুহূর্তে এর চেয়ে সুখপ্রদ কোনো কাজ আমার হাতে নেই। পড়ে'-পড়ে' ঘামানো এবং ঘুমোনোর চাইতে এ-ই কি ভালো নয় ? নোটের ওপর ? কী আসে যায় ? বাড়িতে আর কোনো প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। নির্জ্জন, নীরব দুপুরে ভ্যাপ্‌সা গরম ছুটেছে, কোনো কাজে মন বসা অসম্ভব। এ ঘরে আমি—আমি, আর একটি মেয়ে। ও আমাকে একটুকো আকর্ষণ করছে না, কিন্তু যদি—! তা'লে কি ভালো লাগ্‌বে না ? আর কারই বা কী ক্ষতি হ'বে ? কেউ জান্‌বে না, বিন্নু কাল চলে যা'বে। আর আমি তো আমিই। তা'র ওপর,

পরবর্ত্তীকালে এ-কথা ভেবে হয়-তো একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারবো যে জীবনের রাশীকৃত সময়ের মধ্যে একটি মুহূর্ত্ত আমার নীরস হ'য়ে উঠ্ছিলো, আমি তা হ'তে দিই নি ; একটি সুযোগ আমি হারাই নি,—বরং, একটি-সুযোগ আমি তৈরি করে' নিয়েছি। কেন অতশত ভাব্ছো, প্রতুল ? ভাব্তে তো সবাই পারে। সাহস, একটু সাহস চাই প্রতুল !

দু'মিনিটের মধ্যে আমি মন ঠিক করে' ফেল্লাম।

আমি খাটের ওপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে বস্লাম। উল্টোদিকের দেয়ালে একটা আয়না। ভালোই হ'ল—ভাব্লাম—মুখভঙ্গী ঠিক হচ্ছে কিনা, আয়নায় দেখে নে'য়া যাবে। তারপর আস্তে-আস্তে বল্লাম, 'সত্যি লোভ হচ্ছে, বিনু।'

বিনু বল্লে, 'লোভ হ'লেই তো আর লাভ হয় না।'

'তা হয় না, কিন্তু তুমি কি চাও যে আমার মনে একটা ক্ষো'ভ থেকে যাক্ ?'

'মানে ?' বিনু ভুরু কুঁচ্কে শুধোলে।

আমি আমার দীর্ঘ গবেষণামূলক বক্তৃতা আরম্ভ করলাম, 'দ্যাখো বিনু, আমাদের দু'জনের জীবনই এত প্রকাণ্ড যে এই একটি দিন তা'র কাছে দীঘিতে জলের ফোঁটাও নয়।'

বিনু বিব্রতমুখে বল্লে, 'কি বক্ছ তুমি আবোল-তা'বোল্ ?'

আমি হাসির সামান্যতম আভাস ঠোঁটের ওপর এনেই ছেড়ে দিলাম— 'বুঝতে পারো নি ? সত্যি ?'

বিনু হঠাৎ যেন আমার বক্তব্যবিষয় আবিষ্কার করেছে, এইভাবে চেঁচিয়ে উঠ্লো, 'যাঃ !'

বল্তে লাগ্লাম, 'যাঃ নয়, সত্যি। ভেবে দ্যাখো এতে কারুর কোনো ক্ষতি হ'বে না—কে-ই বা জানবে ? তোমার কোনো লোক্সান

নেই, আমার লাভ আছে। এমন যদি হয় যে তুমি নিজের কোনো অসুবিধে না করে' অন্যকে একটু আনন্দ দিতে পারো তো তা থেকে তা'কে বঞ্চিত করবার অধিকার তোমার নেই।'

বিনু অত্যন্ত উত্তেজিতকণ্ঠে বলে' উঠ্‌লো, 'তুমি কি পাগল হ'লে প্রতুল? না তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পে'য়েছে একেবারে?'

আমি গলাটাকে যথাসম্ভব ভাঙা করে' বল্‌লাম, 'এ-কথা তো আমি আজ প্রথম ভাবি নি। কী কর্‌বো?

বিনু চম্‌কে উঠ্‌লো। আমি চট্ করে' একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম, চেহারাটা মানানসই হচ্ছে কিনা। তারপর তাড়াতাড়ি করে' বল্‌লাম, 'না, বিনু। আজ প্রথম নয়। কা'র চোখে আমি প্রথম পৃথিবীকে দেখ্‌তে শিখ্‌লাম?—তোমারই তো!

বিজন চীৎকার করে' হেসে উঠ্‌লো, ওরে শালা, এত কবিত্ব কর্‌তেও তুই জানিস্ নাকি?

প্রতুল গম্ভীরভাবে বল্‌লে, বিনুর কাছে ঐটুকু করা দরকার ছিলো। বুঝলে না—যা'র কাছে যেমন! শুধু নিজের মতই হ'বে—যেমনটি হওয়া দরকার, তা হ'বে না, এই ধরণের একগুঁয়েমি এ-সব জায়গায় অচল।'

—সাবাস্! তারপর?

—দূরে বসে'ও আমি বিনুর নিঃশ্বাস লক্ষ্য করতে পার্‌লাম।—কোনো পুরুষ ওকে ভালোবাসে, বহুকাল নীরবে ভালোবেসে এসেছে, এ-খবর শুন্‌লে কোন্ মেয়ে না চঞ্চল হ'য়ে ওঠে? যাক্—ওষুধে ধরেছে।

বিনু রুদ্ধস্বরে শুধোলে, 'কদ্দিন ধরে'?'

আমি আন্দাজে বলে' ফেল্‌লাম, 'ছ' বছর।'

বিনু মনে-মনে হিসেব করে' বল্‌লে, 'হুঁ, আমার বিয়ে হওয়ার পর থেকে। তা'লে তুমি আমাকে'—

অভিনয়

'বিয়ে করি নি কেন?' আমার মনে হ'ল, বিনু নিজের প্রতি বড় বেশি প্রাধান্য আরোপ কর্‌ছে। একটা অলস মুহূর্ত্তে আমি মনের কথা বলে' ফেল্‌লাম, 'বিয়ে অবিশ্যি আমি তোমাকে কর্‌তাম না।' কথাটা বলে'ই বুঝ্‌লাম, কী ভয়ানক বোকামি করে' ফেলেছি।

বিনু আমার মুখের কথা কেড়ে-নিয়ে বলে' উঠ্‌লো, 'তবে? হুঁ—যত-সব ইয়ে!'

আমি আমার সাধ্যমত লজ্জা প্রকাশ করে' বল্‌লাম, 'আমায় ভুল বুঝো না, বিনু! আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম যে আমি তো চেষ্টা করলেও তোমাকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌তাম না!'

বিনু কথাটা একটু ভেবে দেখে বল্‌লে, 'হ্যাঁ, তা তো ঠিক।'

—'তাই তো মনে-মনে তোমার মূর্ত্তি-রচনা করা ভিন্ন আমার আর উপায় ছিলো না। কী আসে যায়, বিনু! এই একটা দিন—একটা মুহূর্ত্ত—তারপর আর তোমায়-আমায় দেখাও হ'বে না। তোমার জীবন যেমন চল্‌ছিলো, চল্‌বে—লাভের মধ্যে, আমার সকল শূন্যতা নিমেষে সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে।'

এ-কথা বল্‌তে-বল্‌তে আমার চোখ দিয়ে দু'এক ফোঁটা জল গড়ালে ব্যাপারটা বেশ জম্‌কালো হ'য়ে উঠ্‌তো, কিন্তু জলের অভাবে শুক্‌নো চোখ দু'টোকেই রুমাল দিয়ে খুব খানিকটা রগ্‌ড়ালাম।

কোনো দিক থেকে কারুর শোন্‌বার কোনো আশঙ্কা ছিলো না; তবু খুব নিম্নকণ্ঠে বিনু বল্‌লে 'আমার স্বামী জান্‌তে পার্‌লে তোমাকে গুলি করে' মেরে ফেল্‌বেন।'

নাঃ—এটা বিনুর বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এমন কোনো গুরুতর কথা আমি বলি নি, যা নিয়ে একটা খুন্‌-খারাবি হ'য়ে যেতে পারে। ভাব্‌লাম, এর উত্তরে কী বলা যায়? বল্‌বো কি, 'তোমার জন্যে মর্‌তে

পারাই আমার সৌভাগ্য ?' উহুঁ—কথাটা এমন অন্তঃসারশূন্য যে সে ফাঁকা আওয়াজ বিনুও ধরে' ফেল্‌বে। তাই বল্‌লাম, 'কী করে' আর জান্‌বেন, বলো ? তুমি যদি না বলে' দাও ?'

তারপর খানিকক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ কাট্‌লো। তারপর আর দেরি করা অনুচিত মনে করে' আমি বল্‌লাম,—

বিজন হাত তুলে' বাধা দিয়ে বল্‌লে, থাক্‌, কী বল্‌লে তা আর না-ই বল্‌লে আমাদের। সব বল্‌তে নেই, গপ্‌প তা'লে আর্টিস্‌টিক্‌ হয় না। মোটের ওপর সে দুপুরটা তোমার ভালোই কাট্‌লো, বলো ?

হ্যাঁ। কিন্তু তারপরে যা আরম্ভ হ'ল সে বিশ্রী—অতি বিশ্রী !

—অনুতাপ ?

প্রতুল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে' উঠ্‌লো, হাতীতাপ ! বিনু সত্যি-সত্যি আমার সঙ্গে প্রেমে পড়ে' গেলো।

বিজন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, অ্যাঁ !

—অ্যাঁ বলে' অ্যাঁ ! একেবারে ভ্যাঁ ! কান্না পাবার জোগাড় আর কি !

—কেন ? একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়্‌লো—

—প্রেমের নিকুচি ! আর কপালও আমার এম্‌নি মন্দ যে পরদিন বিনুর স্বামীর তার এলো—তিনি নিজেই আস্‌ছেন বিনুকে নিতে—দিন-দশেকের ছুটীতে। কোথায় বাপু টায়ে-টুয়ে সরে' পড়্‌বি—ভালোয়-ভালোয়, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে পাশ ফিরে' ঘুমোবো !—না, তা তো নয়, মেয়াদ বাড়্‌লো আরো দিন-দশের জন্য, আর বিনু ছিনে জোঁকের মত লেগে রইলো আমার পিছে।

—ব্‌-এশ ! তারপর ?

—আর তারপর ! একেই তো বিনুর সুধাপাত্র এক চুমুকের বেশি

সয় না, তা'র ওপর লুকোচুরিতে আমার বিষম ঘেন্না। That স্বামী-chap, হাবাগোবা গোছের ভালোমানুষ, ধুলো দেবার মত চোখও ছিলো না ভদ্রলোকের—বিনুর তাই বড্ড বাড় বাড়্‌লো। Under his very nose যে-সব কাণ্ড কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লো তা দেখে ও তা'র অংশীদার হ'তে বাধ্য হ'য়ে আমার এমন কষ্ট হ'তে লাগ্‌লো যে অত্যন্ত টাইট্ জুতো পরে'ও কখনো তেমন হয় নি। মেয়েরা কেন এত বেশি দুঃখ পায়, জানো? ওদের একটুকো sense of humour নেই বলে। শ্রীমতী বিনোদিনী আমার মুখের কথাগুলোকে একেবারে অকাট্য ও চিরন্তন সত্য বলে' গ্রহণ কর্‌লে। Stupid I call it.

লোকে যাকে মনুষ্যত্ব বলে, তার অভাব যদি আমার মধ্যে সম্পূর্ণ হ'ত, তা'লে আমি মুখের ওপর বিনুকে বলে' দিতে পার্‌তাম, 'তোমাতে আমার অরুচি ধরে' গেছে, এইবার সরে' পড়ো'। কিন্তু যতই ধোপ দে'য়াও, বাঙ্গালীত্বের পাকা রঙ্ কি আর মোছে? সেই একটু দুর্ব্বলতার জন্য আমার জীবন একেবারে দুর্বিষহ হ'য়ে উঠ্‌লো। মুখে স্পষ্ট করে' বল্‌তে পার্‌লে বড় জোর কিঞ্চিৎ অশ্রুবিসর্জ্জনাদির ভয়াবহ দৃশ্য দেখ্‌তে হ'ত, কিন্তু তার পরেই সব ল্যাঠা যেতো চুকে'। As it is, প্রতি-মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে লাগ্‌লাম। সেই প্রাণান্তকর দশটা দিন যেন আর কাটে না! সেই দশদিনে আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি কর্‌লুম যে কচ্ছপের চেয়েও নাছোড়বান্দা, সাপের চেয়েও ধূর্ত্ত, বাঘের চেয়েও হিংস্র হয় মেয়েমানুষ, একবার যখন সে লিয়াজঁর স্বাদ পায়।

দু'দিন যেতেই বিনুকে দেখামাত্র আমার গা বমি-বমি করতে লাগ্‌লো। সুখের চেয়ে শান্তি ভালো, এই মনে করে' আমি সারাদিন বাইরে-বাইরে কাটাবার সঙ্কল্প কর্‌লাম। রোদে ঘুরে-ঘুরে আমার রঙ

কালো হ'য়ে গেলো, তাস খেলে-খেলে ইডিয়ট্ বনে' গেলাম, ঘুমোতে-ঘুমোতে মোটা হ'য়ে উঠ্লাম, তবু সে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে অব্যাহতি নেই। পঞ্চম দিনে স্নান করতে পুকুরে চলেছি—ঘাটের ওপর বিনু! আমার জন্যই ওৎ পেতে বোধ হয়।—'কোথায় থাকো আজকাল সারাদিন?' 'বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে' বেড়াচ্ছি। ওরা শুনেছে আমি এসেছি—দেখা না করলে কী অন্যায় বলো তো? ওরা ভাব্বেই বা কী?' 'আহা—। সারাদিনই বন্ধু—' বিনু একটা মুখ-ভঙ্গী কর্লে। 'আজ থাক্বে বাড়িতে? দুপুরবেলা?' 'বল্তে পারি নে। ওরা বলেছিলো তাসের আড্ডায় যেতে—দেখি, যদি—' বিনুর বিরক্ত মুখ হঠাৎ কোমল হ'য়ে উঠ্লো। 'তোমার পায়ে পড়ি—প্' (আমার নামটা ও মুখে আন্তে পার্লে না—এতদূর!) 'আজ তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ো না।' বিনু চারদিকে একবার তাকিয়ে সত্যি-সত্যি আমার পা জড়িয়ে—উঃ, hideous।

কিন্তু আমি একেবারে মরীয়া হ'য়ে উঠ্লাম, যখন বিনু দুপুর-রাতে এসে আমার জান্লায় টোকা দিলে। সারাদিনের পরে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছি—দৈবগুণে হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে, এমন সময় এ-হেন উৎপাত স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব বা যীশুখৃষ্টও ক্ষমা কর্তেন কিনা সন্দেহ। একবার ভাব্লাম কাঁচকলা শুয়ে'ই থাকি—দরজা ভেঙে তো আর ঢুক্তে পারবে না। কিন্তু পরক্ষণে মনে হ'লো বিনু একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে বুঝি,—যে-মেয়ে আরেক বাড়ি থেকে গভীর রাত্তিরে স্বামীর বিছ্না থেকে উঠে আস্তে পারে, তা'র পক্ষে অসম্ভব কিছু আছে নাকি? আর, আমারো তো—হেসো না, বিজন।—আমারো তো reputation বলে' একটা জিনিষ আছে। বিনুকে কেউ যদি আমার জানলার নীচে দাঁড়িয়ে থাক্তে দেখে ফেলে, তা'লে—

সুতরাং উঠ্‌তে হ'ল।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বিনু শুধু বল্‌লে, 'উনি, আজ সিদ্ধি খেয়েছেন—কানের কাছে একশোটা সমুদ্র গর্জ্জালেও ঘুম ভাঙ্‌বে না।'

বিনু থাক্‌তে-থাক্‌তেই আমি একটা প্ল্যান ঠাউ্‌রে ফেল্‌লাম। এ আর সহ্য করা যায় না। তাই বিনুকে অতি সন্তর্পণে খিড়্‌কির দোর অবধি এগিয়ে দিয়ে আমি বল্‌লাম, 'কাল সন্ধ্যের পর এসো। বেড়াতে যাবো।'

পরদিন বিকেলের দিকে আমি বিনুর স্বামীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলাম। ভদ্রলোক পেঁপে আর মিছ্‌রির সর্‌বৎ সহযোগে বৈকালিক জলযোগ সার্‌ছিলেন; আমাকে দেখে শশব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্‌লেন, 'আসুন্, আসুন্। কী মনে করে'? সর্‌বৎ খাবেন?'

সর্‌বৎ আমি খেলাম না, কিন্তু তাঁর শেষ হ'লে পর বল্‌লাম, 'চলুন না নদীর ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।'

'হ্যাঁ, চলুন্। বরিশালের নদীর ধারটি বেশ। একটু দাঁড়ান্— অপেক্ষা করুন, চাদরটা নিয়ে আস্‌ছি। ওরে—মাইজীকে জিজ্ঞেস কর্‌তো আজ উল্ আন্‌তে হ'বে কিনা।

যে-চাকরের উদ্দেশ্যে শেষের কথাটা বলা হ'ল, সে খবর দিলে মাইজী বাড়ি নেই।

যাক্, বাঁচা গেলো।—

পথে যেতে-যেতে ধানাই-পানাই না করে' আমি বল্‌লাম, আপনাকে একটা কথা বল্‌তে চাই বিনুর—আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে। ছেলেবেলা থেকে জানাশোনা, ওঁর ডাক নাম নিয়ে বল্‌লে আপত্তি কর্‌বেন না নিশ্চয়ই?'

ভদ্রলোক ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে' হেসে বল্‌লেন 'না কক্ষনো নয়। কী আশ্চর্য্য!'

—'সে যাক্। বিনুকে নিয়ে কালই আপনি খুল্নায় চলে' যান্।'

উনি আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে একটু কেমন-কেমন স্বরে বল্লেন, 'কেন বলুন্ তো ?'

আমি খুব সহজভাবে বল্তে লাগ্লাম, 'বিশেষ-কিছু নয়। আপনার আতঙ্কিত হ'বার কারণ নেই কোনো। কিন্তু জানেন তো, পৃথিবীর কোনো-কিছু সম্বন্ধেই সঠিক কিছু বলা যায় না ;—বিনুর যদি একটু মতিভ্রম ঘটে'ও থাকে, তবু আপনার পক্ষে ওটাকে বড় ক'রে দেখ্বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। ও কিছু নয়—একটা passing fancy মাত্র ; এখান থেকে চলে' গেলেই সেরে যা'বে।'

উনি হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রায় bathetic কণ্ঠে বলে' উঠ্লেন, 'কী বল্ছেন আপনি ? আমি যে কিছুই বুঝ্তে পার্ছি নে।'

যেন তিনি কোনো কথাই বলেন নি, এইভাবে আমি বলে' চল্লাম, 'কিন্তু এটা ঠিক জানবেন, দোষ কারুরই নয়। আমার সাধ্যমত আমি ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি, এবং ওর মন বদ্লাবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। এবং ও যে মনে-মনে আপনাকে—এক-মাত্র আপনাকে—ভয়ানক ভালোবাসে, তা-ও আমি টের পেয়েছি। সত্যি, you've got a very good wife কিন্তু তবু, কাল্কেই ওকে নিয়ে চলে' যান্, খুল্না গেলেই ওর মন আবার সুস্থ হ'য়ে উঠ্বে।'

আমার কথা শুনতে-শুনতে ভদ্রলোকের নীচের ঠোঁট্ এতদুর ঝুলে' পড়্লো যে আর একটু হ'লেই থুত্নিটা এসে গলায় ঠেকেছিলো।

তারপর ওঁর সঙ্গে যে-সব কথা হ'ল, তা তোমাদেরকে শোনা'বার দরকার নেই। বাড়ি ফির্তে-ফির্তে ভদ্রলোক আমার হাত ধরে' বিগলিতকণ্ঠে বল্তে লাগ্লেন, 'আপনার মত মহৎ লোক পৃথিবীতে বিরল! আমি—'

বাধা দিয়ে বল্‌লাম, 'ও-সব কেন বল্‌ছেন মিছিমিছি? কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখ্‌তে হ'বে। আমি যে আপনাকে এ-সব কথা বলেছি—আপনি যে কিছু টের পেয়েছেন, তা যেন বিনু কোনো-মতেই না জান্‌তে পারে। বুঝ্‌লেন?—কোনোমতেই নয়। বিনু ভারি sensitive, মনের দুঃখে চাই কি—'

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন, 'সে আর বল্‌তে! এটুকু বুদ্ধিও কি আমার নেই। আমি আপনার কাছে শপথ কর্‌ছি, প্রতুল বাবু, ইহজীবনে আমি বিনুর সমক্ষে এ-বিষয়ে কোনো কথা উচ্চারণ কর্‌বো না।'

শপথের ভাষাটা আর-একটু হাল্‌কা হ'লেও আমার আপত্তি ছিলো না, কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো।

বল্‌লাম, 'Thank you. হ্যাঁ, আর-এক কথা। আপনি kindly আমার ওখানে একটু যা'বেন কি? এখন। বিনুও থাক্‌বে বোধ হয়,—ওখানে বসে'ই যাওয়া-সম্বন্ধে আলাপ কর্‌তে পার্‌বেন। আমাকে উপলক্ষ্য করে' আপনাদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য না হয়, এটুকু স্বচক্ষে দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমি দাবী করি।'

অত্যন্ত আনন্দে মানুষ বোকা হ'য়ে যায়। ভদ্রলোক সেই বোকামির হাসি হাস্‌লেন।

'সঙ্গেই চলুন না!' বাড়ির কাছে এসে বল্‌লাম।

'না, আপনি যান্‌। আমি জুতো-জামা বদ্‌লে এক্ষুনি আস্‌ছি।'

আমি জান্‌তুম, বিনু আমার ঘরে বসে' অপেক্ষা কর্‌ছে। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে' আমি রুদ্ধস্বরে বলে' উঠ্‌লাম, 'বিনু, সর্ব্বনাশ হয়েছে!'

বিনুর গলা চিরে' বেরিয়ে এলো, 'কী?'

'সর্ব্বনাশ! তোমার স্বামী টের পেয়েছেন। না, চেঁচিয়ো না।'

বিনু উঠে' দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে মুখ চেপে অন্য হাত ওপরের দিকে তুলে' বলে' উঠ্‌লো, 'কী করে জান্‌লে ?'

'অত কথা বলার সময় নেই। মোট কথা, তিনি সন্দেহ কর্‌ছেন; এমন কি, এক্ষুনি—এই মুহূর্ত্তে এ-ঘরে এসে উপস্থিত হ'তে পারেন।'

বিনু কিছু না বুঝে' নিজের অজান্তেই দরজার দিকে ছুটছিলো; আমি তা'র হাতে ধরে' জোর করে' তা'কে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বল্‌লাম, 'পাগ্‌লামি কোরো না। আমার কথা শোনো। ওখানে চুপ করে' বসে' থাকো।'

তারপর তা'র মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লাম, 'আমাদের পালা ফুরুলো, বিনু। উনি হয়-তো কালই তোমাকে নিয়ে যেতে চাইবেন। লক্ষ্মী মেয়ে, আপত্তি কোরো না। তা'লে সন্দেহ আরো জোরালো হ'বে।'

এ-কথা বল্‌তে বল্‌তেই বিনুর স্বামী এসে ঘরে ঢুক্‌লেন।

প্রতুল একটা সিগ্রেট্‌ ধরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লো।

কথাসাহিত্য-পিপাসু বিজন জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লে, ও কী? গপ্‌প ফুরুলো ?

—কাজে কাজেই। পরদিন স্বামী-স্ত্রী বরিশাল ছেড়ে পালালো। আঃ, সে আরাম আমি এখনো মনে কর্‌তে পারি। যেন একটা ফোঁড়া ফেটে গেলো! বাপ্‌স্‌!

—তারপর বিনুর খোঁজ-খবর আর কিছু পেয়েছ ?

—না—হ্যাঁ, খুল্‌না গিয়েই আমাকে এক চিঠি লিখেছিলো বটে—অনেক কাব্যি করে' লিখেছিলো, 'আমার এ-জীবন মিথ্যা, স্বপ্নের মত অলীক। বিনোদিনী এখানে ছায়া হ'য়ে, ভূত হ'য়ে ঘুরে' বেড়ায়—মনোমন্দিরে তোমার পূজার যে-নিত্য আয়োজন, বিনোদিনী সেখানে

সত্যিকারের প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠে। হে দেবতা, তুমি আমার প্রণাম লও!'

বিজন বলে' উঠ্‌লো, কিন্তু এটা কি কমেডি হ'ল নাকি হে? না ট্র্যাজিডি?

—কমেডি নিশ্চয়ই। কারণ দুবে বসে' ও আমার যতই পূজো করুক্, তা'তে আমার কোনো ক্ষতি নেই, ঘাড় থেকে যে ভূত নামাতে পেরেছি, এই আমার সৌভাগ্য।

অভিনয় নয়

অভিনয় নয়

—কথাটা অস্কার ওয়াইল্ড্ বলেছেন বলে'ই তোমরা মেনে নিতে চাও না, কেননা, অতি-স্মার্ট্ ওয়াইল্ড্‌কে অবিশ্বাস করাই হচ্ছে আধুনিক স্মার্ট্‌নেস্-এর রীতি। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে আর্ট যে জীবনের চেয়ে অনেক বড, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কোনো সত্যিকার বুদ্ধিমান লোকের থাকা উচিত নয়।

আমি বল্‌লাম, নিজকে সত্যিকার বুদ্ধিমান কল্পনা করে' হর্ষোৎফুল্ল হ'তে পারো, কিন্তু তুমি ছাডাও পৃথিবীতে মানুষ আছে, এবং তা'রা সবাই তোমাব সঙ্গে একমত না-ও হ'তে পাবে। কায়াকে ছেড়ে কিনা ছায়াকে—!

প্রতুল তা'র স্বভাবসুলভ বাঁকা হাসি হেসে বল্‌লে, ভায়া সে-কথাই যদি বলো, তবে গোটা সৃষ্টিটাকেই তো মায়া বলে' উডিয়ে দে'য়া যায়—ঈশ্বরেব সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড থেকে সুরু করে' মানুষেব সৃষ্টি আর্ট পর্য্যন্ত।

বিজন অসহিষ্ণু হ'য়ে বল্‌লে, আহা—সে-কথা হচ্ছে না।

এইবার প্রতুল ইজি-চেয়ারেব গায়ে হেলান দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে আমবা দু'জন এক দীর্ঘ বক্তৃতাব জন্য তৈবী হ'লাম। বাক্‌চালনায় প্রতুলের পটুতা ওয়াইল্‌ডেব নায়কদেবই মত।

—আর্ট যে জীবনেব চেয়ে অনেক বড, এ-কথা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে ওয়াইল্ড্-সাহেব যে-সব যুক্তিতর্কেব প্রয়োগ কবেছেন, সে-গুলো তোমবা জানো। তাই বাহুল্যভয়ে সেগুলোব পুনবাবৃত্তি কর্‌লাম না। আমি শুধু কতগুলো উদাহবণ দিয়েই ক্ষান্ত হ'ব। 'হ্বার্থার' বুকে করে' যে-সব জার্ম্মান ছোক্‌বা আত্মহত্যে কবেছে, তা'দের ভূত আমার সাক্ষী। উনবিংশ শতাব্দীতে বায়বনিজ্‌ম্ একটা ব্যাধির মতই ইয়োবোপের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে—এবং সে-জন্য ডন্ জুয়ান্ স্বয়ং ততটা দায়ী নন্, যতটা 'ডন্ জুয়ান্'-কাব্য। বায়বন্‌কে চর্ম্মচক্ষে ক'টা লোকই বা দেখ্‌তে

পেয়েছে! কিন্তু তাঁর মহাকাব্যে তিনি জীবনের যে-সহজ, অথচ কৃত্রিম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন, তা সাপের বিষের মত ইয়োরোপের সমাজ-দেহের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের জীবনটা কাদা, তা'কে মূর্ত্তি দেন্— ঈশ্বর নন্—কবিরা, শিল্পীরা। অনেকের জীবনের কাদাত্ব কখনো ঘোচে না, কবির পর কবি এসে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রভাব দূর করে' নিজের ছাপ মেরে দেন—কোনো কোনো লোকের আবার একবার যে মার্কা পড়ে, সারা-জীবন তা-ই রয়ে' যায়। আমাদের দেশে আজকাল ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়্ছে। আমাদের ঠাকুর্দা-ঠাকু'মারা প্রেমে পড়্তেন না, বিয়ে করতেন —এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবনে—আজকাল আমরা প্রেম বল্‌তে যা বুঝি, তা ছিলো না। অথচ তাঁদের সঙ্গে আমাদের পৌষাকিক এক-আধটু পার্থক্য ছাড়া কী-ই বা এমন তফাৎ? এর কারণ কী? রাগ কোরো না কবি, কিন্তু ফরাসী-রুশ-নরোয়েজীয় উপন্যাসগুলোর ইংরেজি তর্জ্জমা বাঙ্‌লা দেশে যদি না ছড়াতো, তবে একা রবিঠাকুরের সাধ্যি ছিলো না, দেশের তরুণ-তরুণীদের এমন universal প্রেমের মন্ত্রে মন্ত্রণা দেন্। সেইজন্যই তো আজ 'তরুণী বসি' ভাবিয়া মরে' এবং তরুণ কাঁপে পাণ্ডু-জ্বরে (পাদপূরণ আমার)। আসলে আমরা সকলেই 'মাপে'র অধিবাসী: মোরোয়া-বর্ণিত বল্‌জাক্-ভক্তের মত জীবনের সব—বিশেষত প্রেমের— ব্যাপারে সাহিত্যশিল্পীর কাছ থেকে পাঠ নিই; প্রত্যেক গল্পের নায়কের সঙ্গে নিজকে এবং নায়িকার সঙ্গে সমসাময়িক প্রিয়াকে মেলাবার চেষ্টা করি, উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা নিজেদের জীবনে ঘটুক্, এই কামনা করি, এবং সব সময় চেতন-সচেতন-অবচেতন ভাবে কোনো-না-কোনো নায়কের অনুকরণ করে' চলি। আসলে, জ্যান্ত নর-নারীরা সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাদের নানা অদল-বদল-করা, সাজগোজ বদ্‌লানো, পাঁচমিশেলী ছায়া বই কিছু নয়। '*We* are the stuff that dreams are

made on'—আমরা—রক্তমাংসের মানুষরাই; 'and our little life is rounded with'—'a sleep' নয়, with আর্ট। মানুষের যথার্থ অস্তিত্ব ছিলো—ঐতিহাসিকরা যা'কে প্রস্তর-যুগ বলেন, সেই সময়ে। কিন্তু ক্রমেই আর্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে একমাত্র রিয়ালিটি, এবং যা'কে বাস্তব-জীবন বলো, সেটা ফাঁকা।

আমি না বলে' পার্‌লাম না, প্রতুল নিজের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে ভালোবাসে।

—তা বাসে, কিন্তু খালি প্রতুল নয়। সংসারের ইডিয়ট্‌তম লোককে একটু নিরালায় নিয়ে উৎসাহ দিতে থাকো, দেখ্‌বে, ফোয়ারা ছুট্‌বে তা'র মুখেও।—কিন্তু আমার বলনীয় বিষয়টা তোমাদের মনে ধর্‌লো না বুঝি?

এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর প্রতুল আমাদের কাছে চায় নি, এ ওর বলার কায়দা মাত্র। চুপ করে'ই ছিলাম, কিন্তু বিজনটা মাঝখান থেকে ফস্ করে' বোকার মত বলে' বস্‌লো, সূর্য্যের চেয়ে বালুর তাত বেশি হ'তে পারে, কিন্তু তাই বলে' বালি সূর্য্যের চেয়ে বড়, এ কথা যে বলে, তা'কে পাগল ছাড়া কী বল্‌বো?

প্রতুল সিগ্রেট্‌টা মুখে তুল্‌তে গিয়ে থেমে গেলো।—যুক্তির দৌর্ব্বল্য ঢাক্‌বার জন্যেই উপমার সৃষ্টি। কবিতা যুক্তি মানে না বলে'ই ওতে উপমার এত ছড়াছড়ি।—কিন্তু যে-কথা বল্‌ছিলাম। জীবন-রূপ কাদাকে আর্ট-রূপ কুমোরের চাকাই মূর্ত্তি দেয়, এর একটা চমৎকার উদাহরণ আমি তোমাদেরকে বল্‌তে পারি।

কথাসাহিত্যরসিক বিজন উৎফুল্ল হয়ে' বলে' উঠ্‌লো, একটু সবুর কর প্রতুল, তৈরি হ'য়ে নিই।

বলে' সে চেয়ারের ওপর আরো গোটা-তিনেক কুশান্ চাপিয়ে পায়ের

ওপর পা তুলে' দিব্যি আরামে একটা সিগ্রেট্ ধরিয়ে গল্প শোন্‌বার অপেক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে রইলো।

—অত বেশি আশা কোরো না, বিজন, (প্রতুলের সিগ্রেট্ এইবার জ্বল্‌লো) এ-গল্পটা তেমন রসালো হ'বে না, কেননা villainy নিয়ে এর কারবার নয়। শুনে' নিশ্চয়ই হতাশ হ'বে, কবি, এ-গল্পটা নিতান্তই মিলনান্ত—কী করে' আমি রমাকে বিয়ে করি, তা'রই ইতিহাস।

বল্‌লাম, হোক্ না। তোমার আর্টের থিওরিকে সত্য প্রতিপন্ন কর্‌তে পার্‌লেই তো তোমার কার্য্যসিদ্ধি হ'ল! Go ahead.

—যাচ্ছি। প্রথম যখন আমি রমার প্রেমে পড়ি, সে-কথা তোমাদের নিশ্চযই মনে আছে। আমাদের কোর্টশিপ্ প্রায ছ'মাসের।

প্রথম দেখা ওভারটুন্ হল্-এ। কী একটা বক্তৃতা ছিলো—সম্ভবত নারী-জাগরণ-সংক্রান্ত। বক্তা নিজেও নারী—জাপানিনী। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে গিয়েছিলাম।

বিজন বল্‌লে, নারী-জাগরণ-সম্বন্ধে কৌতূহল, না—?

—নাঃ, এই নিরীহ কথার অর্থটাকেও যদি তোমরা কদ্ করো, তা'লে আর চলে না।

—আর না-হয় কর্‌বো না। তারপর?

—সেখানে আমার Y. M. C. A.-comrade সুব্রতর সঙ্গে দেখা। সুব্রতর মাস্‌তুতো বোন্ রমা—সেই সূত্রে আলাপ।

প্যাস্‌কেল্ বলেছেন, ক্লিয়োপ্যাট্রার নাক যদি আর-একটু ছোট হ'ত, তা'লে পৃথিবীর ইতিহাস বদ্‌লে যেতো। আমিও তেম্‌নি বলি যে সে-সন্ধ্যায় মোটারে ওঠ্‌বার আগে রমা যদি ফুটবোর্ডে এক পা ও রাস্তায় এক পা রেখে একটু অপেক্ষা না কর্‌তো, তা'লে আজ্‌কে তোমাদের কাছে এই গল্প বল্‌বার দায় থেকে অন্তত আমি নিষ্কৃতি পেতাম।

অভিনয় নয়

পড়া তো গেলো প্রেমে। পার্টি-পিক্‌নিক্‌-ফ্লার্টিঙ্‌ ‘ইত্যাদি প্রেমাচরণের যতগুলো মামুলি প্রথা আছে, সবি পুরোদমে চল্‌তে লাগ্‌লো। সে-সবের বিশদ ব্যাখ্যা কর্‌বার দরকার নেই, কারণ তোমাদের দু’জনেরই গোকুল নাগের ‘পথিক’ পড়া আছে। কিছুকাল পর্য্যন্ত সব-কিছুই চরম উপভোগ করা গেলো, কিন্তু তা’র প’রই আমার মন বেসুরো হ’য়ে উঠ্‌লো।

এইবার গল্পের ক্লাইমাক্‌স্‌ আসছে মনে ক’রে বিজন আরো একটু ঠিকঠাক হ’য়ে বসে’ নিলে। একটা দেশ্‌লাইর কাঠি নিয়ে দুই কানে সুড়্‌সুড়িও দিয়ে রাখ্‌লে। প্রতুলের একটি কথাও ও হারাতে নারাজ; —কে জানে, কথার মাঝখানেই যদি কানের ভেতরটা পিল্‌পিল্‌ করে’ ওঠে।

প্রতুল বলে’ চল্‌লো।

মাস-পাঁচেক কেটে গেলো। প্রাত্যহিক গতায়াত এবং নিবিড় আলাপনাদি-সত্ত্বেও আমি ঠিক বুঝে’ উঠ্‌তে পার্‌লাম না, রমা বাস্তবিক আমাকে ভালোবাসে কিনা। এখানে ‘ভালোবাসা’ শব্দটি আমি প্রচলিত, সর্ব্ববাদীসম্মত অর্থে ব্যবহার কর্‌ছি, যদিও ও-বস্তুটিতে আমার আদৌ আস্থা নেই। তবু, জানো তো—ঈভ্‌কে প্রথম দেখে সর্পবেশী শয়তানের হৃদয়ও দ্রবীভূত হ’য়ে আস্‌ছিলো, সে-অবস্থায় আমারো জানবার কৌতূহল হ’ল, আমি রমার পক্ষে না হ’লেই-নয় প্রয়োজন কিনা।

ফ্রয়েড্‌ পড়ে’ অবধি আমার মনে অহঙ্কার হয়েছিলো যে পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিষ নেই—থাকতে পারে না—যা আমি না বুঝতে পারি। কিন্তু সে দর্প চূর্ণ করলে রমা। সাইকো-অ্যানালিসিস্‌-এর সূক্ষ্মতম অণুবীক্ষণেও ওর মন ধরা দিতো না। ঐ একটিবার আমাকে হার মান্‌তে হ’ল, মস্তিষ্কের কস্‌রৎ সেখানে খাট্‌লো না।

Particular থেকে general-এ উপনীত হওয়া বিজ্ঞানসম্মত রীতি; কিন্তু particular-গুলো যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, তা'লে সাধারণ সমাধানে কি করে' উপনীত হওয়া যায়, বলো তো? দেখা হওয়ামাত্র রমা এমন খুসির উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়্‌তো যে, এতক্ষণ ও আমারি জন্য প্রতীক্ষা কর্‌ছিলো, এ-কথা বিশ্বাস কর্‌তে আমার স্বতই প্রলোভন হ'ত। অনর্গল কথা– যে সব কথা অতি-অন্তরঙ্গ ভিন্ন কারুর কাছে বল্‌লে নিজের চোখেই হাস্যাস্পদ হ'তে হয়। টেনিস্‌, পিয়ানো, বেড়ানো—সন্ধ্যার তারার নীচে, রজনীগন্ধার ঝোপের কাছে হাতে হাত রেখে বসে' থাকা—একটা মুহূর্তকেও বিরস হ'য়ে উঠ্‌তে দেবে না। আশ্চর্য্য ছিলো ওর উদ্ভাবনীশক্তি। দিনের পর দিন সময় কাটাবার এমন বিচিত্র ও চমৎকার সব উপায় আবিষ্কৃত হ'ত যে সময়-সময় আমার সন্দেহ হ'ত, রমা এগুলো রাত্তিরে শুয়ে' ভেবে-ভেবে বা'র করে। কিন্তু না—ও ছিলো ফ্লার্টশ্রেষ্ঠা; কবিদের যেমন কখনো মিল বা কথার জন্য আট্‌কাতে হয় না, ওরো তেমনি প্রজাপতিপণা কর্‌বার উপকরণের কখনো অভাব হ'ত না। মনোহরণের বিদ্যায় ও ছিলো আজন্মসিদ্ধা।

ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে প্রতি রাত্রে আমি একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাতাম। ওর জানালায় আলো জ্বল্‌ছে, কিন্তু ও আমাকে দেখ্‌বার জন্য কখনো জানালায় এসে দাঁড়াতো না—এক-দিনো নয়। আমি কল্পনা কর্‌তাম যে আমার টাট্‌কা চুমোগুলো যখন ওর মুখে লেগে রয়েছে, তখনি ও মায়ের সঙ্গে রান্নার আলাপ কর্‌ছে বা ছোট বোন্‌কে শেখাচ্ছে লজিক্‌। এবং এ-জিনিষটি আমার খারাপ লাগ্‌তো। উপস্থিত আপ্যায়ন মধুর সন্দেহ নেই, কিন্তু অনুপস্থিতিতে, বিরহে যে ভাব-রমণ (হেসো না বিজন, ওটা বৈষ্ণব-কাব্যের পরিভাষা) তা'র প্রতিই আমি বেশি প্রাধান্য আরোপ করি। মানসিক চর্ব্বিত-

চর্ব্বণই হৃদয়াবেগের যাথার্থ্যের প্রমাণ। দর্শনে অতদূর সদয় না হ'য়ে অদর্শনে রমা আমার কথা চিন্তা করবে, আমি যদি এমন কোনো পরিচয় পেতাম, তা'লে মুহূর্ত্তের জন্যেও কোনো দ্বিধা আমাকে আক্রমণ করতে পারতো না। প্রেমের প্রকৃত রাজ্য মানসলোকে, চিন্তাসূত্রে তা'র সিংহাসন।

একদিন মনে হ'ল, রমাকে হয়-তো আমি উপযুক্ত অবসর দিচ্ছি নে, ভালোবাসাও নাকি অতিরিক্ত ভালো হয়। সেই অনুসারে হঠাৎ আমি রমার কাছে যাওয়া বন্ধ করে' দিলাম। গুণে-গুণে সাতদিন গেলাম না,—আশা হয়েছিলো, তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে রমার জিজ্ঞাসু চিঠি আসবে—যাবার আহ্বান—চাই কি, সে নিজে এসেও উপস্থিত হ'তে পারে। কিন্তু সেই সাতদিন ক্রমাগত বায়োস্কোপ দেখে-দেখে চোখের মাথা খাওয়াই আমার সার হ'ল। স্বীকার করছি, বিজন, মনটা আমার একটু ম্রিয়মাণ হ'য়ে এলো?

বিজন বললে, ও, সেই সময়েই তুমি শোপেনহাওয়ার পড়বার চেষ্টা করেছিলে, না?

প্রতুল ঈষৎ হেসে বললে, দ্যাখো, দু'শ্রেণীর লোক তা'দের অবস্থা কিছুতেই গোপন করতে পারে না—এক মেয়েরা যখন হয় গর্ভিণী, আর পুরুষ যখন প্রেমে পড়ে। দেখলে তো, অমিত রায়ের মত ছেলেও—

বিজন প্রতুলের পায়ের ওপর সজোরে একটা একটা লাথি মারলে।

—জানো বিজন, অবাস্তব-বিষয়ের অবতারণা এপিক-কাব্যের একটা প্রধান লক্ষণ।

—তোমার গল্প epicই বটে, ape-ic। বিজন চটে' গেলে সময়-সময় অদ্ভুত সব কথা বলে।

—এই অর্থে যে, আমাদের মধ্যে যে ape's blood আছে, তার

কার্য্যকলাপ নিয়েই আমার গল্প। সে-কথাই যদি তোলো, তবে শেইক্‌সপীয়্যরের সবগুলো ট্র্যাজিডি—

বিজন হার মান্‌তে বাধ্য হ'ল। নরম সুরে বল্‌লে, থাক্। আপাতত তোমার কমেডিটাই শুনি।

—হুঁ। কোন্ পর্য্যন্ত বলা হয়েছে?

বিজন গড়্‌গড় করে' বলে' গেলো, তুমি সাতদিন রমার কাছে যাও নি, সেই সাতদিনে রমা তোমার খোঁজ-খবর নেয় নি, এবং সে-উপলক্ষ্যে মন তোমার খারাপ।

—অথচ আটদিনের দিন গেলাম যখন—আশ্চর্য্য! রমা তেমনি খুসির উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়্‌লো—আবার চা-খাওয়া, গান-শোনা, রজনী-গন্ধার ঝোপের কাছে হাতে-হাত রেখে বসা—সবি হ'ল। শুধু ও একটি-বার জিজ্ঞেস্ কর্‌লে না, অ্যাদ্দিন আসি নি কেন—চলে' আস্‌বার সময় জিজ্ঞেস্ কর্‌লে না, আবার কবে আস্‌বো। (কখনোই কর্‌তো না)

বিষম সমস্যায় পড়ে' গেলাম। সন্দেহ হ'তে লাগ্‌লো, ওর খুসিটা আমার জন্যে নয়, কারুর জন্যেই নয়। ওর মনের ধর্ম্মই প্রফুল্লতা, আমাকে উপলক্ষ্য করে' সেটা প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র, তোমাকে উপলক্ষ্য করে'ও পেতে পার্‌তো, বিজন। (বিজন নাসিকা-সহযোগে একটা বিশ্রী শব্দ করে' উঠ্‌লো)। আমি, প্রতুল ব্যানার্জ্জি লোকটি ওর কাছে অতি-আবশ্যক নই; আমাকে অবলম্বন করে' ও নিজকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে, কিন্তু আমার তা'তে ভারি বয়ে' গেলো।

এর দু'দিন পরে আমি এসে একটু পরেই বল্‌লাম, 'আমাকে এক্ষুনি যেতে হ'বে, রমা—ভয়ানক কাজ আছে।'

বলে'ই অবিশ্যি উঠ্‌লাম না, কারণ রমা যে কিছুতেই আমাকে এত শিগ্‌গির ছাড়্‌বে না, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু—

অভিনয় নয়

—রমা কিছুই বল্‌লে না তো?

—কিছুই না একেবারে। শুধু তা-ই নয়, সুব্রতর সঙ্গে সোৎসাহে Dame Melbaর কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে আলাপ সুরু করে' দিলে।

আমাকে উঠ্‌তে হ'ল। সেদিন রাস্তায় বেরিয়ে আমার অনেক কথাই মনে পড়্‌লো। মনে পড়্‌লো, চুমো-খাবার সময় রমা ঠোঁট দু'টি ফাঁক করে' আমার গায়ের ওপর এলিয়ে পড়্‌তো বটে, কিন্তু তার পরে নীচে নেবে এসে অনেক লোকের মধ্যেও আমার মুখের দিকে তাকাতে ওর মুখ একটুও লাল হ'য়ে উঠ্‌তো না। একটা মধুর অপরাধের চেতনায় ওর প্রতিটি পা-ফেলা, প্রতিটি কথা-বলা লীলায়িত হ'য়ে উঠ্‌তো না। সবি যেন সহজ, সাধারণ, প্রাত্যহিক—বিশেষের মর্য্যাদা তা'তে বর্ত্তায় নি। মনে হল, আমার অস্তিত্বটাকে ও যেন ধরে' নিয়েছে, আমি যে আছি, তা'র জন্য কোনো দুরূহ মূল্য দিতে হ'বে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে taken for granted হওয়া সর্ব্বনেশে ঘটনা।

প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, এর একটা প্রতিকার কর্‌তেই হ'বে। রমার মন আমাকে জান্‌তেই হ'বে—পাই বা না পাই।

আমি জিজ্ঞেস্ কর্‌লাম, কিন্তু এই অনুসন্ধিৎসারই বা হেতু কী? 'বাহু যদি তেমন করে' জড়ায় বাহুবন্ধ, আমি দু'টি চক্ষু মুদে' রইব হ'য়ে অন্ধ।'

—কিন্তু এই ক্ষেত্রে মনের মধ্যে মনের কথা ধর্‌তে যাওয়ার প্রয়োজন আমার ছিলো। যদি কেউটে সাপও বেরোয়, তবু। রমা আমাকে এতদূর অভিভূত করেছিলো যে ওকে বিয়ে কর্‌বার সম্ভাবনাটা মনে-মনে জল্পনা করে' বেশ সুখ পাচ্ছিলাম। কিন্তু কথাটা তোল্‌বার আগে পরিপূর্ণমাত্রায় নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। একটা জিনিষকে আমি সব চেয়ে ভয় ও ঘৃণা করি—বিয়ের প্রস্তাব করে' প্রত্যাখ্যাত হওয়া।

অপমানের জন্যে নয়, হাস্যাস্পদ হ'তে হয় বলে'। গুলি ছোঁড়্বার আগে লক্ষ্য নির্ভুল করে' নে'বার জন্য তাই আমার অত গরজ। যদি বুঝি যে সুবিধে হ'বে না, তা হ'লে ওর বিয়ের উপহার পছন্দ করে' রাখ্বার জন্যে একদিন হ্যামিল্টনের বাড়ি ঘুরে' আস্বো। কিন্তু সুবিধে হওয়াই আমি চাই।

আমার মাথায় যত ফন্দি এলো, সব একে-একে প্রয়োগ কর্লাম—সব বিফল হ'ল। বিষম সমস্যা! রহস্যময়ী নারীর থিওরিতে বিশ্বাস হয় আর কি! অজস্র গল্প-উপন্যাস পড়্তে লাগ্লাম—কোনো লেখক যদি কোনো আইডিয়া দিতে পারেন—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই রকম একটা situation কোথাও পাওয়া গেলো না। এবং, all the while—দেখা হ'লে রমা আমার কাছে অমৃত, এবং দেখা না হ'লে আমি রমার কাছে মৃত—এই ব্যাপার চল্তে লাগ্লো।

আমার বুদ্ধি, লেখাপড়া, ছলনাচাতুর্য্য—কিছুই কোনো কাজে লাগ্লো না। নাজেহাল করে' ছাড়্লে।

সেই সময় আমার মাথায় পাপবুদ্ধি ঢুকলো। মনে হ'ল, honesty best policy হ'লই বা—তার চেয়েও বড় কথা কার্য্যসিদ্ধি। The end will justify the means. ফাঁকি দিয়ে রমাকে বিয়ে করা যায় না—ঠকিয়ে?

—মানে?

—মানে? ধরো, বাইরের কোনো জিনিষের প্রভাবে রমার মনটাকে যদি যথেষ্ট নরম করে' আনা যায়—এমন একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যদি ওকে পাওয়া যায়, যখন ওর মনে প্রতিরোধ শক্তি আদৌ নেই—সেই মুহূর্ত্তে আমার (for that matter, যে-কোনো সহনীয় পুরুষের) proposal কি ও ফেরাতে পার্বে? মনে হ'ল, যদি আমার জয় হয়ই, এই উপায়েই

হ'বে। যেনতেনপ্রকারেণ একবার বিয়েটা করে' ফেল্‌তে পার্‌লেই হ'ল।

এই ফন্দিটা মাথায় আস্‌বার পর মানসিক অবস্থার উন্নতি হ'ল, শোপেন্‌হাওয়ার পুরোনো বইয়ের দোকানে বেচে দিয়ে সেই টাকায় মার্কোভিচ্ ফুঁক্‌লাম। কিন্তু ঠিক কী উপায়ে যে রমার মনের ওপর বাঞ্ছনীয় প্রভাব বিস্তার করা যায়, কী কর্‌লে যে সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তটি পাবো, অনেক ভেবেও তা'র দিশে কর্‌তে পার্‌লাম না। মন আবার ভারি হ'য়ে উঠ ছিলো, এমন সময় হঠাৎ একদিনের ঘটনায়—দৈব ঘটনাই বল্‌তে পারো—আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি আমার কাছে পিচ-ঢালা-রাস্তায় সাইকেল চালানোর মত সহজ ও মসৃণ হ'য়ে এলো।

বিজন রুদ্ধস্বরে শুধোলে, কী সে ঘটনা?

প্রতুল আধখানা সিগ্রেট ফেলে দিয়ে নতুন একটা ধরিয়ে বলতে লাগ্‌লো।

তোমরা বোধ হয় জানো না যে নাট্য-মন্দিরে 'সীতা'র প্রথম অভিনয়-রজনীর দর্শকদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। এ খবরও তোমাদের জান্‌বার সুযোগ হয় নি যে শিশিরবাবু যখন অ্যামেচার, তখন থেকেই আমি তাঁর অভিনয়ের ভক্ত। 'সীতা' দেখে—বল্‌বো কী—আমা-হেন পাষণ্ডেরও গলা বাধো-বাধো হ'য়ে এসেছিলো। রাত বারোটার সময় পদব্রজে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে হঠাৎ আমার মাথায় একটা আশ্চর্য্য প্ল্যান্ এলো। নিরানব্বুইটি প্লট্ পরিত্যাগ করে' একশো-বারের বার প্যারাডাইজ্ লস্ট্-এর আইডিয়া পেয়ে মিল্‌টনও অতদূর আনন্দিত হন্ নি।

—কী সেটা?

—শোনোই না। সেই রাত্রেই ঘুমোবার আগে আমি মনে-মনে

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ফন্দিটা ঠাউরে' নিলাম—মায়, থিয়েটারের পর কোন্ রাস্তা দিয়ে কোন্ হোটেলে যাবো, তা পর্য্যন্ত। কল্‌কাতায় চাঁদের আলোর ওপর বড় বেশি নির্ভর করা যায় না—তবু, পাঁজিতে দেখ্‌লাম, আগামী রোব্‌বার পড়েছে পূর্ণিমা। ভালোই হ'ল—চাঁদের আলো থাক্‌লে ক্ষতি নেই।

পরের দিন রমাকে গিয়ে যে-কথা বল্‌লাম, তা হচ্ছে এই: 'দ্যাখো রমা, মানুষ অমর নয়।'

রমা তৎক্ষণাৎ আমার কথার গূঢ় ইঙ্গিত বুঝে উঠতে পার্‌লে না। ভুরু কুঁচ্‌কে বল্‌লে, 'মানে?'

'মানে আবার কী? তুমি যে তুমি, তুমিও মরে' যেতে পারো, তা কখনো ভেবে দেখেছো?'

'হঠাৎ শঙ্করাচার্য্য?'

'মর্‌তে হয় মর্‌বে, তা'র ওপর মানুষের কোন হাত নেই। কিন্তু মর্‌বার আগে—'(এখানে একটু pause)—'মর্‌বার আগে শিশিব-বাবুর "সীতা" একবার দেখে এসো গে।'

রমা কিন্তু সহজেই—বলামাত্র রাজি হ'ল। অত কায়দা করে' বলার দরকার ছিলো না। রোব্‌বারেব ম্যাটিন্-এ। সঙ্গে যা'তে আব-কেউ যেতে না পারে (যেতে চাইলে আমার পক্ষে না-নিয়ে যাওয়া মুস্কিল হ'ত), সে-জন্যে মিথ্যে কথা বল্‌তে হ'ল। ভয়ানক রাশ্; টিকিট প্রায় সবি বিক্রী হ'য়ে গেছে; অনেক চেষ্টায় পাঁচ টাকার পেছনেব দিকে দুটো চেয়ার পাওয়া গেছে; সুবিধে হ'লে আর-একদিন না-হয় —ইত্যাদি।

রোব্‌বার এলো। সাজসজ্জার সুরুচিসঙ্গত পারিপাট্যে রমা সেদিন ডাচেস্ অব্ ইয়র্ক্‌কেও হার মানালে, আর অবিশ্রাম চঞ্চলতায় কন্‌স্টান্‌স্

টাল্‌মাজ্‌কে। ভবানীপুর থেকে নাট্যমন্দির পর্যন্ত সারাটা পথ—রমারা নতুন একটা গ্রামোফোন্ কিনেছে—প্যারিস্ থেকে আনানো যন্ত্র—ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সব রেকর্ড—সারাটা পথ আমায় তা'রি গল্প শুন্‌তে হ'ল। রমা 'চেলো শিখ্‌বে, তা'র মতে 'চেলো হচ্ছে যন্ত্রের সেরা যন্ত্র। রবিবাবুর গান কী ভীষণ ন্যাকামিপূর্ণ! রমার সহপাঠী কোন্ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ মেয়ে তা'র গান শুনে' বলেছিলো, এমন চমৎকার সোপ্রানো সে কোনো বাঙালী মেয়ের গলায় শোনে নি; সুষমা (রমার ছোট বোন) যদি একটু চেষ্টা করে—। ওর বাস্তবিক গানের gift ছিলো। এই সব।

বল্‌তে-বল্‌তে পাঁচ-শো বার হাত তুলে' দেখে নিচ্ছিলো, খোঁপাটা ঠিক আছে কিনা। ওর হাবভাব দেখে আমার পুরুষের রক্ত জমে' বরফ হ'য়ে উঠ'তে পার্‌তো, যদি না শিশিরবাবুর নাট্য-কুশলতার ওপর আমি নির্ভর করে' থাক্‌তাম।

মোটার থেকে নেমে রমার শোফার্‌কে আমি বল্‌লাম, 'বাড়ি ফিরে যাও—সন্ধ্যের সময় কারো গাড়ির দরকার হ'তে পারে।' আর রমাকে—

'বাঙালী থিয়েটার—তেমন punctual নয়। অযথা গাড়িটাকে ধরে' রেখে লাভ কী? ফের্‌বার সময় না-হয় একটা ট্যাক্‌সি—'

'My mistress bent that brow of hers'!

আরম্ভ হবার তখন অল্প দেরি। চেয়ারে বসে' সে হঠাৎ শুধোলে, 'তুমি হিপ্পোপটেমাস্ দেখেছো?'

'না—হ্যাঁ।' Shocked হ'লাম। 'কেন বলো তো?'

'সেদিন জু-তে গিয়ে ভাব্‌ছিলাম, হিপ্‌পোকে নিয়ে কেউ কখনো কবিতা লেখে নি কেন? ঈশ্বরের অমন চমৎকার বিলাসিতা! একেবারে নিষ্প্রয়োজন। চরম কুশ্রীতা। কুশ্রীতার আর্ট।'

'তুমি লিখ্‌বে কবিতা?'

'আমি? আমি কেন লিখ্‌তে যাবো? তুমি যদি কবি হ'তে, আমি তোমাকে ফর্‌মাস দিতাম।'

দাও না একবার! হিপ্‌পো নিয়ে লিখ্‌বো কবিতা? শোনো তবে—

হিপ্‌পোপটেমাস্—
লিপ্ত পটে মাস!'

'মানে কী হ'ল?'

'বুঝ্‌লে না? হিপ্‌পোপটেমাস্—পটে যেন মসী লেপন করা হয়েছে—এম্‌নি কালো।'

'কিন্তু মসী কোথায়? মাস যে!'

'ও-ই মসী। ওটা বাঙ্‌লা কাগজের ছাপার ভুল।'

রমা খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠ্‌লো।

এই অতীব silly ব্যাপার কতক্ষণ চল্‌তো কে জানে—কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সেই মুহূর্ত্তে ঘণ্টাধ্বনি-সহযোগে যবনিকা-উত্তোলন হ'ল। প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ।

প্রথম অঙ্ক চল্‌ছে। রমা প্রায়-অনবরত আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে' কথা বল্‌ছে। সীতার অত মোটা হওয়া উচিত হয় নি, রামের পোষাকটি মানিয়েছে বেশ। আশ্চর্য্য, prompterদের কণ্ঠস্বর তো শোনা যায় না। কানা-কেষ্ট কানা হ'ল কী করে? গলা বটে এক খানা!

আমি একবার বল্‌লুম, 'আঃ, এত কথা বল্‌ছ কেন?'

রমা তৎক্ষণাৎ চুপ করে' মুখ সরিয়ে নিলে। চেয়ারে বসে' কিছুতেই যেন আরাম পাচ্ছে না—খালি উস্‌খুস্ ছট্‌ফট্! তারপর হঠাৎ আবার—

'বইটা কার লেখা?'

আমি ওর ঠোঁট দু'টি ধরে' দু' আঙুল দিয়ে বুজিয়ে দিলাম।

অভিনয় নয়

প্রথম অঙ্ক শেষ হ'লে পর আমি বল্‌লাম—'এত যে কথা বলো, বিলেতে হলে তোমাকে বা'র করে' দিতো।'

'বিলেতে হ'লে চেয়ারগুলো এমন বিশ্রী uncomfortbale হ'ত না। বিলেতে হলে—এই, সুধীর যে!

এগিয়ে এলো সুধীর। তরপর ডলী নাম্নী কোনো সদ্যবিবাহিতা রহস্যময়ী নারী-সম্বন্ধে ওরা গ্রীক্‌ভাষায় আলাপ কর্‌লে। 'কেমন লাগ্‌ছে সীতা?' 'Goody-goody' হাসি—বাঁকা চাউনি—অন্ধকার—ঘণ্টার শব্দ। দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হ'ল।

'এই সুধীর-ছেলেটা কী করেছিলো, জানো? মার্কেটে এক মেম-সাহেবের সঙ্গে—ছি-ছি, এই নাকি উর্ম্মিলা। এ যে সীতার মেয়ে হ'তে পারে!'

অসম্ভব। গত্যন্তর না দেখে পাথরের মত স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলাম। ওর যত খুসি বকুক্। নিজের অজান্তেই আমি অভিনয়ে ডুবে' গেলাম। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হ'লে পর আমার হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে রমা অনেকক্ষণ একটি কথাও বলে নি। মন আমার আশায় উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌লো।

সুধীর এসে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, 'আইস-ক্রীম খাবে, রমা?'

'না।'

'জানো রমা, পরেশ বিলেত যাচ্ছে।'

'ঐ ইডিয়টটা! ও তো ছুরি-কাঁটা ধর্‌তেও জানে না!'

সুধীর খুব খানিকটা হো-হো করে' হেসে উঠ্‌লো, কিন্তু তারপরে আর আলাপ জম্‌লো না। তৃতীয় অঙ্কে শম্বুক-বধ। তুঙ্গভদ্রার মর্ম্মভেদী চীৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে রমার গলা দিয়েও একটি অর্দ্ধস্ফুট তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরিয়ে এলো;—আমি তা শুন্‌লাম।

আলো জ্বল্‌তে দেখি, রমা মুখ ফিরিয়ে চেয়ারের পিঠে হাত ও হাতের

ওপর মাথা রেখেছে। সুধীর দূর থেকে দেখে ফিরে' গেলো। আমি জিজ্ঞেস্ করলাম, 'কী হ'ল রমা? শরীর ভালো লাগ্‌ছে না? চলে' যাবে?'

রমা চোখ তুলে' শুধু বললে, 'তুঙ্গভদ্রার কী চুল!' বলে' হাস্‌লে; কিন্তু সে-হাসিতে আর কন্‌স্টান্‌স্ টাল্‌মাজের হাসিতে অনেক তফাৎ।

চতুর্থ অঙ্ক যখন হচ্ছে, আমি একবার আড়চোখে চেয়ে দেখ্‌লাম, রমার বাঁ হাতের মুঠিতে রুমাল। তারপর আর তাকালাম না। বাম আর লবে যখন দেখা হ'ল, রমা তখন ঝুঁকে পড়ে' দু'হাত দিয়ে আমার হাতখানা সজোরে আঁক্‌ড়ে' ধরেছে। ক্রমে ওর মাথা আমার কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়্‌লো। ও যা'তে পরিপূর্ণ মাত্রায় অভিভূত হ'তে পারে, সেই সুযোগ দেখার জন্যে চতুর্থ অঙ্ক শেষ হওয়া মাত্র আমি বাইরে চলে' গেলাম,—এলাম পঞ্চম অঙ্ক আরম্ভ হওয়ার পরে।

রমা তখন আর নিশ্বাসও ফেল্‌ছে না।

বহুদূর-থেকে-ভেসে-আসা শ্রীমতী প্রভার 'নাথ' উচ্চারণের সঙ্গে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ তিনঘণ্টার অবরুদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলে। আলো জ্বল্‌লো। কোলাহল সুরু হ'ল। অথচ রমা মাথাই তুল্‌ছে না। ওকে ডাক্‌তে হ'ল। চেয়ার থেকে উঠ্‌তে ও পুরো পাঁচ মিনিট সময় নিলে। বুঝ্‌লাম, আশাতীত ফল পেয়েছি। ইচ্ছে করে' ওর চোখের দিকে তাকালাম না।

দরজার কাছে সুধীর। রমা তা'কে দেখ্‌লোই না।

দু'জনে ট্যাক্‌সিতে উঠে' বস্‌লাম। ভবানীপুর—সেনট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে।

রমা বসেছে। ওর খোঁপা যে আল্‌গা হ'য়ে গেছে হাত থেকে রুমালখানা যে খসে' পড়ে' গেছে, সে-চৈতন্য ওর নেই। সব সুলক্ষণ। তবু চট্ করে' সাহস পাচ্ছিলাম না। রমা চোখ বুজেছে।

অভিনয় নয়

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। বাতাসের বন্যা। হ্যাঁ, চাঁদের আলো মুখের ওপর এসে পড়ে বই কি! ঝিকিমিকি-রুপো। রমার কাঁধের ওপর হাত রেখে শুধোলাম, 'শীত কর্‌ছে হাওয়ায়?'

রমা আমার গায়ের ওপর মাথা এলিয়ে দিলে। কথা বল্‌তে ও ভুলে গেছে।

তখন আমি—হেসো না, বিজন—তখন আমি ওর মাথাটি দু'হাতে তুলে ধরে' কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে ডাক্‌লাম—'সীতা!' সঙ্গে-সঙ্গে——

আমার বুকে মুখ গুঁজে' রমা ঝর্‌ঝর্ করে' কেঁদে ফেল্‌লে। আমার নতুন তসরের পাঞ্জাবীটা ভিজে' গেলো।

প্রতুল থাম্‌লে। বিজন বলে' উঠ্‌লো, ও কী? এই হ'ল?

—আবার কী? রমা যে বর্ত্তমানে আমার স্ত্রী, তা তো তোমরা জানোই।

—তবু ঘটনাগুলো?

—ঘটনা কিছুই নেই। ভবানীপুর ফেরার পথে একবার ইম্পিরিয়েল্-এ গেলাম মাত্র। রমাকে বল্‌লাম, তোমার খোঁপাটা ঠিক করে' নাও, আর চোখ-মুখ ভালো করে' মোছো।' চা খেতে-খেতে রমা অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে' এলো। আমি অত্যন্ত করুণ সুরে বল্‌লাম, 'তোমাকে আজ আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পার্‌তাম যদি, রমা!'

রমা চোখ দিয়ে হেসে বল্‌লে, 'আজ না পারো, কোনোদিন তো পার্‌বে!'

আমি নিতান্ত অজ্ঞতার ভাণ করে' বল্‌লাম, 'সে কী করে' সম্ভব হয়?'

এর উত্তরে রমা যে-কথা বলেছিলো, তা শুনে' তখনি আমার হাসি পেয়েছিলো প্রায়। বলেছিলো, রাম-সীতার কী করে' সম্ভব হয়েছিলো? কিন্তু আশা করি তুমি আমাকে কখনো বন-বাসে পাঠাবে না।'

পরের দিনই আঙ্‌টি গড়াতে দিলাম।

বিজন বল্‌লে, বিয়ে তো করলে ফাঁকি দিয়ে? কিন্তু তারপর? সাম্‌লাতে পার্‌ছো তো?

প্রতুল একটা হাই ছাড়্‌তে-ছাড়্‌তে বল্‌লে, একবার বিয়েই যদি হ'তে পার্‌লো, তারপর আর ভাবনা কী? হাজার হোক্ মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ। জল। যে-পাত্রে রাখো, তা'রি আকৃতি ও রঙ্ ধর্‌বে। রমা নিজকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী স্ত্রী ভাব্‌ছে। আমি তোমাকে নিশ্চয়-বল্‌তে পারি, বিজন, তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'লেও সে ঠিক এই কথাই ভাব্‌তো।

ছেলেমানুষি

ছেলেমানুষি

শঙ্করচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় সাহিত্য-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে, এবং সেই প্রথম আলাপই তুমুল তর্কে পর্য্যবসিত হয়। তখন পদ্য লিখে' চারদিক থেকেই বেশ প্রশংসা পেয়ে আমার মনে ধারণা জন্মে' গেছে যে, রবিঠাকুর অবিশ্যি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু আমিও নিকৃষ্ট নই। এই সময়ে আমার রচনার প্রতিকূল মত শুনি শঙ্করচন্দ্র মিত্রের মুখে। স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, তাঁর সঙ্গে আমি তর্ক করেছিলুম—তা আপনারা একে দম্ভই বলুন্ আর দুর্ব্বলতাই বলুন্।

আমাদের বাসা ছিলো তখন ছিদাম মুদির লেইন্ এ। একবার মা-বাবা ভাই-বোনেরা মাস তিনেকের জন্য হাওয়া বদল করতে বিন্ধ্যাচল গিয়েছিল—আমাকে ঠাকুর-চাকর-সহ সমস্ত গৃহস্থালির প্রহরিত্বে অধিষ্ঠিত করে'। প্রথমটায় একটা জনহীন বাড়িতে স্বেচ্ছায় দীর্ঘ অবকাশ যাপন করবার সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলুম, কিন্তু দিন-সাতেক পরেই মনে হ'তে লাগ্‌লো যে প্রকৃতির নিখুঁত সুন্দর মুখের উপর মানুষের অস্তিত্ব যদি কলঙ্কও হয়, তবে সে-কলঙ্ক হচ্ছে তা'র বিউটি-স্পট, অর্থাৎ সেই কলঙ্কের অভাব তা'র মুখশ্রীকে অনেকখানি ম্লান করে' দেয়। অগত্যা ঠাকুরটার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ সুরু করলাম, কিন্তু কিছুক্ষণ উড়ে' ভাষা শ্রবণ করার পর কানের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়ে নিরস্ত হ'লাম। চাকরটি ছিলেন আবার কানে কিছু খাটো; তাকে একগ্লাশ জল আন্‌তে বল্‌লে আশে-পাশের দু'চারখানা বাড়ির লোক জেনে যেতো যে আমি পিপাসার্ত্ত। যদিচ চীৎকার এবং আনুসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গী উত্তম শারীরিক ব্যায়াম বলে' প্রসিদ্ধ, তবু রসনা ও কণ্ঠের আরামই আমি কামনীয় বিবেচনা করলাম।

সুতরাং শঙ্করচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়টা জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য বলে'ই গ্রহণ করলাম। আমাদের বাড়ির মুখোমুখি মস্ত একটা

এলোমেলো দালানের চাপে সমস্ত গলিটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে ;—বড় রাস্তায় হ'লে সে-দালান কারুর চোখেই পড়্‌তো না, কিন্তু অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি দেহের পুরোভাগে প্রকাণ্ড মাথার মত এই গরীব, কাহিল গলির মধ্যে ঐ জাঁদ্‌রেল বাড়িটাও নিতান্ত অশোভন ব'লে'ই চোখে ঠেক্‌তো। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন আধুনিকতম নরোয়েজীয়ান্‌ নভেলেও মন বস্‌তো না, বা রাত্তিরে আধ-টিন্‌ সিগ্রেট পুড়িয়েও যখন শয্যা-গ্রহণ করার মত নিদ্রাকর্ষণ হ'ত না, তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গভীর অভিনিবেশ-সহকারে আমি ঐ বাড়ির গতিবিধি লক্ষ্য কর্‌তাম। ভালোই লাগ্‌তো।

ভালো লাগ্‌তো, কারণ ও-বাড়িতে কম্‌সে-কম কুড়ি-পঁচিশটি প্রাণী (কুকুর-বেড়াল বাদ দিয়ে) চব্বিশ ঘণ্টা আহারনিদ্রাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাক্‌তো ; এবং ছাত থেকে লম্বমান শাড়ি ও ধুতির বাহুল্যে, শিশুকণ্ঠের চীৎকারে, বালকদের পাঠাভ্যাসধ্বনিতে এবং সাবালকদের উৎফুল্ল, বিরক্ত বা উত্তেজিত কলরবে তাঁদের সংখ্যাধিক্য ও প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য্য বহির্জ্জগতের কাছে তাঁরা প্রমাণ করে' ছাড়্‌তেন। মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থার খাঁটি বাঙালী ঘর আর কি! কর্ত্তা ছিলেন—কি আর?—কোনো বড় আপিসের বড়বাবু, কেরাণীকুলচূড়ামণি!—আগাগোড়া আতিশয্য,—শিশুর, আত্মীয়স্বজনের, কোলাহলের, অর্থব্যয়ের। ঘর-দোর, চলাফেরা, স্নানাহার—সবি বিশ্রীরকম বিশৃঙ্খল ; বাড়ির আব্‌-হাওয়াতে গরম দেশের শৈথিল্য। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, ও-বাড়িতে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে রসগোল্লা চেয়ে নিয়ে খেতে শিশুদের কোনো বাধা নেই।

শঙ্করচন্দ্র মিত্র ছিলেন ঐ বাড়ির অন্যতম অধিবাসী। অথচ আশ্চর্য্য এই, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বে তাঁকে কখনো দেখি নি। কতদিন

কত সময়ে ও-বাড়ির লোকদের পর্য্যবেক্ষণ ক'রে' নিজের নিঃসঙ্গতা বিস্মৃত হয়েছি, অশিক্ষিত নারী-কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গানের হত্যা-সাধন হ'তে শুনেছি, ডান্‌পিটে ছেলেগুলোর দৌরাত্ম্য দেখে কবে যে ওরা ফাঁসি বা জেলে যাব, এই আশঙ্কায় কণ্টকিত হ'য়ে উঠেছি, চাকরটা কখন্ যে বাজার নিযে ফেরে, কখন বান্না চড়ে, বাবু কখন স্নান কর্‌তে ওঠেন, মেয়েরা ইস্কুলে যাবার আগে কতক্ষণ ধরে' সাজে—সব ছিলো আমার নখদর্পণে, অথচ শঙ্করবাবু কি করে' যে আমার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিকে ফাঁকি দিয়ে এতদিন গা-ঢাকা দিয়েছিলেন, ভেবে অবাক্ হ'লাম। পরে জান্‌লাম, তিনি প্রচণ্ড পাণ্ডিত্য লাভ করার জন্য এমন কঠিন তপস্যা করছেন যে তেতলার যে-ঘরটিতে তাঁর বসবাস, সেখানে দৈবাৎ কেউ প্রবেশ করলে পুস্তকরাশির অন্তরালে অধিবাসীটিকে নাকি দেখতেই পায় না।

হ্যাঁ, শঙ্করবাবু পাণ্ডিত লোক ছিলেন বটে, সজারুর কাঁটার মত বিদ্যার ধারালো বর্ম দিযে নিজকে তিনি এমনি ঢেকে রেখেছিলেন যে, তাঁকে একটু ছোঁয় কা'র সাধ্য। মনুষ্যসঙ্গ এড়িয়ে চল্‌বার জন্য তিনি সাইকেলে চড়তেন,—বাস্-এ বা ট্রামে নাকি বড্ড ভিড়। কিন্তু তাঁর এই সঙ্গবিমুখ সাইকেল্‌ই একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁকে আমার ঘাড়ের ওপর এনে ফেল্‌লে—আমাদের গলির মোড়টিতে। ফলে, স-সাইকেল্ তিনি উল্টে' পড়্‌লেন। ধড়্‌মড়্ করে' উঠ্‌তে-উঠ্‌তে বল্‌লেন, "কিছু মনে কর্‌বেন না।"

না বলে' পার্‌লুম না, "একথা নিশ্চয়ই মনে কর্‌বো যে পথ দেখে চল্‌তে না শিখ্‌লে শেষে ঠক্‌তে হয়।"

ভদ্রলোক অমায়িকভাবে বল্‌লেন, "হ্যাঁ—দোষ আমারই। বাঁ-দিকে যাওয়া উচিত ছিলো। মাপ কর্‌বেন।"

এ-হেন ভদ্রবচনের উত্তরে উচ্চবাচ্য করা সম্ভব নয়, তাই আমি নীরবে চল্‌তে লাগ্‌লুম। বাড়ির সুমুখে এসে না বল্‌লেই নয় বলে' বল্‌তে হ'ল, "Never mind" বলে'ই ঢুকে' যাচ্ছিলাম; শঙ্করবাবু ডাক্‌লেন, "শুনুন।"

ফির্‌তে হ'ল।

"আপনি এই বাড়িতে থাকেন ?"

"আজ্ঞে।"

"আমার ঐ বাড়ি। কিন্তু এখানে অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন না ?"

স্বীয় যশোসৌরভে মন পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। বাঁকা হেসে বল্‌লুম, "আপনি তাঁর সঙ্গেই কথা কইছেন।"

শঙ্কর বাবুর ঠোঁটের এক কোণ সহসা ঝুলে' পড়্‌লো; চোখ বড় করে', সমস্ত মুখ দিয়ে পর-পর বিস্ময়, লজ্জা ও আনন্দ প্রকাশ করে' বল্‌লেন, "ভালোই হ'ল। বহুদিন যাবৎ ভাব্‌ছি, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করি। বিশেষত যখন জান্‌লাম, আপনি আমাদের এত কাছে আছেন, এবং আপনার বাড়িতে আর লোক নেই—"

"থাক্‌লেও আপনার কোনো বাধা ছিলো না। আসুন্। হ্যাঁ, সাইকেল্‌টা ভেতরেই এনে রাখুন্; চাণক্যের শ্লোক পড়ে নি পৃথিবীতে এমন লোকের অসদ্ভাব নেই।"

শঙ্করবাবুর সঙ্গে প্রথম দিন আলাপ করে' খুসিই হয়েছিলাম। বুঝ্‌লাম, ও-বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যিনি আস্তে কথা বল্‌তে জানেন। মাতৃভাষায় স্বাভাবিক স্বরে কিছুক্ষণ ধরে' আলাপ কর্‌তে পেরে ভেতরের সব বিষাক্ত হাওয়া বেরিয়ে গেলো;—তা-ও আবার সব আলাপের সেরা আলাপ, সাহিত্যালাপ। যদিও ঘরে ঢুকে' আমার টেবিলের ওপর টুর্গেনিভ্ দেখেই তিনি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা

করলেন, তবু বুদ্ধদেব হ'য়ে বসে' থাকতে-থাকতে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে মরার চাইতে উত্তেজনার গাঙে তর্কের না' ভাসিয়ে তুলতে পেরে আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। তা ছাড়া, আমার প্রত্যেক চলাফেরা কথাবার্তা তিনি সেই জিনিসটির সঙ্গে দেখতে ও শুনতে লাগলেন, ইংরেজিতে যা'কে বলে অ্যাডমিরেশ্যন্। সেটাও আমার মনের মুখরোচক হচ্ছিলো।

শঙ্করবাবুকে দেখলে আপনারা সবাই একবাক্যে বলবেন যে, এঁর কথার মূল্য আছে। চেহারা দেখে যদি মানুষকে বিচার করতে হয়, তা হ'লে বলতে হ'বে যে বিচক্ষণতার সবগুলো লক্ষণ শঙ্করবাবুর মধ্যে বিলক্ষণ ছিলো। অতি-আধুনিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর দেহের প্রতি ভঙ্গিতে পরিস্ফুট। ছোট ও সমান করে' ছাঁটা চুল, তা-ও তেলে চুপ চুপে, সজ্জার অনাড়ম্বর ইচ্ছাকৃত নয়—খদ্দরের আধ-ময়লা পাঞ্জাবী একটা, গলার বোতাম আঁটা, বুকের কাছবটা ছিঁড়ে' গেছে;—ধুতিটা যে পাঁয় হাঁটুতে এসে ঠেকেছে, সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপমাত্র নেই, পায়ে পুরোনো চটি—স্যাণ্ডেল্ নয়। তা'র ওপর রঙ্ কালো—আপনার-আমার চেয়েও কালো—বাঙালীর চোখেও তা কালো বলে' ঠেকে। ছোট হ'লেও উজ্জ্বল চোখ, বড় ও শাদা দাঁত, মুখ অমন কালো বলে' বেশি শাদা দেখায়—ঠোঁট দু'টো হাসতে শেখে নি, তবে ঠোঁটের এক-কোণ কামড়ানোর অভ্যেস্ আছে, এবং তা'তে তাঁর একজন বিশেষ চিন্তাশীলের মতই চেহারা হয়। চা খান্ না, কারণ তা'তে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। সিগ্রেটও বাদ, কারণ তা'তে যক্ষ্মারোগের বীজ ওৎ পেতে আছে;—মোটের ওপর, একটুও ছেলেমি নেই; বর্ত্তমান দিন-কালের পক্ষে এমন লোক ক্ষণজন্মা। উনি সেই ধরণের লোক, যাঁরা কার্ত্তিক থেকে ফাল্গুনমাস পর্য্যন্ত সন্ধ্যা হ'তেই মাথায় টুপি বেঁধে বা কাপড়

জড়িয়ে রাস্তায় বেরোন্, এবং যাঁদের বৈকালিক চিত্তবিনোদনের প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে গিয়ে বসা।

যা হোক্, এতৎসত্ত্বেও শঙ্করবাবুকে আমার ভালো লেগেছিলো। আর, মানুষের পোষাক বা অভ্যেসের পরিচয়ই তো তা'র সবটুকু নয়! শঙ্করবাবুর কণ্ঠস্বর ছিলো মাজা-ঘষা, পালিশ-করা ;—কথা বল্‌তে-বল্‌তে তা কখনো উঁচুনীচু হয় না, নিঃশ্বাস নেবার জন্য অকস্মাৎ থাম্‌বার প্রয়োজন তাঁর নেই। শুনে' আমার ধারণা হয়েছিলো যে, এই ভাগ্যবান অটুট বলশালী স্নায়ুমণ্ডলীর অধিকারী। অমাবস্যার চাঁদের মত মুখ করে' ঐ দারুময় কণ্ঠে তিনি যখন কোনো লেখক-সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানাতে লাগ্‌লেন, তখন আমি তো আমি, আলোচ্য গর্কী বা হামস্থন উপস্থিত থাক্‌লে তাঁদের অমন গোঁফ-ওলা মুখও চূর্ণ হ'য়ে যেতো। হ্যাঁ—বল্‌তে ভুলেছি, শঙ্করবাবুর গোঁফ ছিলো না; এটা উল্লেখযোগ্য, কারণ থাকা উচিত ছিলো—নয় কি? এবং সেই জন্য তাঁর মুখের গড়নে আমি যেন মার্টিন্ লুথ্যারের মুখের একটু আদল পেতাম। অবিশ্যি এ-সাদৃশ্য আমার কাল্পনিক হ'তে পারে।

যাক্ গে—ব্যাপারটা শুনুন্। কী বল্‌ছিলাম? হ্যাঁ, আমার টেবিলের ওপর টুর্গেনিভের বই দেখে তিনিই আলাপ আরম্ভ কর্‌লেন: "আপনি বুঝি টুর্গেনিভের খুব ভক্ত?"

সরলভাবে বল্‌লুম, "হ্যাঁ। কারণ টুর্গেনিভ্ পড়ে' মন খারাপ হয়।"

"মন খারাপ কর্‌তে পারার ক্ষমতা দিয়েই যদি সাহিত্যকে বিচার কর্‌তে হয়, তা হ'লে যাত্রা কী দোষ কর্‌লো?"

এমন উদ্ভট প্রশ্ন আশা করি নি; একটু অবাক হ'য়ে বল্‌লাম, "দোষ আবার কর্‌বে কী? যাত্রা দেখে আমার মন খারাপ হয় না, হাসি পায়—এই যা।"

ছেলেমানুষি

"না, না—আপনি নিজকে একটু তলিয়ে দেখুন, আপনার মনে কান্না জিনিষটাই লোভনীয়—এবং সে-কান্না সব চেয়ে উপভোগ্য হয়, যখন তা'র মূলে থাকে—প্রেম।" শেষ শব্দটি তিনি এমন ভাবে উচ্চারণ কর্‌লেন, যেন মুখ থেকে একটা গরম লোহার টুক্‌রো ছুঁড়ে' ফেলে দিলেন। —"এবং এটা শুধু যে আপনার মধ্যেই আছে, তা নয়, আজ-কালকার ধরণই এই। এই ন্যাকামিতে, শুধু বাঙ্‌লা সাহিত্য নয়, সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে গেলো। দু'জনে ভালোবাস্‌লো—মাঝে খানিকটা তোলপাড়—তারপর বিয়ে হ'ল না—দরকার মত দু'একটা আত্মহত্যা বা খুন—ব্যস্, সকল গল্প, সকল উপন্যাসের এই তো পুঁজি। ডেভিড্ নাম বদ্‌লে দেবেন্দ্র, মেয়ারি বদ্‌লে মীরা। এই নিয়েই বিশ্বসুদ্ধ লোক ক্ষেপে যাচ্ছে। যে-প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিত্যজাগ্রত, যে-সব জিনিষ আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত, তা-ই নিয়ে এত নাচানাচি করে' লাভ কী? যা অপরূপ, যা কবির গোপন স্বপ্নলব্ধ, তা'র আভাস আজকালকার দিনে কেউ কি দিচ্ছে? এমন কি ওয়ার্ডস্বার্থ মিল্‌টন্ আজকাল কেউ পড়েও না।"

মুগ্ধ হ'লাম। কিন্তু এরো যে কোনো উত্তর নেই, তা নয়। ধরুন্, বল্‌তে পার্‌তাম, "একদিন এসে জন্ম নিলো—মাঝে কয়েকটা দিন রঙ্‌চঙে পোষাক পরে' মুহূর্ত্তের আলোয় প্রজাপতির মত ফুর্‌ফুর্ কর্‌লে—তারপর বুড়ো হ'ল, মারা গেলো;—সমস্ত মানুষের জীবনই কি এই নয়? সুশীল নাম বদ্‌লে সুনীতি, দেবেন বদ্‌লে মোহিত! অথচ এই জীবনটাকে টিঁকিয়ে রাখ্‌বার জন্যেই মাথার ঘাম পায়ে-ফেলা, এরি জন্যে রেলগাড়ি-এরোপ্লেন্-ইক্‌নমিক্স-ফিলসফি—সব।" তা ছাড়া, শঙ্করবাবু ধরে' নিয়েছিলেন যে টুর্গেনিভের ভক্ত বলে'ই ওয়ার্ডস্বার্থ-মিল্‌টনের ওপর আমি বিরক্ত, অথচ যে-লোক দার্জ্জিলিঙ্-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখেছে, সেন্ট্রাল

অ্যাভেনিউ যে ওঁ’র অপরিচিত না-ও হ’তে পারে, এ-অকাট্য যুক্তিও প্রয়োগ করা যেতো। কিন্তু আমি বল্লুম অন্য কথা। “প্রেমে-পড়াটা সকলের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত নাও হ’তে পারে। অত সৌভাগ্য কি আর সকলের হয় ?”

“হয়ই তো না! এবং হয় না বলে’ই তো এ-সাহিত্যের উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি দুই-ই এত বেশি। যাঁরা লেখেন, তাঁদেরো প্রেরণা থাকে অতৃপ্ত কামনা, এবং যাঁরা পড়েন, তাঁরা গল্পের ভেতর দিয়ে নিজেরাই তৃপ্তিলাভ করে’ থাকেন।”

তা হ’লে ফ্রয়েড্‌ও পড়া আছে! বল্‌তে যাচ্ছিলাম, “কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলে’ থাকেন—”

শঙ্করবাবু বাধা দিয়ে বলে’ উঠ্‌লেন, “ঐ আর একটা কথা! মনস্তত্ব! ভূতের মত দেশটাকে পেয়ে বসেছে! ভাত খেতে মনস্তত্ব, হাই তুল্‌তে মনস্তত্ব, স্বপ্নে মনস্তত্ব—এর হাত থেকে কিছুতেই ছাড়া পাবার যো নেই। আগেকার দিনের মত সব লোক যদি অল্প বয়েসে বিয়ে কর্‌তো, তা হ’লে এত বাজে সাহিত্য গজাতে পার্‌তো না। খিদের একমাত্র প্রতিকার যেমন খাওয়া, তেম্‌নি এই অশ্লীলতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে বিয়ে-করা। এই আপনার কথাই ধরুন। আপনার ক্ষমতা আছে,—কিন্তু কিছু মনে কর্‌বেন না—আপনি বিবাহিত হ’লে যথার্থ উচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি কর্‌তেন, sentimentality-র ঘোলা জলে হাবুডুবু খেতেন না। আমার মতে প্রত্যেক ambitious লোকের বিয়ে করা উচিত ; তা হ’লে মন অস্বাস্থ্যে দুর্ব্বল হ’য়ে পড়ে না, এবং কাজে পরিপূর্ণ মন ঢেলে দে’য়ার অবসর মেলে।”

এর পর আমি আত্মসমর্থণকল্পে যে-সব কথা বলেছিলাম, তা আর আপনাদের শুনিয়ে লাভ নেই। শঙ্করবাবুর প্রতিবাদী বলে’ আমাকে

বল্‌তেই হ'ল যে, একজন আর্টিস্‌টের পক্ষে বিয়ে আর আত্মহত্যা করা সমান—যদিও বিয়ের বিরুদ্ধে আমার মনে এমন ভয়ঙ্কর কোনো সংস্কার নেই। ক্রমে সমাজের কথা উঠ্‌লো—গায়্‌টে, বায়রন্‌, শেলি, এলিজাবেথের ইংল্যাণ্ড, বর্ত্তমান বাঙ্‌লা, এলেন কেই, বিধবা-বিবাহ, রামমোহন রায়, ডিভোর্স, আমেরিকা—সে অনেক কথা। মোটের ওপর আমার এই ধারণা জন্মালো যে, ভদ্রলোকের মনে কোথাও কোনো-রকম দুর্ব্বলতা নেই; আগাগোড়া জমে' তা চাঁদের মত ঠাণ্ডা আর শক্ত হ'য়ে গেছে; পৃথিবীর সবগুলো বসন্ত একসঙ্গে আক্রমণ কর্‌লেও সেখানে একটি দ্রোণ-ফুলও ফুট্‌বে না। সব জিনিষই তিনি যুক্তি দিয়ে মেপে বিজ্ঞান দিয়ে ওজন করে' দেখেন; ইস্কুলে থাক্‌তে যেমন করে' ইউক্লিড্‌-এর থিয়োরেম্‌ বুঝ্‌তেন, এখন শেলির কবিতাও তেমনি করে'ই বোঝেন বোধ হয়। প্রত্যেকটি লাইন্‌-এর ব্যাখ্যা করে'-করে' চলেন, তারপর জোড়া দিয়ে সবটার অর্থোদ্ধার করেন। মতামত তাঁর যতই অদ্ভুত হোক্‌, তা'তে আসে যায় না, কিন্তু এই অতিরিক্ত যৌক্তিকতা এ-দেশে বিরল বলেই আমার কাছে তা বিস্বাদ লাগে নি। তা ছাড়া, সময় কাটাবার জন্যে তবু যা হোক্‌ কস্‌রৎ কর্‌তে হয় না;—এবং আমার বর্ত্তমান অবস্থায় সেটা কম কথা নয়। তাই তাঁকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বল্‌লুম, "সময় পেলে মাঝে-মাঝে আস্‌বেন।"

:

সেই থেকে শঙ্করবাবু মাঝে-মাঝে আস্‌তে লাগ্‌লেন। মুখে তিনি যাই বলুন, আমার কবিখ্যাতির প্রতি গোপনে তাঁর মনে যে যথেষ্ট শ্রদ্ধা

ছিলো, তা আমি টের পেয়েছিলাম। এবং ফলে আমার মুস্কিল হয়েছিলো এই যে, তাঁর কাছে সব সময় কবি সেজে থাক্‌তে হ'ত; বড় বড বিষয় নিয়ে কথা—শেইক্‌স্‌পীয়ারের ট্র্যাজিডি, প্লেটোর আইডিয়েলিজম্ বা মেবেডিথেব উপন্যাস। তাঁব অগাধ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চল্‌তে আমাব সামান্য বিদ্যা প্রায়ই হাঁপিয়ে উঠ্‌তো; ইচ্ছে হ'ত মেয়াবি পিক্‌ফোর্ডেব চুল, ওয়াল্‌ফোর্ডের বাস্ বা ফোর্ডেব সম্পত্তি নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা কবি, কিন্তু সাহস হ'ত না। নারীজাতি সম্বন্ধে ছিলো তাঁব অসীম ঔদাসীন্য;—তা'দেরকে বিয়ে করতে হয়, এ ছাডা মেয়েদেব আব-কোনো সার্থকতা তিনি মান্‌তেন না; এবং যে-সব লোক ষোলো বছব বয়েস হওয়া মাত্রই শাডির আঁচলের পেছনে ছুটে'-ছুটে' হায়রান্ হ'য়ে পড়ে, তাদের প্রতি ছিলো তাঁর করুণাব একশেষ। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি নিজেও প্রায় সেই শ্রেণীবই অন্তর্ভুক্ত; তাই তাঁর তীব্র, নির্ম্মম দৃষ্টির সাম্‌নে আমি বেশ একটু নার্ভাস্ হ'য়ে পড্‌তাম।

সেই সময়ে আমাব সঙ্গহীনতাব কষ্ট লাঘব কব্‌বাব জন্য পিতৃ-দেবতা প্রসন্নচিত্তে আমাব মণি-ব্যাগ্‌টা বেশ ভারি কবে' ভবে' দিচ্ছিলেন; তারপর মাসখানেক যেতে-না-যেতে ঘাড়ে এসে জুট্‌লেন উপদেবতা। তখন গরমের ছুটী আবম্ভ হ'ল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভোনা ঢাকাব ইডেন্-বোর্ডিং থেকে বেবিয়ে সটান্ কল্‌কাতায় এসে উপস্থিত হ'ল। ভোনা-সম্বন্ধে কে-কি-কেন ইত্যাদি প্রশ্নেব জবাব দিতে আমি বাধ্য নই; আসল কথা এই যে ভোনা প্রায়ই সময়ে-অসময়ে—বোধ হয় আমার শোচনীয় অবস্থা দেখে কৃপাবতী হ'য়েই—তার হাসিতে, কথায়, অকাবণ কৌতূহলে, মিষ্টি দুষ্টুমিতে প্রজাপতি-চঞ্চলতায় আমার "শূন্য মন্দির" এমন ভাবে ঠেসে তুল্‌তে লাগ্‌লো যে একটা সম্পূর্ণ বাড়িতে রাজত্ববিস্তার করে'ও আমি

"ঘরের টানাটানি" অনুভব করতে লাগলাম। একশো বারো ডিগ্রী উত্তাপ সত্ত্বেও কলকাতা হঠাৎ মধুর হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল শঙ্করচন্দ্র মিত্রকে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে বসে' পৃথিবীর গুরুতর সমস্যাগুলির সমাধান করবার অবসর যে আর আমার নেই, এ-কথা তিনি নিজে কখনও বুঝবেন না, তাই তাঁকে বোঝানোও অসম্ভব। তিনি তাঁর মগজে কখনো হেগেল্, কখনো অ্যারিস্টটল্ ভরে' নিয়মিত-রূপে আমার গৃহে গতায়াত করতে লাগলেন; গলবস্ত্র হ'য়ে তাঁকে বলতে পারলাম না যে, এ-কুলায়ে দু'টির বেশী প্রাণী কুলায় না। অন্য কেউ হ'লে কথা ছিলো না,—তা'কেও দলে টেনে নিয়ে চিরন্তন মুখোমুখিত্বের একঘেঁয়েমি থেকে বাঁচা যেত, কিন্তু শঙ্করবাবুর সম্বন্ধে সে-কথা কল্পনা করতেই আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে জল হ'য়ে গেলো। তাই সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে যথাসাধ্য উৎসাহ প্রদর্শন করে' আমি কোনোক্রমে প্রাণ ও মান দুই-ই বাঁচিয়ে চলতে লাগলুম।

অথচ ব্যাপারটা যে শঙ্করবাবুর দৃষ্টি এড়ায় নি, তা'রো পরিচয় পেলুম; কারণ একদিন তিনি কথায়-কথায় বলে' বসলেন, 'আপনার কাছে প্রায়ই এক মহিলাকে আসতে দেখি; তিনি কে?"

আমতা-আমতা করে' জবাব দিলুম, "আমার এক দূর সম্পর্কের বোন্। একা আছি—দেখা-শোনা করতে আসে।"

শঙ্করবাবু ঠোঁট কামড়ালেন। মানে, "হুঁ, সব বুঝি।" কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তেই যখন স্পেন্সার্-এর সঙ্গে কীট্স্-এর জ্ঞাতিত্বনির্ণয় করতে আরম্ভ করলেন, আমি মনে-মনে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলুম। মনে হ'ল, আমি যেন ছোট একটি ছেলে, মাষ্টারের কাছে পড়া দিতে গিয়ে একটা বাজে কথা বলে' ফেলার জন্য ধমক খেলাম।

আরো কিছুদিন পর দেখলাম, শঙ্করবাবু নিজকে আমার গার্ডিয়ানের

পদে প্রতিষ্ঠিত করে' আমার প্রতি অযাচিত দয়া প্রকাশ করেছেন। আমি কখন কি করি এবং না করি; রাত্রিরে আদৌ বাড়ি ফিরি কিনা, ফির্‌লেও কখন; ভোনা কবে, কখন এলো এবং গেলো—এই সব খবর রাখা তিনি জীবনের অন্যতম কর্তব্য করে' নিলেন। ভোনার সঙ্গে তাঁর ভালোমত দেখাশোনা হ'লে বোধ হয় আমার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তিনি নিজকে এতখানি অসুস্থ করে তুল্‌তেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-অসম্ভব কথনো সম্ভব হয় নি। একদিন শুধু তিনি দৈবাৎ আমার ঘরে ঢুকে' ভোনাকে দেখেছেন কি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে' একেবারে তাঁর তেতলার ঘরে গিয়ে তবে বোধ হয় শ্বাস ছাড়েন। আমি তাঁর অনুসরণ করে' বাইরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ডাকাডাকি কর্‌লাম, কিন্তু সে-দিন দূরের কথা, তার তিনদিনের মধ্যেও তাঁর দেখা পাই নি। একবার খোঁজ নিতে গিয়ে জান্‌লাম, তাঁর শরীর খারাপ।

চতুর্থ দিন তিনি এসে উপস্থিত। এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, "কাল রাত্তিরে আপনি বাড়ি ছিলেন না বুঝি।"

রোগশয্যায় শুয়ে'ও এ-সমাচার তিনি কী করে' অবগত হ'লেন, ভেবে অবাক্ হলাম। ক্ষীণস্বরে বল্‌লাম, "না; ভোনাকে—মানে আমার সেই cousin-কে নিয়ে থিয়েটারে যেতে হয়েছিলো কিনা; ওকে বাড়ি পর্য্যন্ত এস্‌কর্ট কর্‌তে হ'ল। তারপর অত রাত্তিরে আর ফেরা হয় নি।"

শঙ্করবাবু বোধ হয় বাড়ি থেকে তৈরী হ'য়ে এসেছিলেন, আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তে তিনি অনর্গল বলে' যেতে লাগ্‌লেন, "হুঁ। এমন করে'ই জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান সময় আপনি অপচয় কর্‌ছেন। আপনার এখন উচিত, অন্য সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে নীরবে বসে' একাগ্র-চিত্তে সাধনা করা—অর্থাৎ সাহিত্য-সৃষ্টির বিরাট দায়িত্বের জন্য নিজকে উপযুক্ত করে' গড়ে'-তোলা। আপনার এ-বয়েসে লেখাও উচিত নয়—

এখন শুধু চর্চ্চা, শুধু অনুশীলন, একটি মহান্ আদর্শকে অবলম্বন করে' যৌবনের সকল উচ্ছৃঙ্খলতার প্রগাঢ় অভিনিবেশ। তারপর মাথার চুল এবং বুদ্ধি যখন পাক্তে আরম্ভ কর্বে, মন থেকে সমস্ত ফেনা কেটে গিয়ে যখন তা মুক্তার মত দৃঢ় ও নির্ম্মল হ'য়ে উঠ্বে—তখনই সত্যিকারের বড় সাহিত্য সৃষ্টি কর্তে পার্বেন, তা'র আ'.গ—এখন যা-ই মনে করুন্ না—কোনো রচনাই আপনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে এক আসনে বসাতে পার্বে না, জান্বেন।"

বল্লুম, "কিন্তু অতখানি উচ্চাভিলাষ তো আমার নেই। ক্ষীণজীবী বাঙ্গালীর ছেলে—জীবনটাকে সুখেদুঃখে কোনোমতে কাটিয়ে দিতে পার্লেই বাঁচি। তা ছাড়া, আপনার মতে পৃথিবীতে তিনজনের বেশি শ্রেষ্ঠ কবি হয়-তো এ-পর্য্যন্ত জন্মান্ নি, তাঁদের মধ্যে গণ্য হ'তে না পার্লে সেই দুঃখে আমার ভূত আত্মহত্যা করবে না।"

"কিন্তু সে-উচ্চাভিলাষই বা আপনার থাক্‌বে না কেন? এই নিষ্ঠার অভাব এ-বয়েসে আপনাকে সাজে না। দেখুন্, আপনাকে যে এ-সব বল্‌ছি, তা হয় তো আমার পক্ষে intrusion হচ্ছে, কিন্তু আপনি তো একজন সাধারণ লোক নন্—তা হ'লে আপনাকে নিয়ে কেউ এত মাথা ঘামাতো না। আপনি হচ্ছেন সাহিত্যিক—দেশের সব লোকের আপনার ওপর সমান অধিকার। তাই এ-ক্ষেত্রে intrude করাই আমার কর্ত্তব্য। ছি-ছি—কী ছেলেমানুষি-ই যে কর্‌ছেন!"

গলিতে একটা গাড়ির শব্দে সচকিত হ'য়ে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। আমিও সচকিত হ'তে যাচ্ছিলাম—কিন্তু ভোনা তো কখনো ছ্যাক্‌রা গাড়িতে আসে না!—"ওকি? এখনি উঠ্‌ছেন?"

শঙ্করবাবু বল্লেন, "হ্যাঁ, একটু দরকার আছে;—বাড়িতে লোক এলো।"

ছেলেমানুষি

সকালের চা-রুটির সঙ্গে খানিকটা নিষ্ফল রোষ পেটের মধ্যে হজম কর্‌তে-কর্‌তে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। শঙ্করবাবুদের বাড়ির দরজায় একটি ভাড়াটে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে; এক স্থূলাকৃতি ভদ্রলোক তাঁর স্থূলতরা স্ত্রী, বছর তেরোর একটি লাল ফুলহাতা জ্যাকেট্ এবং কাঁচের চুড়ি পরিহিতা মেয়ে এবং গোটাকতক ফাউ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে গাড়ি থেকে অবতরণ করলেন। শঙ্করবাবু, দেখ্‌লাম, তাঁদেবি অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। এমন কি, রঙ্-উঠে'-যাওয়া একটি টিনের তোবঙ্গ তিনি নিজ হাতেই গাড়ি থেকে নামালেন। এঁরা যে সদ্য পাড়া-গাঁ থেকে আস্‌ছেন, তা মেয়েটির লাল জ্যাকেট্ ও ফ্যাল্‌ফেলে চাউনি আমাকে বেশ ভালো করেই বুঝ্‌তে দিলে। পবে ঐ মেয়ে আমার জীবনকে প্রায় দুর্বিসহ করে' তুলেছিলো। যখনি বারান্দায় যেতুম, দেখ্‌তুম উল্‌টো দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে হাঁ করে' তাকিয়ে আছে—চাই কি আমার দিকেই কয়েকটা তীব্র কটাক্ষ পটাপট্ হেনে বস্‌লো। মেয়েটিকে কুৎসিত বলা চলে না, তা'র মুখ বিধাতা হয় তো সুন্দর ক'রে গড়্‌বেন বলে'ই ভেবেছিলেন। কিন্তু অশিক্ষিত লোকদেব যেমন হ'য়ে থাকে—সে-মুখ শাদা কাগজের মত একেবারে লেপাপোঁছা, তা'তে কোনো ভাষা নেই। একটা নিষ্প্রাণ, নির্বোধ মুখের ওপব একজোড়া অর্থহীন ড্যাব্‌ডেবে চোখ না দেখে কেউ যদি তা'র নিজের বাড়ির বারান্দাতেও না আস্‌তে পারে তো তা'তে এই প্রমাণ হয় যে, আসলে জীবনটাকে আমরা যত ভাবি, তত সুখের তা নয়। তা'র ওপর গ্রীষ্মের আধিক্যবশতই বোধ হয়, মেয়েটির বসনে বাহুল্য তো ছিলোই না, বরং মাঝে-মাঝে অতিরিক্ত কার্পণ্য লক্ষ্য করেছি। শেষে রাগ করে' বারান্দায় আসা একদম ছেড়ে দিলাম, এবং তোনার কথা ভেবে বারান্দার দরজায় একটা পর্দাও খাটিয়ে নিলাম।

ছেলেমানুষি

এর পর ভোনার প্রায় অবিচ্ছিন্ন সাহচর্যে আমি সমস্ত বহির্জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হ'য়ে ছিলুম ;—এমন কি শঙ্করবাবুর দেখা যে অনেকদিন মিল্‌ছে না, সে কথা ভাব্‌বারও অবসর হয় নি। মাঝে ক'দিন কেটে গেলো, তা-ও ঠিক বল্‌তে পারবো না, দশ-বারো দিনও হ'তে পারে —মাসখানেক হওয়াও অসম্ভব নয়। একদিন হঠাৎ ও-বাড়ির কলরব এমন বেশিমাত্রায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো যে আমার নির্লিপ্ততা বজায় রাখা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। ঠাকুরের মারফত খবর পেলুম যে ও-বাড়ির বাবুর যে-খুড়্‌তুতো ভাই সেদিন দেশ থেকে এসেছেন, অবিলম্বে তাঁরি কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হ'তে চলেছে ;—তাই এই ডামাডোল্‌। আমার কালা চাকরটা পর্যন্ত বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। হ'বে আবার না? বল্‌তেই গলে—বিয়ে-বাড়ি।

জীবনটা যে গোলাপ-শয্যা নয়, প্রাচীনদের এই বাণীর আর-একটা প্রমাণ হাতে-হাতে পেয়ে চমৎকৃত হ'লুম। নইলে কারুর বাড়ির উল্‌টো দিকে কখনো কোনো বিয়ে হয়! ভাব্‌লাম, এই বেলা সরে' পড়ি ; কিন্তু বাবার উপদেশ মনে পড়্‌লো—বিংশ শতাব্দীতে ভৃত্য বা পুত্রের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই হৃদয়কে ইস্পাত দিয়ে মুড়ে' ভগবৎ-প্রেরিত এই মহতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রইলাম। মনে-মনে ভেবে একটু খুশি হ'লাম যে, এতদিনে ঐ ত্রয়োদশবর্ষীয়ার একটা সুরাহা হ'ল, এবং এর পর থেকে আমার বারান্দার গতিবিধি আবার অবাধে চালাতে পার্‌বো।

ছেলেমানুষি

বিয়ের দিন নিমন্ত্রণ-রক্ষার বিভীষিকা থেকে ত্রাণ পাবার জন্য আমি নিজকে জ্বরাক্রান্ত বলে' ঘোষণা করলাম, এবং ওরা যা'তে এসে উৎপাত করতে না পারে, সে-জন্য সত্যি-সত্যি শয্যাগ্রহণ করলাম। সারাটা দিন জ্বরের ঘোরেই কাটলো। বাজনা, উলু ও নানারকম চ্যাঁচামেচির শব্দে, সস্তা ঘি আর গরম-মশলার গন্ধে, কাক-কুকুরের কর্কশ কলহে, অনবরত গাড়ি ও ট্যাক্সি আসা-যাওয়ার আওয়াজে আমার শুধু পাগল হ'য়ে যেতে বাকি থাকলো। সে-সময়ে আমার মুনিতুল্য সহ্যশক্তি দেখলে আপনারাও অবাক্ হ'তেন। সেদিন ভোনা পর্য্যন্ত একটিবার এলো না—অবিশ্যি না এসে ভালোই করেছিলো।

রাত্তিরে হঠাৎ একটু বিরাম দেখা গেলো; বিয়ে বেশি রাতে—ঠাকুর বললে, বর আনতে যাওয়া হয়েছে, তাই কন্যাপক্ষ এখন কিঞ্চিৎ নিস্তেজ। মহানন্দে বিছ্না থেকে উঠে' একটা গল্পের বই খুলে' বসেছি—সহসা শঙ্করবাবু সশরীরে এসে হাজির। ত্রস্ত হ'য়ে বিছ্না থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে ঐ গরমে গায়ে জড়িয়ে নির্জীব কণ্ঠে বললুম, "জ্বরটা এতক্ষণে ছাড়লো বোধ হয়। বসুন্। আপনি এ-সময়ে? বাড়িতে কাজ নেই কোনো?"

শঙ্করবাবু উপবেশন করে' অত্যন্ত শুষ্ককণ্ঠে বললেন, "না।"

খানিকক্ষণ নীরবে কাটলো। বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে' না পেয়ে আমি ছটফট করতে লাগলুম। মনে হ'ল, চীনেদের কোনো নির্ব্বিকার দেবমূর্ত্তির সাম্নে আমাকে হাত-পা বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু শঙ্করবাবুই শেষে কথা বললেন, "আচ্ছা অরবিন্দবাবু, আপনি প্রেমে বিশ্বাস করেন?"

থ' হ'য়ে গেলুম। আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে, এ-

প্রশ্নের উত্তরে হাঁ-না বলা মুস্কিল, কেননা, এ-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। তাই পাল্টা প্রশ্ন করলুম, "কেন বলুন্ তো?"

"না, এম্নি। আজকালকার দিনে আপনারা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে love at first sight হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু আসলে প্রকৃত প্রেম শুধু first sight-এই জন্মায়। বিজ্ঞানের জ্ঞান অসীম, কিন্তু অসীমেরও একটা সীমা আছে।"

সেই পুরোনো তর্ক। অসতর্কভাবে বলে' ফেল্‌লুম, "ওটা হচ্ছে আপনার মধ্যযুগের কথা। যে-সময়ে মেয়েদের মানুষের বদলে শিভ্যল্‌রি ফলাবার একটা উপলক্ষ্যমাত্র বলে' বিবেচনা করা হ'ত, সে-সময়ে চারি-চক্ষে মিলন হওয়ামাত্র মূর্চ্ছা ও পতন সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু আজকালকার দিনে এ একেবারে অচল।"

"কি করে' বলেন? জানেন, রসেটি—কবি ও শিল্পী রসেটি—এই ধরণের দৈব প্রেমে বিশ্বাস করতেন। তাঁর ধারণা ছিলো যে তাঁর আত্মার আত্মীয়কে তিনি দর্শনমাত্রেই চিনে' নিতে পারবেন, এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়েই তাঁর মত লোক এক লেখা-পড়া না-জানা shop-girl-কে বিয়ে করেন। পরে তাঁর স্ত্রী দৈবক্রমে খানিকটা লডেনাম্ খেয়ে ফেলে মারা যায়, এবং রসেটি শোকাতুর হ'য়ে তাঁর সকল অপ্রকাশিত কবিতা মানসী-স্ত্রীর দেহের সঙ্গে কবরে দেন্।"

হেসে বল্‌লুম, "চমৎকার গল্প, কিন্তু একটু ভুল বলা হয়েছে। প্রথমত, রসেটি ঐ shop-girl-কে বিয়ে করেন তা'র চমৎকার লাল চুল দেখে; প্রি-র‍্যাফেলাইট্ আর্টিস্‌ট্‌দের মধ্যে লাল চুলটা ছিলো ফ্যাশন্ এবং সেই মেয়ে বিয়ের পর তখনকার দিনের অনেক চিত্রকরের কাছেই মডেল্ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিয়ের পর রসেটি তাঁর অশিক্ষিতা স্ত্রীকে এক ইস্কুলে পাঠান্, এবং ইত্যবসরে তাঁর প্রাক্-বিবাহযুগের প্রিয়া

পুনরাবির্ভূতা হন্—তখন মিসেস্ উইলিয়াম্ মরিস্। সঙ্গে-সঙ্গে রসেটি উপলব্ধি করেন যে তাঁর জীবনের প্রকাণ্ডতম মূর্খামি হয়েছে বিয়ে-করাটা; —তাঁর স্ত্রী ইস্কুল থেকে ফিরে' এসেই স্বামীর মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন টের পায় এবং কিছুকাল পরে সেই দুঃখেই লডেনাম্ খেয়ে আত্মহত্যা করে। সেই শেলি-হ্যারিয়েট-মেয়ারি ব্যাপাব আর কি! রসেটি ঝোঁকের মাথায় তাঁর কবিতার খাতাগুলো তখনকার মত স্ত্রীর কবরে চালান্ দিলেও যোলো না কত বছর পরে চার্চ্চের বিশেষ অনুমতি নিয়ে কবরের মাটি খুঁড়ে' সেগুলোর যে পুনরুদ্ধার সাধন কবেন, তা আপনিও জানেন; নইলে আজকালকার দিনে রসেটিকে কেউ কবি বলে' জান্তো না।"

আমার কথা শুনে' শঙ্করবাবু, যেন শারীরিক কষ্ট পেলেন, এম্নি মুখ-বিকৃতি কর্লেন।—"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আপনি জানেন না? হল্ কেইন্-এব বই বেবিয়েছে—হল্ কেইন্ রসেটিব অন্তবঙ্গ বন্ধু ছিলেন।"

শঙ্করবাবুব একটা মস্ত গুণ এই যে, fact-কে তিনি কখনো অস্বীকার করেন না। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রসেটির প্রেমেব মহান আদর্শ-সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন কর্তে তিনি বাধ্য হ'লেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি, সকল যুক্তিব মধ্যে যেটি ব্রহ্মাস্ত্র, সেইটি প্রয়োগ কর্লেন, "কিন্তু রসেটি ভুল করেছিলেন বলে'ই তো প্রমাণ হয় না যে প্রথম দর্শনে প্রেম জিনিষটাই মিথ্যা। এ যে কত বড় সত্য তা আমি নিজে অনুভব কর্ছি।" বল্তে-বল্তে শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বব ভেঙে এলো;—এই প্রথম!

শুনে' আমার মনে হ'তে লাগ্লো যে সত্যি আমার একশো-পাঁচ ডিগ্রী জ্বর হয়েছে, এবং সেই জ্বরের ঘোরে আমি এই-সব আবোল্-তাবোল্ দেখ্ছি ও শুন্ছি। আসলে হয়-তো শঙ্করবাবু আসেনই নি।

চোখ দু'টোকে ঘষে' লাল করে' ফেললুম—না উনি ঠিকই বসে' আছেন, সশরীরে, জ্যান্ত!—বাঁ হাতের নখ দিয়ে টেবিলের বনাত খুঁট্‌ছেন। চেঁচিয়ে বল্‌তে ইচ্ছে হ'ল, "ভগবান, এ কী পরীক্ষায় আমায় ফেল্‌লে?" কিন্তু সব-কিছু নিয়েই ফাজ্‌লেমি করার অভ্যেসই যে আমার কাল হ'বে সে-শিক্ষা পেতে আমার তখনো বাকি ছিলো; তাই ফস্ করে' মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, "তাই নাকি? সুখবর। কে সেই সৌভাগ্যবতী?"

যেন সারাজীবন সর্দ্দিতে ভুগ্‌ছেন, সেই রকম অস্বাভাবিক ভাঙা ও বিকৃত কণ্ঠে শঙ্করবাবু বলে উঠ্‌লেন "আজকে তা'র বিয়ে হচ্ছে।"

বল্‌তে-বল্‌তে শঙ্করবাবুর সমস্ত গা যেন মোচড় দিয়ে কেঁপে উঠ্‌লো। টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে তার মধ্যে মাথা গুঁজে' শঙ্করবাবু—আপনারা শুনে' হয়-তো বিশ্বাস কর্‌বেন না, কিন্তু সত্যি!—সেই শঙ্করবাবু, শঙ্কর-চন্দ্র মিত্র, মা-র সঙ্গে থিয়েটার দেখ্‌তে যেতে-না-পারা অভিমানিত শিশুর মত ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন।

একবার মনে হ'ল, বলি—"ছি-ছি—কী ছেলেমানুষি-ই যে কর্‌ছেন!" কিন্তু আপনারাই বলুন, সেটা কি আমার উচিত হ'ত?

বোন্

বোন্‌

কেমন করে' নৈনিতাল যাবার পথে এক ইষ্টিশানে একব্যাটা গোরা তাঁর কাম্‌রার জান্‌লায় উঁকি মেরেছিলো—তিনি প্রায় চীৎকার করে' উঠ্‌ছিলেন আর কি! এমন সময় কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে 'মিস্‌টারে'র আবির্ভাব;—রাঙামুখো কুত্তাটাকে দেখেই তাঁরো মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো—কর্‌লেন কী, একটুক্‌রো লেবুর খোসা নিয়ে পেছন থেকে দিলেন ব্যাটার চোখে ছিটিয়ে। চোখ কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে সায়েবমশাই 'আ'ম্‌ ভে-এ-রি সরি' বলে' আর কূল পায় না। তারপর কেমন করে' দু'জনায় খুব ভাব হ'য়ে গেলো, সায়েবটা সেই কাম্‌রাতেই উঠ্‌লো—সারাক্ষণ দু'জনে কী গপ্‌প, আর হাসাহাসি! সায়েব নাম্‌বার সময় 'মিস্‌টারে'র সৌজন্য ও ইংরিজি উচ্চারণের কী বলে' তারিফ করেছিলো—ছোড়্‌-দি এই-সব গল্প কর্‌ছিলেন, বা অমলা কর্‌ছিলো। আর তা'কে ঘিরে' গোল হ'য়ে বসে' শুন্‌ছিলেন মা আর পিসীমা, শুন্‌ছিলো ডলু, খুকু, পারুল, কমল, আর—লিলি।

হ্যাঁ, লিলিও শুন্‌ছিলো বই কি! যদিও এ-গল্প সে এর আগে উনিশবার শুনেছে, তবু। কিন্তু কানে শুন্‌লে কি আর চোখে দেখা যায় না? তাই তো ঘড়ির কাঁটা সাতটা বাজো-বাজো হ'তেই খুকু ভ্যাঁ করে' এক চীৎকার দিয়ে উঠ্‌লো।

বাধা পড়্‌লো গল্পয়—নিশ্বাস নেবার জন্যেও ছোড়্‌-দির একটু থাম্‌বার দরকার ছিলো।

—কী? কী হ'ল?

—ডলুটা আমায় চিম্‌টি কেটেছে মা—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

কে বা কানে তোলে ডলুর প্রতিবাদ! মা ডলুকে ধম্‌কালেন—দোষ করে' আবার মিথ্যে-কথা বলা হচ্ছে! চুপ করে' থাক্‌, নইলে খাবি থাপ্পড়।

ছোড়্-দি কাঁধ-ঝাকুনি দিয়ে বল্লেন, ইস্‌স্—ছেলেপিলের কান্না! থাম্ না রে খুকু।

লিলি কিন্তু আদর্শ-দিদি! চট্ করে' খুকুকে কোলে তুলে' নিয়ে বল্লে—চল্ তোকে খাইয়ে আনি। ডিম-ভাজা খাবি নে—ডিম-ভাজা? ডলু আজ ডিম পাবে না—ওর ভাগেবটা তোর।

খুকুকে নাচাতে-নাচাতে লিলি নেবে গেলো। অমলা সুরু কর্‌লে—বুঝ্‌লে মা, তারপর—

রান্না না হ'য়ে থাক্‌লে লিলি আব কী বর্‌বে?—যত দোষ ঐ বামেব মা-র! জানে, সন্ধ্যে হ'লেই ছেলেপিলেদেব ঘুম পায়, তবু একদিনো যদি তা'র রান্না হয়। নাঃ—!

নিতান্তই চটে' গিয়ে খুকুকে নিয়ে সে বাইরের ঘবে গেলো। সাতটা-পাঁচ। জান্‌লাগুলি ও পাখাটা খুলে', দিয়ে সে টেবিলেব ধারে বসে' পড়্‌লো। দরজাটা বন্ধই থাক্‌লো।

খবরের কাগজ।·· খুকুব কান্না ততক্ষণে থেমে গিয়েছিলো—সে ওপরে মা-র কাছে ফিরে' যাবার জন্যে দিদির কোল থেকে পালাই-পালাই কর্‌ছিলো। লিলি আদর্শ-দিদি কিনা—কিছুতেই ওকে যেতে দেবে না—গেলেই পড়্‌বে ঘুমিয়ে, তারপর খাওয়া নিয়ে ভজকট! কিন্তু অবোধ খুকু কি আর সে-কথা বোঝে!

সাতটা-বারো।·· অগত্যা সেই কী-ছাই কাগজটাকেই খুল্‌তে হ'ল—খুকুকে পোষ মানাবার জন্যে। ছবি দেখ্‌তে পেয়ে খুকু মহাখুসি! 'ওটা কী, লিলি-দি? এলোপ্লেন্? এই দাড়ি-ওলা লোকটা হাস্‌ছে কেন?

বাঃ, কী সুন্দর এই কুকুরটা!'...সওয়া-সাত। কোনো-কোনো লোকের ওপর লিলির এমন রাগ হয়—বিশেষ করে' তা'দের ওপর, কথা দিয়ে যা'রা কথা রাখে না। অথচ সেদিন হাস্নাহানাদের বাড়ি থেকে ফির্তে একটু দেরি হয়েছিলো—ওরা কিছুতেই ছাড়ে না—কী বলে'ই বা হঠাৎ চলে' আসা যায়?—এ-সব কথা কি আর কেউ বোঝে?—সেই নিয়ে কত—

দর্জায় খুট্ করে' একটু শব্দ হ'ল। হঠাৎ খুকুর কৌতূহল-নিবারণে আদর্শ-দিদির বিপুল আগ্রহ দেখা গেলো।—'হ্যাঁ, এইটে হচ্ছে এরোপ্লেন্। এই যে পাখার মত দুটো দেখ্ছিস্, এ দুটো চালিয়ে আকাশে ওড়ে—ঘণ্টায় এক্শো মাইল্—

—মোটে এক্শো! আমি হ'লে তো ছাব্বিশ হাজার মাইল্ (আবার খুট্!) উড়ে' যেতাম ভোঁ করে'।

—দূর্ বোকা! লিলি উঠে' দর্জাটার খিল্ খুলে' দিয়ে নীরবে আবার এসে বস্লো।—আর ভেতরে ছোট্ট ঘরের মত আছে—সেখানে বস্বার জায়গা—

এইবার ঘা পড়্লো জোরে—দর্জাও খুলে' গেলো।

—চার্দিক অবিশ্যি কাচ দিয়ে ঢাকা—নইলে হাওয়ায়—

—দ্যাখো লিলি-দি, পির্টি-দা এসেছেন—পির্টি-দা!

পির্টি বা প্রিটি—নামটা আসলে প্রীতীশ—মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস্ কর্লে, দরজাটা খোলাই ছিলো নাকি?

খুকু অবাধে বলে' যেতে লাগ্লো, না, পির্টি-দা—লিলি-দি এইমাত্র উঠে'—

—হ্যাহ্—এইমাত্র উঠে! তুই দেখেছিলি! চুপ থাক্, ফাজিল মেয়ে।

খুকু ঘাব্ড়াবার পাত্র নয়। তবু আস্তে আস্তে বল্‌তে আরম্ভ করলো, হ্যাঁ, সত্যি—

প্রিটি খুকুর চেয়েও আস্তে বল্‌লে, কী হয়েছে তোমার ?

—হবে আবার কী ? সে—ই কখন্ থেকে—। যাও, এখন আর কী হয়েছে জিজ্ঞেস্ করতে হ'বে না।

ও, এই ! প্রিটি এতক্ষণে সহজ ভাবে নিশ্বাস টান্‌তে পার্‌লে। এতক্ষণ তা'র ভয় হচ্ছিলো, বুঝি তা'র সেই চিঠিটা—যাক্।

—আমি বুঝি ইচ্ছে করে' দেরি করেছি ? পথে আস্‌তে-আস্‌তে বাস্‌টার—

—য়্যাক্‌সিডেণ্ট্ ! লিলির গলা কেঁপে গেলো।

—বাস্‌টার টায়ার গেলো ফেটে। সারাতে পুরো পনেরো মিনিট্। যা-তা !

—কল্‌কেতা শহরে ওই একখানা বাস্‌ই চল্‌ছে নাকি আজকাল ?

প্রিটি চুপ করে' রইলো।

—না-হয় ফের্‌বার সময় আমার কাছ থেকেই দু'আনা নিতে—ধার। কাল আমি ঠিক ফেরৎ নিতাম—পয়সার প্রতি আমার বেজায় লোভ কিনা !

প্রিটি তবু নিরুত্তর।

—না হয় হেঁটেই ফির্‌তে একদিন—

—আজ তা-ই যাবো।

—কেন, শুনি ! তারপর গলার আওয়াজে স্বাভাবিকতা আন্‌বার চেষ্টা করে' বল্‌লে, আমার বাক্সয় প্রায় দশ টাকা জমেছে।···তুমি নেবে না ? এম্‌নি করে' তোমার হাতে যদি গুঁজে দিই—তবু নেবে না ?

এর পর এরা পরস্পরের হাত নিয়ে যে কাণ্ডটা কর্‌তে লাগ্‌লো,

ভাগ্যিস্ খুকু ছাড়া আর কেউ তা দেখে নি। নইলে সবাই বল্‌তো, কী ছেলেমানুষি!

এমন-একটা কী দোষই বা ওর—একদিন না-হয় পনেরো মিনিট্ দেরিই করে' ফেলেছে—তা পনেরোই তো মিনিট্! আর, ইচ্ছে করে' তো আর করে নি! বাস্-এর টায়ার্ ফাট্‌লে কা'র দোষ? পকেটে আর পয়সা না থাক্‌লে দোষ কা'র? তা ছাড়া, দোষ করে' ফেলেছে বলে' বেচারার করুণ মুখ দেখ্‌লে দয়াও হয়;—লিলির কেন—কা'রই বা না হয়? অনেকের হয়-তো না-ও হ'তে পারে, কিন্তু লিলি তা'দের মত নয়; লিলি ক্ষমাশীল, লিলি মহানুভব, অল্পতেই ওর করুণা হয়, বড় সহজেই ক্ষমা করে' ফেলে। তাই,—

আচ্ছা, এইবার তোমাকে ক্ষমা কর্‌লুম। এখন বস্‌তে পারো—হঠাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে লিলি বল্‌লে। তারপর খুকুকে কোলের কাছে টেনে আদর কর্‌তে-কর্‌তে—দেখ্‌লে, আমার মন কেমন উদার! একটু ঝগ্‌ড়াও কর্‌লুম না!

—ভারি তো! আমি বুঝি একবার ক্ষমা করি নি—এর চেয়ে অনেক গুরুতর অপরাধ?

—ওমা, কবে আবার—! লিলি অবাক্।

মেয়েরা সুবিধেমত নানান্ কথাই ভুলে' যায়—বিশেষ করে' যে-সব কথা অন্যের মুখে শুন্‌তে তা'দের ভালো লাগে। প্রিটি তা জানে, তাই সে বিস্তৃত বর্ণনা সুরু কর্‌লে:

—সেই যে একবার একমাস ধরে' কালাজ্বরে ভুগ্‌লাম—একবার

দেখ্‌তে যাওয়া হয়েছিলো? হ্যাঁ, ছোট ভাইকে রোজ পাঠানো হ'ত বটে—কখনো চিঠি দিয়ে, কখনো এম্‌নি—কিন্তু না-ও তো বাঁচ্‌তে পার্‌তাম! আমার যে-মেশোমশাই বছরে শুধু একবার—বিজয়া দশমীর দিনে—আমাদের বাড়ি আসেন, তিনিও তিন দিন এসেছিলেন—এমন কি, পাশের বাড়ির গিন্নী একবার খোঁজ নিইয়েছিলেন;—রোজই ভাব্‌তাম—ভাব্‌তাম, মানুষ মরে' গেলে তো আর চোখে দেখ্‌তে পায় না!

—হ্যাঁ, অমন দূর থেকে দোষ দিতে সবাই পারে! যা'রা জানে না, বাঙালী মেয়েদের কত অসুবিধে, তা'রাই কিনা—

—চুপ্! চুপ্! এখন তোমার এ-পার্ট নয়। বোসো, সবি আস্‌ছে। ···প্রথম ইন্‌জেক্‌শ্যান্-এর পর জ্বরটা যেদিন একটু কম্‌লো, প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম—আর নয়। মনে পড়্‌লো শোপেন্‌হাওয়ার্, মনে পড়্‌লো এভোল্যুশনে মেয়েরা পুরুষের এক ধাপ পিছে। তৃতীয় ইন্‌জেক্‌শ্যান্-এর পর জ্বর গেলো ছেড়ে—চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌লো পৌরুষ। ভাব্‌লাম, ভালো হ'য়ে উঠে'ই একদিন গিয়ে য্যাসা বকে' আস্‌বো—। সাতদিন তালিম দিলাম—ভাত-খাওয়া অবধি। ভাত খেলাম;—কত যে প্রার্থনা করেছি—কবে গিয়ে মনের ঝাল ঝেড়ে আস্‌তে পার্‌বো!

—সেই যেদিন তুমি এলে—মাথায় রুমাল বাঁধা—কী কাহিল, কালো, শুক্‌নো—দেখে এমন মন-খারাপ লাগ্‌ছিলো, অথচ সেরে উঠেছো ভাব্‌তে ফূর্তিও হচ্ছিলো খুব—সে ভারি অদ্ভুত!

—সেদিন তোমার চোখে জল দেখেছিলাম—আমার সেই অনেক সাধের বকুনিগুলো কোথায় যে উড়ে' গেলো—চিহ্নও রইলো না। নিমিষে ক্ষমা করে' বস্‌লুম। সে-কথা মনেই রইলো না, বরঞ্চ হোঁচট্ খেয়ে তোমার পা যে মচ্‌কে গিয়েছিলো—

—তোমার আবার সবটাতেই বাড়াবাড়ি! ভারি না একটু—

—এ-বেলা ডাক এসেছে বে লিলি?

—এসেছে, ছোড়্-দি, কিন্তু শ্রীশবাবুর চিঠি নেই।

অমলা এগিয়ে এসে টেবিলে কনুইর ভর্ দিয়ে দাঁড়ালো।—খুকুকে খাইয়েছিস্?

—রান্নাই হয় নি তো—

—না, হয় নি! ঝমেব মা প্যানপ্যান্ করছে, শুনে' এলাম—ছেলেপিলেদেব আগে খাইয়ে নেয় না—শেষে সবাই একসঙ্গে আসে, অথচ সে তো আব দুটোব বেশি তিনটে হাত গজাতে পারে না!

—হয়েছে নাকি রান্না? যাই তবে—

—গল্প কবতে পেলে সব আকাশে বৃহস্পতি! কেন, এতক্ষণে ওকে খাইয়ে আনা যেতো না? ও যে ঝিমুচ্ছে, সেদিকেও খেয়াল নেই তোব? খালি গল্প কর্‌লেই দিন কাটে নাকি? যা শীগ্‌গির ওকে নিয়ে—পারুল কমলকেও ডেকে আন্। আমরা ছোট ছিলাম যখন—কোনো কাজেব কথা বল্‌তেও হ'ত না,—তোরা যা হচ্ছিস্—

খুকু বাস্তবিক ঝিমুচ্ছিলো, লিলি ওকে কোলে নিয়ে আস্তে-আস্তে বেবিয়ে গেলো। প্রিটি জানে যে বান্নাঘব চমৎকার জায়গা; প্রিটি জানে যে সে যদি শুধু একবাব মুখ ফুটে' বলে যে তার ক্ষিদে পেয়েছে, তা হ'লে বাকি ব্যবস্থা লিলিই কর্‌তে পাবে। কিন্তু ওদেব প্রেমের তখন সবে শৈশব, একটুও ঠাণ্ডা সয় না।

অমলা টেবিলেব ওপব তা'ব চিৎ-কবা বাঁ হাতখানা মেলে ধরে' জিজ্ঞেস্ করলে—তুমি হাত দেখ্‌তে পাবো, প্রিটি?

রসনার পরিচালনায় প্রিটির আর উৎসাহ ছিলো না; সে মাথা নেড়ে জানালে—না।

—জানো না? আমি জানি মোটামুটি। এসো তোমাকে শিখিয়ে দিই।

প্রিটি ভাব্‌ছিলো, পানের আশা যখন নেই, ট্যান্‌ট্যালাস্‌-এর মত আঠোঁট জলমগ্ন হ'য়ে থেকে লাভ কী? এইবেলা সরে'-পড়া যাক্‌। ...শ্রীশবাবু ভারি অদ্ভুত লোক কিন্তু—বৌকে নে'যাবার একটু গরজ তাঁর নেই।

অমলা তার পুরু, নরম বাঁ হাতের চেটোয় ডান্‌ হাতের বেঁটে ও মোটা একটা আঙুল চালাতে-চালাতে বল্‌তে লাগ্‌লো, এই যে খুব স্পষ্ট রেখাটা দেখ্‌ছো, হিন্দু-মতে এটা ভাগ্য-রেখা, কিন্তু আসলে এটা হার্ট্‌-লাইন্‌। ফেইট্‌-লাইন্‌ ওঠে প্রায় কব্জির কাছ থেকে ওপরের দিকে;—আমারটা মাঝ পথে এসেই হারিয়ে গেছে। দেখি তোমারটা?

প্রিটির তখন মনে পড়েছে যে পকেটে তার একটি পয়সা নেই। যা থাকে কপালে—হেঁটেই লম্বা দেবে।

প্রিটির ভাগ্য-রেখা এতই সূক্ষ্ম যে, তা আবিষ্কার কর্‌বার জন্য হাতখানাকে দুই হাত দিয়ে টান করে' ধরে' খুব নীচু হ'য়ে দেখ্‌তে হয়। প্রিটি হঠাৎ টের পেলে যে তার নাকের ঠিক নীচেই অমলার কালো মাথাটা। সে শশব্যস্তে বলে' উঠ্‌লো, আপনার নিশ্চয়ই ভারি অসুবিধে হচ্ছে! বসুন্‌ না, ছোড়্‌-দি!

—রাত্তিরে ভালোমত বোঝা যায় না। একদিন সকালবেলায় এসো, তোমার হাত দেখে সব ব'লে দেবো।

সব শুনে' কাজ নেই প্রিটির। সে জানে, হাত-দেখা বাজে, তবু তা'র কেমন ভয়-ভয় কর্‌তে লাগ্‌লো। হাতখানা তক্ষুনি সরিয়ে না

নিয়ে পারলে না—একটু অভদ্রভাবেই।···নাঃ, এই একরাজার মুল্লুক হেঁটে পাড়ি দে'য়া কি সম্ভব? আরো, যাবার সময়? আসতে সে স্বচ্ছন্দে পারতো—হেঁটে কেন, বোধ হয় এক পায়ে লাফাতে-লাফাতেও আসতে পারতো। কিন্তু—যাওয়া অন্য কথা।

অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে সে বলে' ফেললো, আমাকে দু' আনা ধার দিতে পারেন, ছোড়্-দি—আমার বাস্-এর পয়সা নেই।

অমলা সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বললে, নেই? অথচ তুমি এতদূর এসেছো? রোজই এ-রকম থাকে না নাকি?

প্রিটির কান লাল ও গরম হ'য়ে উঠ্লো। যে-ছেলে জীবনের প্রথম-প্রেমে পড়েছে, একটুতেই তা'র অপমান লাগে। সে গম্ভীরভাবে জবাব দিলে, আর কখনো এ-রকম হয় নি।

—ও কী? চট্লে না কি?—অমলা হাসতে-হাসতে প্রিটির চুলগুলো ধরে' এক নাড়া দিলে।

—পয়সা আমি তোমাকে দেবো, এক সর্ত্তে।

এ আবার কী? প্রিটির মনে হ'ল তা'রো হাসা উচিত, কিন্তু চট্ করে' গাম্ভীর্য্যটা সরাতেও পারলে না। জিজ্ঞেস্ করলে, কী সেটা?

—আমাকে নাম নিয়ে ডাকবে, আর 'তুমি' বলবে।

—কেন? বয়েসে তো আপনি বড়ই।

—ছাই বড়! ছ' না সাত মাসের মোটে—আজকালকার দিনে আবার তা'কে বড় বলে নাকি! ছোড়্-দি আব আপনি শুনতে-শুনতে হায়রান্ হলুম! মনে হয়, কতই যেন বুড়ো হ'য়ে গিয়েছি!

দু' আনার পক্ষে এ বড় বেশি সুদ। প্রিটি এতে রাজি নয়। একেই তা'র কিচ্ছু ভালো লাগ্ছে না, তা'র ওপর ছোড়্-দি এতও বাজে বক্তে পারেন! নাঃ, এবার আর না পালালেই নয়। হেঁটেই যাবে সে।

প্রিটিকে উঠে' দাঁড়াতে দেখে অমলা বল্লে, যাচ্ছ নাকি? পয়সা নিলে না?

—আমি তো আপনার সর্ত্তে রাজি হই নি।

—প্রথমটায় একটু বাধো-বাধো ঠেকেই—একটু চেষ্টা ক'রো, অভ্যেস্ হ'য়ে যাবে। ভারি বিশ্রী শোনায় বাস্তবিক আপনিটা।...একটু বোসো, আমি আস্ছি।

অমলার অটোগ্রাফের বইটা খুঁজে' বা'র কর্তে একটু দেরি হ'য়ে গেলো। প্রিটিকে লিখ্তে বল্বে—ও নিশ্চয়ই এক্ষুনি লিখ্বে না—বাড়ি নিয়ে যেতে চাইবে। অমলা প্রথমটায় আপত্তি কর্বে...

অমলা যখন ফিরে' এলো, তা'র তিন সেকেণ্ড্ আগে প্রিটি লিলির হাত থেকে একটা টাকা নিয়ে রাস্তায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

—প্রিটি কোথায় রে?

—চলে' গেছে?

—চ'লে গেছে? কখন্?

—এই তো এইমাত্র।

—কী করে' গেলো? ওর না পয়সা ছিলো না?

লিলি ঢোঁক গিলে' বল্লে, ওপরের পকেটে একটা সিকি ছিলো—আগে টের পায় নি।

ছোড়্-দি দাঁতে দাঁত চেপে কী উচ্চারণ কর্লেন, লিলি ঠিক বুঝ্তে পার্লো না।

—মা, তুমি ভারি কেয়ার্লেস্। অমলার মুখে এই অভিযোগ শুনে' মা তো অবাক্!

—কেন, কী করেছি আমি? বা কী করি নি?

বোন্

অমলা তার ঘন চুলের বোঝা পিঠের ওপর ছেড়ে দিয়ে বল্লে, মেয়ে মানুষ কর্তে তুমি জানো না।

মা হেসে উঠ্লেন।—তুমি নিজে মানুষ হও নি? না অন্য কারুর পেটে হয়েছিলে?

—আমার কথা আলাদা। আমা'দর সময়ে ঘর-ভরা ছেলেমেয়ে ছিলো না, তুমি সব সময় আমাদের দেখাশোনা করতে পার্তে! তা ছাড়া, চোদ্দ বছরে পড়্তেই আমাব তো বিয়েই হ'য়ে যায়।

মা মেয়ের চুল নিয়ে বিনুনি বাঁধ্তে-বাঁধ্তে বল্লেন, তুমি আর তোমার দিদিবা অনেক বেশি আদর পেয়েছো, তা ঠিক; কিন্তু লিলি-ওরাও তো কষ্টে নেই।

অমলাব ঠোঁটেব ওপর দিয়ে যে-বাঁকাহাসি খেলে গেলো, মা তা দেখ্তে পেলেন না।—না, না, কষ্টে থাক্বে কেন? সুখেই তো আছে খুব, কিন্তু সুখেরো বাডাবাড়ি ভালো নয়।

—তুমি দূব থেকে দু'দিনের জন্যে এসেছো কি না—বাড়াবাড়িই তো দেখ্বে। সব কথা যদি শুন্তে—

—চাই নে শুন্তে। এখন আমি তো আব এ-বাড়ির কেউ নই, পরের কথা শোন্বাব জন্যে আমার মাথা-ব্যথা নেই। যা চোখে পড়ে, না বলে' পারি নে—এই যা। এত বড় মেয়ে যা'র, সেই মা'র একটু ভ্রূক্ষেপ নেই—এমন আর দেখি নি।

—এত বড় আবার কে? লিলি? ও তো সবে পনেরোয় পা দিয়েছে—এখনি ওর বিয়ে?

—বিয়ে দাও বা না দাও সে তোমার হাত,—কিন্তু ও তো আর শিশু নয়! ওর বয়েসে আমার একবছর কারাবাস হ'য়ে গেছে—আর লিলি তো দিব্যি ইস্কুলে যায় আর গপ্প করে' দিন কাটায়।

—শ্রীশের মত ভালো পাত্র পেয়েছিলাম—ছাড়্‌তে সাহস হয় নি। লিলির জন্যে তেমন পাচ্ছি কই? এ ক' বছরে হাওয়াও বদ্‌লে গেছে—আঠারোর আগে বিয়ের কথা ভাবেই না কেউ। লিলিও যেন কেমন—বয়েস বাড়্‌ছে, কিন্তু বড় হচ্ছে না, এখনো কী রকম ছেলেমানুষ, দেখিস্ তো। ভাব্‌তে অবাক্ লাগে, ওর বয়েসে আমার একটি মেয়ে হয়েছিলো।

—তোমার কাছে—উঃ, অত শক্ত করে' বেঁধো না, মা—তোমার কাছে ছেলেমানুষ মনে হ'বেই তো! এই জন্যেই তো তোমাকে আমি কেয়ার্লেস বলি। মেয়েরা যেদিন ফ্রক্ ছেড়ে শাড়ি ধরে, সেই দিন থেকে তাদেরকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে-চোখে রাখ্‌তে হয়, তা-ও তুমি জানো না। কী অবাধ স্বাধীনতা দাও তুমি!

—আমার কাছে যদ্দিন আছে, একটু হেসে-খেলে বেড়াক্ না। জন্মের মত তো কয়েদখানায় ঢুক্‌তেই হ'বে।

—হেসে-খেলে তো বেড়াচ্ছে, শেষকালে গড়াতে-গড়াতে গোল্লায় না যায়। কোনোদিকেই তো তোমার চোখ নেই!

—কেন? লিলি তো বরাবর পরীক্ষায় ফার্স্ট্ হচ্ছে—গান শেলাই সুদ্ধ। ঘরের কাজকর্ম্মও শিখ্‌ছে—তা কী-ই বা বয়েস, কতটুকুই বা পারে!

—তুমি মা বলে'ই এ-কথা বল্‌ছো, কিন্তু আমার শাশুড়ি যখন আমার কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় কাজ আদায় করে' নিতেন, আমার বয়েসও ওরি মত ছিলো। কিন্তু সে-কথা হচ্ছে না। তুমি যে একেবারে রাশ আল্‌গা করে' দিয়েছো—মেয়ে যা-খুসি তাই করে, যার সঙ্গে ইচ্ছে, তা'র সঙ্গেই মেশে। একটা কথার কথা বল্‌ছি—প্রিটির সঙ্গে কি ওকে অত মিশ্‌তে দে'য়া উচিত? এমন-কিছু নিকট আত্মীয় তো নয়;—

বোন্

আজকালকার দিনে বাপ-খুড়োর সঙ্গেই লোকের সম্পর্ক থাকে না—আর এ তো কত লতা-পাতা! তুমি ভাবো, মেয়ে তোমার কচি খুকীটি—কিচ্ছু বোঝেন না! তোমাদের দিনকাল আর নেই গো—এখনকার মেয়েরা সব বারোতে বুড়ো। সব পারে ওরা—চোখ-কান খোলা থাক্‌লেই সব বুঝ্‌তে। মানুষকে বিশ্বেস কর্‌বার একটা সীমা থাকা ভালো। শেষকালটায় একটা-কিছু হোক্—লোকে তখন দুষ্‌বে তোমাকেই, নইলে আমার কী? বিয়ে হ'য়ে গেলে মেয়ে পরস্য পর। আমি তোমাদের সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে অমলা দম নেবার জন্যে থাম্‌লে। সে থামামাত্র পিসীমা—তিনি এতক্ষণ ঘরের এক কোণে বসে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে মালা জপ ছিলেন—কথাটা লুফে' নিলেন. ঠিক বলেছিস্ অমি, ঠিক বলেছিস্। সোমত্ত মেয়ে—পরের ছেলের সঙ্গে তোর অত গুজ্‌গুজ্ করতে যাওয়া কেন? এখন নাকি নিয়ম-কানুন্ সব উল্টে' গেছে—আমরা সেকেলে লোক বাপু—আমাদের চোখে এতটা ভালো লাগে না।

বলে' তিনি গভীর অর্থ-সূচক দীর্ঘশ্বাস ছাড়্‌লেন।

মা এতক্ষণে গাঙে ঠাই পেলেন। অমলার খোঁপায় কাঁটা গুঁজ্‌তে-গুঁজ্‌তে তিনি বল্‌লেন, তুই কি ক্ষেপেছিস্ অমলা? প্রিটি ভারি ভালো ছেলে—পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে;—চেহারাখানাও কী মিষ্টি! অথচ এম্‌নি পোড়াকপাল, মা-টা গেলো মরে'—আর মা মরলে বাপ তো তালুই। যে যাই বলুক, প্রিটির সঙ্গে কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করতে আমি পার্‌বো না।

—আহা, খারাপ ব্যবহার কর্‌তে কে বল্‌ছে? প্রিটি এখানে আসুক্ না যত খুসি—ওকে আদর-যত্ন করো, খাওয়াও-দাওয়াও—লোকে ভালোই বল্‌বে। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো।

কথাটা তখনকার মত এখানেই চাপা পড়্‌লো। অমলা আবার বড় ঘুম-কাতুরে।

মা হলে হবে কী, মেয়েমানুষ তো বটে! অমলার ওকালতিতে টাল্ সাম্‌লাতে পার্‌বেন কেন? সুতরাং লিলি আর প্রিটি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার কর্‌লে, কী যেন একটা হয়েছে; কী হয়েছে, তা ঠিক বুঝ্‌তে না পার্‌লেও এটা ঠিক বুঝ্‌লে যে কিছু একটা হয়েছে।

এই তো সেদিন ওরা দু-জনে বসে' গল্প কর্‌ছিলো, হঠাৎ ছোড়্‌-দি এসে জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, কী আলাপ হচ্ছে তোমাদের?

প্রশ্নটা নিতান্তই বেমানান্। লিলি গম্ভীরমুখে জবাব দিলে, এই কত দেশ-বিদেশের কথা!

—আমিও একটু দেশ-বিদেশের কথা শুনি। মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—কাজে লেগে যাবে। বলে' তিনি গ্যাঁট্ হয়ে বস্‌লেন।

মহা-মুস্কিল! প্রেমের ইস্কুলে ওরা সবে ভর্ত্তি হয়েছে—দু'জনায় বসে' পাটের চাষ নিয়ে আলাপ কর্‌বার আর্ট এখনো ওদের আয়ত্ত হয় নি। তাই খানিকক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে হুঁ-হাঁ বিনিময়ের পর প্রিটির হঠাৎ মনে পড়ে' গেলো যে কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি থেকে তার একখানা খাতা আন্‌তে হবে।

সেদিনকার মত ওরা বেঁচে গেলো—মানে, মরে' বাঁচ্‌লো বটে, কিন্তু রোজই এ-রকম হচ্ছে, দু'দণ্ড নিরালায় বসে' কথা কইতে পারে না ওরা। হাতের কাজ সেরে লিলি একটু বসেছে কি মা ডাক্‌লেন শেলাই কর্‌তে, বা ছোড়্‌-দি প্রিটিকে ডাক্‌লেন তাঁকে একটা এমব্রয়-

ডায়রির নক্সা এঁকে দেবার জন্যে—কখনো বা পিস্‌মিমা 'নিতান্ত অযাচিত অনুগ্রহ করে' তাঁর তীর্থ-যাত্রার কাহিনী ওদেরকে শোনাতে বস্‌তেন। চাই কি, একজন-একজন করে' সবাই এসে জুট্‌লেন—ঘর সরগরম। লিলি মনের দুঃখে এক ফাঁকে উঠে' গিয়ে বই খুলে বসে, প্রিটি মুখের অম্লানতা বজায় রাখ্‌বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার আছে কিনা—এই আলোচনায় যোগ দেয়।

যদি একদিন দু'জনায় শুধু আলাপ কর্‌তে পার্‌তো—'কী বিশ্রী!' 'ছোড়্‌-দি একটি চ্যাটাব্‌বক্স!' 'পিসীমা ভারি ফানি'—এর বেশি, মনে-মনে ভাব্‌লেও বলার সাহস ওদের হয় না,—তা হ'লে এতৎসত্ত্বেও ওরা সুখী হতে পার্‌তো। কিন্তু সেটুকু সময়ও হয় না। দু-জনার বুকে হিমালয় পর্ব্বত চেপে বসেছে।

প্রিটি যদি সবার সাম্‌নে বল্‌তে পার্‌তো—'শোনো লিলি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে,' বা লিলি, 'আমাকে একটা এক্‌স্‌ট্রা কষে' দাও না প্রিটি-দা', বলে তাকে হাত ধরে' টেনে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে পার্‌তো, তা হ'লে সবি জলের মত সহজ হয়ে যেতো। কিন্তু ওদের ধারণা, পরস্পরকে ভালোবেসে ওরা পৃথিবী-সুদ্ধ লোকের কাছে অপরাধী হ'য়ে আছে, তাই ওদের বড় ভয়, বড় কুণ্ঠা। একজন আর একজনের সঙ্গে কথাও কয় না—যেন চেনেই না। ওদের নবিশী এখনো শেষ হয় নি, তাই ওরা ভাব্‌ছে যে এই ভাবে সকল সন্দেহ থেকে ওরা রেহাই পাবে; আর একটু পাকা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌তো যে লুকোবার কিছু নেই, এই ভাণ করাই লুকোবার অব্যর্থ উপায়। ওরা জানে না, লুকোবার চেষ্টা কর্‌তে গিয়েই ওরা আরো বেশি ধরা পড়ে' যাচ্ছে।

বোন্

প্রিটির সব চেয়ে অবাক্ লাগে এই ভেবে যে, ছোড়্-দি ওকে রোজই আস্‌তে বলেন, এবং দেখা হ'লেই নানা আলাপ করেন—যে কথা বল্‌তে পারেন তিনি! ওরা যা আশঙ্কা করে তা-ই যদি হ'ত, যদি ওদের কপালই পুড়ে' থাক্‌তো, তা হ'লে—তা হ'লে ছোড়্-দি অন্তত ওকে অমন আপ্যায়িত কর্‌তেন না নিশ্চয়ই। অথচ সবি কেমন যেন বদ্‌লে গেছে, কিছুই আগের মত নেই। প্রিটি ভাবে—কিন্তু কোনোই কূলকিনারা কর্‌তে না পেরে, ভাগ্যের হাতে তা'র সব সমস্যা তুলে' দিয়ে আগেকার মতই আসা-যাওয়া কর্‌ছে।

এক সন্ধ্যায় নীচের ঘর অন্ধকার দেখে সে—ভুল কর্‌লে, রান্নাঘরে আগে খোঁজ না নিয়ে—সোজা ওপরে উঠে' গেলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে-উঠ্‌তে তা'র বুদ্ধি খেল্‌লো—সামনের বড় ঘরটায় না গিয়ে কোণের যে ছোট ঘরটায় গিয়ে ঢুক্‌লো, সেটা লিলির। দায়ে পড়ে' বেচারার সাহস হয়েছে।

ঘরের আলো জ্বালা হয় নি—টেবিলের ওপর একটা মোম জ্বল্‌ছে। আর খাটের ওপর শুয়ে' আছে—প্রিটির হৃৎপিণ্ড তার বুকে ঠাস্ করে' এক বাড়ি দিয়ে তারপর একেবারে যেন থেমেই গেলো—ও নয়, ছোড়্-দি। ছোড়্‌দির চোখ বোঁজা—ঘুমুচ্ছেন বোধ হয়।

প্রিটি ফিরে' যাচ্ছিলো, এমন সময়—পায়ের শব্দেই বোধ হয়—অমলা চোখ খুল্‌লো। ডাক্‌লো—প্রিটি নাকি? যাচ্ছ কোথায়?

দরজার কাছে এসে প্রিটি থম্‌কে দাঁড়ালো। যেন সে চুরি কর্‌তে এসে ধরা পড়েছে—সমস্ত কথা গুলিয়ে গেছে তা'র।

ছোড়্-দি আবার ডাক্‌লেন, ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কাছে এসো না! আমার মাথা ধরেছে—চেঁচিয়ে কথা বল্‌তে পার্‌ছি না।

যেন, কথা তাঁকে বল্‌তেই হ'বে—এমন মাথার দিব্যি দিয়েছে কেউ। প্রিটি সভয়ে খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ছোড়্‌-দি কাঁধের নীচে একটা বালিশকে ঠিক করে' নিয়ে বল্‌লেন,—উঃ, কী ভীষণ মাথা-ধরা! প্রায়ই হয়—এমন কষ্ট পাই যে বলার নয়। চুপচাপ এখানে শুয়ে ছিলাম—কার সঙ্গে কথা কইতেও ইচ্ছে করে না।

প্রিটি ত্বরিতে জবাব দিলে—আমি তা হ'লে যাই। আপনি ঘুমোন্।

—না, না—ঘুমোবো কী? এখন ঘুমোলে সারা-রাত আর চোখ বুঁজ্‌তে পার্‌বো না।

—মাথা-ধরার ঘুমই হচ্ছে একমাত্র ওষুধ।

—এলে তো বাঁচ্‌তাম! কিন্তু এই এতক্ষণ ধরে' সাধ্য-সাধনা কর্‌ছি—কা'র ঘুম কোথায়? উঃ, সিঁড়ির আলোটা কি বিশ্রী লাগ্‌ছে চোখে—দরজাটা একটু ভেজিয়ে দাও না!

প্রিটি শেষ চেষ্টা কর্‌লে—আমি বরঞ্চ চলে'ই যাই। আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন্—ঘুম না আসে তো একটা অ্যাস্‌পিরিন্ খেয়ে দেখ্‌লে পারেন।

—কাজ নেই বাপু আমার অ্যাস্‌পিরিন্ খেয়ে—এম্‌নিতেই হার্ট যথেষ্ট উঈক্ আছে। তুমি এখানে একটু বোসো না, প্রিটি। দু'দিন বাদে চলেই তো যাবো, আর তোমাদেরকে বিরক্ত কর্‌বো না।

অদূর ভবিষ্যতে ছোড়্‌-দি চলে' যাবেন—খবরটা এতই শুভ যে আজ্‌কে একটু কষ্ট স্বীকার করে' প্রিটি তা'র দাম দিতে প্রস্তুত। তাই, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে ফিরে' এসে—

চেয়ারটায় বস্‌তে যাচ্ছিলো, কিন্তু ছোড়্‌-দি কর্‌লেন বারণ।

বল্লেন, এই এখানেই বোসো প্রিটি—বলে' হাত দিয়ে বালিশের পাশে একটুখানি জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

প্রিটি সসঙ্কোচে সেখানেই বস্লে। ছোড্-দির একখানা হাত যেন দৈবাৎ তাব হাতের ওপব এসে পড়্লো। বার দুই সেখানে একটু চাপ দিয়ে ছোড্-দি বল্লেন, বাঃ, তোমার হাত ভারি নরম তো প্রিটি—একেবারে মেয়েব হাতেব মত। বলে' নরমত্বটা পবথ্ কব্বার জন্যেই আবাব চাপ দিলেন।—কী ঠাণ্ডা তোমার হাতখানা, বরফের মত। বলে' সেই হাত কপালেব ওপর রাখ্লেন।—আমার মাথাটা একটু টিপে' দাও না, প্রিটি। না—অত জোবে নয়; হঁ্যা, এম্নি। বে—শ; লক্ষ্মী ছেলে তুমি।

প্রিটি বল্তে যাচ্ছিলো, লিলিকে ডেকে আনি—ও আমার চেয়ে ভালো পাব্বে। কিন্তু 'ল্' পর্য্যন্ত বলেই সে থেমে গেলো। পাছে ছোড়্-দি কিছু মনে কবে' বসেন!

একটু পবে ছোড়্-দি ডাক্লেন—প্রিটি।

প্রিটি সসম্মানে জবাব দিলে—বলুন্।

—বলুন্ কী? ভক্তির অর্থই পাথাব যে। জানো তো, অতিভক্তি কিসের লক্ষণ।

প্রিটি ঢোঁক গিল্লে।

কী মনে করে' ছোড়্-দি হঠাৎ হেসে উঠ্লেন।—প্রিটি, তোমার নামটি কিন্তু বেশ, প্রিটি।

অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে প্রিটি জবাব দিলে, সবাই তা-ই বলে।

—সব মেয়েরাই তা-ই বলে—না, প্রিটি? লজ্জা কোরো না—বলো না!

প্রিটির সমস্ত অন্তর-মন কুঁক্‌ড়ে অতটুকু হ'য়ে গেলো। ভাঙা-

ভাঙা ভাবে সে বল্‌লে, ছি ছি, এ-সব কথা আপনি কী বল্‌ছেন, ছোড়্‌-দি!

—নাঃ, তুমি বেজায় লাজুক। কত বয়েস হয়েছে তোমার? উনিশ? যাক্—এ বয়েসে একটু লজ্জা থাকাই ভালো। কিন্তু মেয়েরা যদি তা বলে'ই থাকে, এমন আর দোষের কথা কী? শুধু নামেই তো তুমি প্রিটি নও—বাস্তবিক প্রিটি। শুধু প্রিটি নও, রীতিমত হ্যাণ্ড্‌স্যাম্।

তারপর, প্রিটিকে নিরুত্তর দেখে:

সব মেয়েরাই এ-কথা বলে—না, প্রিটি?

প্রিটির ততক্ষণে হ'য়ে এসেছে। এই প্রসঙ্গ অবলম্বন করে' ছোড়্‌-দি যে কোথায় গিয়ে পৌঁছ্‌বেন, তা ভেবে তার শরীরের রক্ত বরফ হ'য়ে গেলো। ছোড়্‌-দি কী চালাক—আর কী খারাপ! একটা ছুতো করে' তাকে আটকে রেখে তা'র মুখ দিয়ে বা'র করিয়ে নিতে চাচ্ছেন যে সে লিলিকে—প্রিটি ফাঁদে পা দিয়ে বসেছে, এখন আর এড়াতে পার্‌বে না। এ-বাড়িতে আসা তা'র এই বোধ হয় শেষ।

এতক্ষণ যা একটু ঘোর-কপট ছিলো, তা-ও ঘুচ্‌লো। ছোড়্‌-দি স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, আচ্ছা প্রিটি, কোনো মেয়ে তোমার প্রেমে পড়ে নি?

—না—এই একটি কথা বল্‌তে গিয়ে প্রিটির গলা আট্‌কে এলো।

—না, বলো কী? এমন সুন্দর চেহারা তোমার—না পড়ে' পারে?—দু' একজন নয়, নিশ্চয় অনেকেই পড়েছে—থাক্, থাক্, আমার কাছে না-ই বা বল্‌লে। যে লাজুক্ তুমি! এমনো হ'তে পারে যে তুমি জানো না। এমনো হ'তে পারে যে মেয়েদের মনের কথা জান্‌বার ক্ষমতাই তোমার নেই। কিন্তু তুমি? তোমার নিজের মনের কথা তো জানো? তুমি কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ো নি?

প্রিটির নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এলো। তা'র ইচ্ছে হ'ল, ছোড়্-দির পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে' চীৎকার করে' কেঁদে ওঠে। যদি তাঁর একটু করুণা হয়। ইস্—একটু দয়া-মায়াও নেই ছোড়্-দির!

—বলো না, কা'র সঙ্গে? আব্দারের সুরে ছোড়্-দি বল্লেন। ছোড়্-দি কী চালাক! তা'কে মিষ্টি কথায় ভোলাতে চান্।

—কারু সঙ্গে নয়। কথাটা বলে' প্রিটি হাঁপাতে লাগ লো।

—কারু সঙ্গে নয়? একদিনের জন্যেও না?...আচ্ছা প্রিটি, কোনো মেয়েকে চুমো খাও নি তুমি?

প্রিটি ভাব্লে, কখনো তার জন্ম না হ'লেই ভালো ছিলো। এ-প্রশ্নের উত্তরে কী করে' যে সে না বল্লে, তা সে নিজেই বুঝতে পার্লো না।

—কক্ষণো না? হ'তেই পারে না।

পরের মুহূর্ত্তেই আবার:

—পার্বেই বা না কেন? ইচ্ছে হয়েছিলো সাহস হয় নি, পারো নি—না? বলো না, প্রিটি! চুমো-খাওয়াতে দোষ কী? বিলেতে তো লোকে রাস্তায় চুমো খায়।...তুমি একেবারে বোকা—তাই ঘাব্ড়ে যাও। মেয়েরা মুখে অমন আপত্তি করেই—ওর নামই ইচ্ছে। সে-আপত্তি বুঝি কেউ মানে? তুমি কিচ্ছু জানো না, দেখ্ছি! বলে' ছোড়্-দি একখানা হাত কপালের ওপর তুলে' দিলেন।

—আচ্ছা, প্রিটি, যদি কোনো মেয়ে মুখেও আপত্তি না করে, তা হ'লে তুমি পারো? যে ভীতু তুমি—নিশ্চয়ই পার্বে না। আমি দশ টাকা বাজি রাখ্তে পারি, তুমি পার্বে না। এসো তোমার সাহস পরীক্ষা করা যাক্। ধরো আমার কোনো আপত্তি নেই—পার্বে আমাকে চুমো খেতে? ছোড়্-দির হাতখানা দৈবাৎ প্রিটির গলায় গিয়ে লাগ্লো।

বোন্

প্রিটির সমস্ত শরীর কাঠ হ'য়ে এসেছিলো। যন্ত্রের মত সে অমলার হাতখানা নামিয়ে উঠে' দাঁড়ালো।

সঙ্গে-সঙ্গে অমলা তড়াক্ করে' উঠে' বস্‌লো।—ভারি আস্পর্দ্ধা তো তোমার? তুমি ভেবেছো নাকি যে সত্যিসত্যি আমি তোমাকে—! সবার কাছে রঙ্ চড়িয়ে এ-কথা বলে' বেড়াবে—না? খবরদার—! না-হয় বলো গে—যাও! কেউ বিশ্বেস কর্‌বে কিনা! উল্টো তোমাকেই ঠেসে ধর্‌বে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও এ-ঘর থেকে—না, যেয়ো না, শোনো। বোসো—থাক্, না বস্‌লেও চল্‌বে। শোনো, আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে তামাসা কর্‌ছিলাম।

—আমারো তা-ই মনে হয়েছে।

—তোমারো তা-ই মনে হয়েছে—না? তামাসা কর্‌বার আর লোক নেই আমার—না? কী বেয়াদপি! আমি তোমার সঙ্গে তামাসা কর্‌বো? তামাসা! তামাসা কা'কে বলে, জানো? সব নিয়েই তোমার ফাজ্‌লেমি! যাও তুমি এখান থেকে—আমি আর তোমার মুখ দেখ্‌তে চাই নে।

হতভম্ব হ'য়ে প্রিটি বেরিয়ে যাচ্ছিলো, অমলা হঠাৎ ছুটে' এসে তা'র হাত ধরে' বল্‌লে, যেয়ো না, প্রিটি। রাগ কর্‌লে আমার ওপর? সত্যি তুমি চমৎকার দেখ্‌তে! বলে' সে প্রিটির হাতখানা নিজের গলায় জড়াতে যাচ্ছিলো, প্রিটি জোর করে' নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলে।

হঠাৎ অমলার তীক্ষ্ণ চীৎকারে সারা বাড়ি কেঁপে উঠ্‌লো। চৌকাঠের কাছে এসে প্রিটি থম্‌কে দাঁড়াতে বাধ্য হ'ল।

ছুটে' এলেন মা, দৌড়ে এলেন পিসীমা, কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে লিলি—তা'র বুকের ওপর ঢেঁকির পাড়া পড়্‌ছে—কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে লিলি এলো।

অমলা তখন খাটের ওপর লুটিয়ে আকুল হ'য়ে কাঁদ্‌ছে।

—কী? কী হয়েছে।

অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে অমলা বল্‌লে, ঐ প্রিটি···ঐ ছেলেটা, মা—ও আমাকে—বাকি কথাটা বল্‌তে অমলার লজ্জায় বাধ্‌লো।

রোদনে তিরস্কারে বিলাপে অভিশাপে মিশে' যে তুমুল সোর সুরু হ'ল, প্রিটি তা'তে একটি কথাও বল্‌তে পার্‌লো না। বল্‌লেই বা কে শুন্‌তো, শুন্‌লেই বা বিশ্বেস কর্‌তো কে? যে-একজন কর্‌তো, তা'কেও বলা হ'ল না।

লিলি সমস্ত রাত কাঁদ্‌লে, ইহজীবনে তা'কে আর দেখ্‌বে না বলে' নয়—তা'র চেয়েও বড় ও নিষ্ঠুর এক দুঃখে—সে-কথা কাউকে বলা যায় না, সে-কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবা যায় না।

প্রিটি সমস্ত রাত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে' বেড়ালো, ইহজীবনে ওকে আর দেখ্‌বে না বলে' নয়—লিলি যে-কারণে শোক কর্‌বে, তা, প্রিটিকে আর দেখ্‌তে পাবে না বলে' নয়—সেই শোকে।

পুরাণের পুনর্জ্জন্ম

পুরাণের পুনর্জন্ম

ঊর্ম্মিলা

শোনা যায়, রামচন্দ্রের জন্মের বহুপূর্ব্বেই নাকি রামায়ণ রচিত হয়েছিলো। সম্প্রতি জানা গেছে যে রামায়ণ-প্রণেতা মহাকবি তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় নামটি অর্জ্জন কর্‌বার আগে যখন ধ্যানস্থ অবস্থায় আপাদ-মস্তক বল্মীদ্বারা আবৃত হ'য়ে তপস্যামগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর স্বপ্নলোকে রামায়ণের সমস্ত চরিত্রগুলি আবির্ভূত হ'য়ে তা'দের অনাগত জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের কাহিনী তাঁর কাছে বিবৃত করে—পিরান্‌দেল্লোর নাটকে গ্রন্থকার-সন্ধানী ছয়টি পাত্রপাত্রীর মতই। এ-ঘটনা আমরা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তুম না, যদি না আমাদের মনের মধ্যে গোপন অথচ কঠিন একটা সংস্কার থাক্‌তো যে স্বর্গীয়রা ত্রিকালদর্শী; এবং জন্মের পূর্ব্বে, অর্থাৎ পূর্ব্ব-জীবনেব অন্তে যে রামায়ণের পাত্রপাত্রীরা উক্ত রূপেই স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বিরাজ কর্‌ছিলো, সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ উঠ্‌তে পারে না। তখন সব চেয়ে বেশি কথা বলেছিলো রাবণ, সব চেয়ে বেশি ব্যথার অভিনয় কবেছিলো রামচন্দ্র, সব চেয়ে বেশি কান্নাকাটি কবেছিলো সীতা, আর সব চেয়ে বেশি আস্ফালন করেছিলো হনুমান। সেই জন্যেই বাল্মীকির বিবাট কাব্যে এরাই প্রধান হ'য়ে উঠেছে, এদের ব্যথা ও ব্যর্থতা, আনন্দ ও ক্রন্দন, কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির কাহিনী-কীর্ত্তনেই কবিব বীণা মুখর। যে তখন ভিড় ঠেলে জোব-জবর্‌দস্তি করে' কবিকে নিজের কথা শোনাতে পারে নি—তা'র পেছনে কবি এক ফোঁটা চোখের জল খরচ করাও বাহুল্যবোধ করেছেন—যেমন ধরা যাক্‌, ঊর্ম্মিলা। ঊর্ম্মিলা তখন সীতার অঞ্চল-সংলগ্না হ'য়ে নিজের অস্তিত্বকে প্রায় গোপন করে'ই চলেছিলো, নারী-সুলভ লজ্জায় ক্ষণিকের তরেও আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারে নি; দু'একটি কথা যা বল্‌তে চেয়েছিলো, তা-ও সীতার অনাবশ্যক কান্নার জোয়ারে

ভেসে গিয়েছিলো। বাল্মীকি মুনির সঙ্গে উর্ম্মিলার তাই চাক্ষুষ পরিচয়ের বেশি কিছু হ'তে পারে নি। উর্ম্মিলা যে তাঁর কাব্যে উপেক্ষিতা হয়েছে, সে-দোষ উর্ম্মিলারই নিজের। কবির কাছে সে কখনো অবগুণ্ঠনই উন্মোচন করে নি—তিনি যদি তা'র বেদনাকে তাঁর কাব্যে স্থান না দিয়ে থাকেন তবে সে কি তাঁর অপরাধ? এক হিসেবে এ অবিশ্যি ভালোই হয়েছে, কারণ উর্ম্মিলার স্বরূপ যদি বাল্মীকির কাব্যে ধরা পড়্‌তো তা, হ'লে আজকাল যে তিনি কামায়ণ-রচয়িতা বলে' বহুল পরিমাণে তিরস্কৃত হ'তেন, সে কথা না বল্‌লেও চলে। যা হোক্, মহা-কবির সম্মানটা তবু রইলো।—

হালে কিন্তু, ইংরেজি শেখার দরুণই হোক্, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক্, উর্ম্মিলার সে-দুর্জ্জয় লজ্জা কেটে গিয়েছে। তখনকার ত্রুটি শোধ্‌রাবার ও রামায়ণকে সম্পূর্ণ কর্‌বার উদ্দেশ্যে সে তা'র নিজের জীবনের একটা কাহিনীও লিখে' ফেলেছে। সেই কাহিনী ছাপ্‌বার জন্যে সে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের কোনো প্রকাশকেরই সেটা গ্রহণ কর্‌বার মত সাহস হয় নি। এর অবিশ্যি যথেষ্ট কারণ ছিলো। গত জীবনের অবহেলার জন্য নিজের ওপরই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে নিজের মনটাকে একেবারে বে-আব্রু করে' এমন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছে এবং সেই সূত্রে এমন সব কথা বলেছে, যা যথার্থই মারাত্মক। যে-দেশে ব্লাউস্ একটু ঢিলে হ'য়ে গেলেই জাত যায়, আঙুরের রস এবং আঙুলের ছোঁয়ায় যে আনন্দ আছে, সে-কথা উল্লেখ কর্‌লেই মক্ষিকারা মারমুখো হ'য়ে ওঠে, আর মক্ষিরাণীরা লজ্জিতা হন্, সে-দেশে ঐ বই বেরুলে স্বাস্থ্যরক্ষকদের হাতে লেখিকাকে খুবই অপদস্থ হ'তে হ'ত। উর্ম্মিলার পাণ্ডুলিপিখানা এক বন্ধু কিছুদিন হ'ল আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন; সঙ্গে লিখেছেন, "কোনো প্রকাশক

বা সম্পাদক এটা ছাপ্‌তে রাজি হ'লেন না ; তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি—তোমরা সম্পাদকগিরিতে নতুন প্রমোশন পেয়েছ—যদি একটা-কিছু ব্যবস্থা কর্‌তে পারো।”

সত্যি বল্‌ছি, উর্ম্মিলা দেবীর এ-রচনা ঠিক যেমন আছে তেমনটি ছাপ্‌তে পারি, অমন সাহস আমাদেরো নেই। তবে এ-কথা ঠিক যে, তা'র হৃদয়ের যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত অবরুদ্ধ বেদনার একটা নির্গমন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। তা'তে সেও কতকটা শান্তি পাবে, দেশের লোকের ভ্রান্তিও খানিকটা দূর হ'বে। সেই কথা ভেবেই আমরা নিজেদের ভাষায় যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ও যথাসম্ভব কালিমানির্লিপ্ত করে' তা'র জীবন-কাহিনী ছাপাচ্ছি। গুজব শোনা যাচ্ছে, শীগ্‌গিরই নাকি মূল বইখানার আগাগোড়া ফরাসী অনুবাদ প্যারিস্ থেকে বেরুবে, এবং আঁদ্রে মোরোয়া নাকি বইয়ের ভূমিকা লিখে' দিয়েছেন।

উর্ম্মিলারা ছেলেবেলা থেকে কল্‌কাতাতেই মানুষ। উর্ম্মিলার বাবা মিঃ জনক সিংহ সুরেন্ বাঁড়ুয্যের আমলের বিলেত-ফেরত ; তাই তাঁর সাহেবি চাল-চলন আজ পর্য্যন্তও ঘোচে নি। বর্ত্তমানে তিনি কল্‌কাতার প্রধান ব্যারিস্‌টার—অন্য যে-কোনো পাঁচজন ব্যারিস্‌টারের সম্মিলিত আয় অপেক্ষা তাঁর এক্‌লার আয় বেশি। বালীগঞ্জে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি ; তিনখানা মোটার—সাধারণ ব্যবহারের জন্যে একখানা

ফোর্ড, আপিসে যাবার জন্যে একখানা ডেঙ্গম্লার, ও বেড়াবার জন্যে লিম্যুজিন্ রোল্স্-রয়েস্।

ঊর্ম্মিলা দেখ্‌তে শিখেছে পর এই ঐশ্বর্য্যকেই চিনেছে ও জেনেছে। সংসারে আরো কিছু যে থাক্‌তে পারে, তা তা'র কল্পনাতীত।

সীতা আর ঊর্ম্মিলায় খুব ভাব। ঊর্ম্মিলা যখন মাতৃগর্ভে, তখন তা'র মা-বাবা লাহোরে বেড়াতে যাবার পথে এক ছোট স্‌টেশ্‌নে এক বছরের সীতাকে কুড়িয়ে পান্। গ্রামে তখন ভয়ানক কলেরা লেগেছে ;— সীতার মা-বাবা এক রাত্রির মধ্যেই দু'-ঘণ্টা অন্তর কলেরাকে কাঁচকলা দেখিয়ে চলে' যান্ ;—ঐ ছোট মেয়েটিকে দেখ্‌বার আর কেউ থাকে না। গ্রামেরই একজন কলেরা-ভীতিগ্রস্ত পলায়মান ব্যক্তি দয়াপরবশ হ'য়ে মেয়েটীকে তা'র সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে' ঠিক করে' তা'কে নিয়ে ট্রেইনে চাপ্‌তে যাবে, এমন সময় পাশের কাম্‌রা থেকে ঊর্ম্মিলার মা ছোট মেয়েটির অসামান্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে তা'কে ডাক দেন্ ; মেয়েটিব সমস্ত ইতিহাস শুনে' তিনি লোকটির কাছে সেই কন্যা ভিক্ষা চাইলেন। অন্যের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পেরে, এমন কি, সে উপলক্ষ্যে পঞ্চাশটি টাকার শুভাগমনে লোকটি যে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলো, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সেই থেকে সীতা জনকের বাড়িতেই আছে। ঊর্ম্মিলার সঙ্গে তা'র খুব ভাব। দু'জনে প্রায় সমবয়সী। দু'জনেই লোরেটোতে পড়ে, এক সঙ্গে লেখা-পড়া, গান-গল্প সবই করে। দু'জনেই সুন্দরী, কিন্তু দু'জনে দু'রকম। সীতার তপ্ত-কাঞ্চনের মত বর্ণে, ও তীক্ষ্ণ, নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছিল পশ্চিম-ভারতের উগ্র রৌদ্রের অসহ্য দীপ্তি, আর ঊর্ম্মিলা আমাদের এই বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে, সে শ্রাবণের শুক্লা-অষ্টমীর জ্যোছ্‌নার মত ম্লান-বরণা, কাজল-বিনা কালো তা'র চোখে বিশ্বের

চির-বর্ষার শ্যামল স্বপ্ন যেন এক ফোঁটা অশ্রু হ'য়ে দুলছে; তা'র নম্র মুখখানিতে, ক্ষীণ দেহ-বল্লরীতে যেন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণের মমতা জড়ানো।

মেয়েদের বিয়ের জন্য জনকের কোনো চিন্তা ছিলো না; যে কন্যার হৃদয় জয় কর্‌তে পার্‌বে, সে-ই তা'কে পা'বে, এই ছিলো তাঁর পণ।

কিন্তু সে বিজয়ী-বীর আর আসে না। প্রতি সন্ধ্যায় উর্ম্মিলাদের ড্রয়িং-রুম বিভিন্ন ধরণের যুবকদের সমাবেশে একটি চিঁড়িয়াখানায় পরিণত হয়। তাঁদের কারো চোখ সীতার ওপর, কারো বা উর্ম্মিলার ওপর; আর কেউ-কেউ দু'জনকেই হাতে রাখ্‌তে চান্‌, যা'তে একজন ফস্‌কালে আর একজনকে ধরা যায়। ও-বাড়ির অনেক চা-কেইক্‌ বিস্কুট তাঁরা ধ্বংস কর্‌লেন, কিন্তু হৃদয় নামক বস্তুটি জয় করা দূরে থাক্‌, ভালো-মতন চিনে'ই উঠ্‌তে পার্‌লেন না।

উর্ম্মিলা বল্‌তো, "বাবার পণ বুঝি আর টিঁক্‌লো না। এতগুলো ছেলেকে তো trial দে'য়া গেল—কেউ পার্‌লো না।"

সীতা মৃদু হেসে জবাব দিতো, "যে পার্‌বে, সে একাই পার্‌বে। সে এখনো আসে নি।"

উর্ম্মিলা মনে-মনে ভাব্‌তো, কখনো কি আস্‌বে?

একদিন কিন্তু অদ্ভুত ভাবে রাজার দুলালদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।

সেদিন সীতা ও উর্ম্মিলা নিউম্যানের বাড়িতে গেছে বই কিন্‌তে। অনেকগুলো বই কিনে' যাবার জন্যে মুখ ফেরানো মাত্রই তা'রা দেখ্‌তে

পেলো, দু'জন যুবক দো'কানে এসে ঢুকছে। তা'দের চেহারার সাদৃশ্য দেখে আর বুঝ্‌তে দেরি হয় না যে তা'রা দু' ভাই। ঊর্ম্মিলাদের যাবার জন্যে পথ করে' দিয়ে তা'রা একটু সরে' গেলো, কিন্তু তা'দের কাছে এসেই সীতা হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো। সাম্‌নের যুবকটির উৎসুক দৃষ্টির তীব্রতায় তা'র চোখ আপনা থেকেই বুঁজে এলো। অন্য ভাইটি একটু পেছনে নতমুখে দাঁড়িয়ে ছিলো, ঊর্ম্মিলা ভালো করে' তা'র মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিলো না, কিন্তু তবু তা'র হাঁটু দুটো হঠাৎ কেন যে অমন দুর্ব্বল, অবশ হ'য়ে গেলো, তা কে জানে? একটু পরেই তা'র হাত থেকে সমস্ত বইগুলো সশব্দে মেঝের ওপর পড়ে' গেলো;—পেছনের যুবকটি সেগুলো তুলে' দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো।...

মোটারে উঠে' সীতা শুধু বল্‌লো, "আমাদের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে এসেছি। একদিন যাবেন বলেছেন।"

সারাপথ আর দু' বোনে কোনো কথা হ'ল না।

একমাসের মধ্যে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সে বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় দেখা যেতে লাগ্‌লো।

একদিন অনেক রাত্রে বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সীতা নিঃশব্দে তা'র বিছানা ছেড়ে উঠে' ঊর্ম্মিলার ঘরে গেলো। পায়ের শব্দ শুনে' ঊর্ম্মিলা বলে' উঠ্‌লো, "কে?"

"এখনো ঘুমুস্‌ নি উর্মি?" বলে' সীতা এগিয়ে এলো।

"—তোমারো তো দেখ্‌ছি সেই অবস্থা;—এত রাত্তিরে যে?"

"তোর সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম।"

পুরাণের পুনর্জন্ম

"বেশ, করো ; বোসো" ;—উর্ম্মিলা বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সুইচ্ টিপে' দিলে। শাদা আলোর বন্যায় ঘর ভেসে গেলো।

কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্ কাট্‌লো। তারপর সীতা হঠাৎ বলে' উঠ্‌লো, "বাবার পণ-ভঙ্গ হওয়া সম্বন্ধে তোর মনে কি এখনো আশঙ্কা আছে ?"

উর্ম্মিলা হাত ছ'টি বালিশের নীচে রেখে কাৎ হ'য়ে শুয়ে' বোঁজা চোখে নিদ্রালস সুরে বল্‌লে, "না—তোমার সম্বন্ধে নেই।"

সীতার রাঙা-ঠোঁটে রাঙা-হাসি খেলে গেলো।—"আর নিজের সম্বন্ধে ?" উর্ম্মিলা নিরুৎসাহ ভাবে জবাব দিলে, "সন্দেহ আছে।" বলে'ই সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। সে জান্‌তো সীতা এখন তা'র মুখ দেখ্‌তে চাইবে।

সীতা তা'র কালো চুলের দিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ করে' কী যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লো। তারপর আস্তে-আস্তে উর্ম্মিলার মাথার ওপর একখানা হাত রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লে, "কী হয়েছে আমায় বল্‌বি না, উর্মি ?"

উর্ম্মিলা মুখ ফিরিয়ে সীতার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে বল্‌লে, "হ'বে আবার কী ? যে-বাঁধনে পড়েছি, তা থেকে পালাতে পারি, অমন ক্ষমতা তোমারো নেই, আমারো নেই। আমাদের জীবনের ধারা একেবারে নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেছে।"

উর্ম্মিলা চুপ কর্‌লেও স্পষ্টই মনে হ'তে লাগ্‌লো যে তা'র আরো কিছু বল্‌বার আছে। সেই কথার জন্যে সীতা নিঃশব্দে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লো।

উর্ম্মিলা উঠে' বসে' বল্‌তে লাগ্‌লো "কিন্তু তোমার-আমার মধ্যে তফাৎ এই, দিদি, যে তোমার আকাশে উঠ্‌ছে সূর্য্য, আর আমার আঙিনার পাশে দেখা দিয়েছে এক টুক্‌রো ম্লান চাঁদ—তা'র নিজের কিছুই নেই, ঐ সূর্য্য থেকেই"——

পুরাণের পুনর্জন্ম

সীতা খুব আস্তে-আস্তে বল্‌লে, "কী কর্‌বি? জানিস্ তো ওদের দু'জনার মধ্যে কী ভয়ানক ভালোবাসা!"

ঊর্মিলা শুধু বল্‌লে, "তা জানি;—তুমি এখন যাও দিদি, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"...

সীতা চলে' যাবার পর ঊর্মিলা বিছানায় শুয়ে'-শুয়ে' জান্‌লা দিয়ে বাইরের ফাঁকা আকাশটার দিকে চেয়ে রইলো। গভীর রাত্রের বাতাসটি কী মিষ্টি! এই বাতাসেই বুঝি বাগানের কুঁড়িগুলি একটু-একটু করে' ফুটে' ওঠে!...দিদিকে অনেক চেষ্টা করে'ও সে তা'র মনের কথাটি বল্‌তে পার্‌লো না।...হ্যাঁ, দু'ভাইতে খুব ভালোবাসা বটে। কিন্তু এই কি যথার্থ ভালোবাসা? লক্ষ্মণের নিজের কোনো অস্তিত্বের পরিচয় সে কখনো পেয়েছে কি? সে কোনোদিন এমন কোনো কথা বলে নি, যা রামচন্দ্রের কথা নয়—রামচন্দ্রের থেকে বিভিন্ন ভাবে চিন্তাও করে নি বোধ হয়। বাইরের চোখ দুটোতে চশ্‌মা না লাগালে সে যেমন কিছুই দেখ্‌তে পারে না, ঠিক তেম্‌নি মনের ওপর রামচন্দ্রের আবরণ না পরালে কিছুই বুঝ্‌তে পারে না, ভাব্‌তে পারে না। রামচন্দ্র সীতাকে ভালোবাসে তা ঠিক, কিন্তু লক্ষ্মণ! সর্ব্ববিষয়ে দাদার অনুকরণ করাই তো তা'র স্বভাব, তা'র নিজের মনে কোনো অনুপ্রেরণা এসেছে কিনা, কে জানে? তা'র নিজের মন বলে' কোনো জিনিষই হয়-তো নেই। ও-বস্তুর দর্‌কার হ'লে সে রামচন্দ্রেরটাই ধার-ধুর করে' কোনোমতে কাজ চালিয়ে দেয়। এ-বাড়িতে রামচন্দ্র আসে বলে'ই সে আসে—দাদার সঙ্গেই আসে, দাদার সঙ্গেই যায়। এ-পর্য্যন্ত কখনো একা এলো না—একদিনো না। কত তুচ্ছ, খুঁটিনাটি ব্যাপারেও যে সে রামচন্দ্রের অন্ধ অনুকরণ করে' চলে, দেখ্‌লে হাসি পায়। কথা বল্‌বার সময় বার-বার "মানে" কথাটা বলা রামচন্দ্রের

একটা স্বভাব-গত অভ্যাস, কিন্তু লক্ষ্মণ সেইটেই চেষ্টা করে' অর্জ্জন করেছে।...উর্ম্মিলার মনে পড়্লো, একদিন রামচন্দ্র হঠাৎ চুল উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, লক্ষ্মণও তক্ষুণি প্রচুর কস্রৎ করে' তা করেছিলো, যদিও backbrush-এ তা'কে মোটেও মানায় না।...এই তো লক্ষ্মণ। তা'র আবার একটা ভালোবাসা!...কিন্তু অমন সুন্দর, ক্ষীণ, দীর্ঘ দেহ!—ম্লান মুখখানি দেখ্লে মায়া হয়। কী স্নিগ্ধ, শান্ত কথা। কখনো একটি কথা চেঁচিয়ে বলে না।...বেশ, যা হ'বার হোক্।

ফাল্গুনের এক রাত্রে আকাশে এক কণাও মেঘ ছিলো না; ছিলো শুধু রূপার মত রূপবতী পূর্ণিমা-চাঁদ। মাটির চোখে আলোর নেশা লেগেছিলো, হাওয়ার গায়ে ছিলো সুরভি-সুরার মদির বিহ্বলতা, মানুষের মনে জেগেছিলো সুখ-স্বপ্নের অবশ আবেশ। সেই রাত্রে এক শুভ লগ্নে সীতা ও উর্ম্মিলার বিয়ে হ'য়ে গেলো,—সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের, লক্ষ্মণের সঙ্গে উর্ম্মিলার।

সে-উপলক্ষে জনক সিংহ এমন প্রচণ্ড উৎসাহ-সহকারে উৎসব করলেন যে, অন্যান্য ব্যারিস্টার-গৃহিণীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হ'লেন—হ্যাঁ, পয়সা খরচ করেছে বটে! এমন কী, পরের দিন সকালে "স্টেইট্স্ম্যান্"-এ সদ্য-পরিণীত দম্পতীযুগলের ছবি পর্য্যন্ত বেরিয়ে গেলো।

বিয়ের পর দু'বোন্ শ্বশুর-ঘর করতে গেলো।

থিয়েটার রোডের ওপরেই মহারাজা দশরথ রায়ের বিরাট্ প্রাসাদ।

পুরাণের পুনর্জন্ম

মহারাজা উপাধিটি তিনি রঘুবংশের স্বনামধন্য নৃপতিদের কাছ থেকে বংশানুক্রমে লাভ করেন নি, এটি তাঁর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ-এর ভারতবর্ষের প্রতিনিধির দে'য়া খেতাব। ইচ্ছে কর্‌লে তিনি অবিশ্যি ও-রকম দু'দশটা লাট্-কে কিনে' আন্‌তে পারেন। কারণ তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার, মৈমনসিং জেলাব প্রায় অর্দ্ধেকটা তাঁর করতলগত। তিনি সপরিবারে চিরকাল কল্‌কাতাতেই বাস করেন, দেশের প্রতি কোনো বিরাগ বা বিতৃষ্ণা আছে বলে' নয়—কল্‌কাতা পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর উপকূলে বলে'। তাঁর জীবন-যাত্রায় কোনো আড়ম্বর নেই—রোজ ভাতের সঙ্গে রাবড়ি-খাওয়া তাঁর একমাত্র বিলাসিতা। অতি সাধু সজ্জন বলে' প্রজাদের মধ্যে তিনি পরিচিত। কখনো কারো ওপর কোনোরূপ অত্যাচার তিনি করেন না। কথা দিয়ে সর্ব্বদা কথা রাখেন বলে' তাঁর একটা সুনাম আছে।

দশরথের দুই সংসার। আজকালকার দিনে এটা সকলের চোখেই বেখাপ্পা ঠেক্‌বে, কিন্তু আগেই বলেছি, দশরথ কথা দিয়ে সর্ব্বদা কথা রাখ্‌তেন। প্রথম যৌবনে একটি ভদ্রলোকের কন্যার রূপ-লাবণ্য তাঁর আঁখির দৃষ্টিকে বন্দী করে; এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তিনি সেই ভদ্রলোককে বলে' ফেলেন যে তিনি তাঁর কন্যার পাণি-পীড়নেচ্ছু। পরে যখন কৌশল্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে তখন সেই ভদ্রলোকটি এসে তাঁর পূর্ব্বেকার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে জামাতা-রূপে দাবী করে' বসেন। দশরথ কী আর করেন! একবার যখন কথা দিয়ে ফেলেছেন! তাই বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁকে কৌশল্যা ও সুমিত্রা উভয়কেই ঘরে আন্‌তে হ'ল। দুই সতীনে যেরূপ বিদ্বেষ ও চিরন্তন মনোমালিন্য থাক্‌বার কথা, তা কৌশল্যা ও সুমিত্রার মধ্যে একটুও ছিল না; দু'খানা হাত যেমন ঝগ্‌ড়া না করে' মিলে'-মিশে' কাজ করে'

দেহটাকে সাহায্য করে, তেম্‌নি তাঁরা দু'জনও স্নেহের প্রেরণায় সম্মিলিত হ'য়ে দশরথকে আনন্দ দিতেন।

এর মধ্যে এক অশান্তির উদয় হ'ল। রামচন্দ্র একদিন এসে বল্‌লে, "বাবা, আমি মিঃ জনক সিং-এর বড় মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চাই।"—তারপর পাশে নীরবে দণ্ডায়মান লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "আর ও তাঁর ছোট মেয়েকে।"

দশরথের ঠোঁট থেকে গুড়্‌গুড়ির নলটা খসে' গেলো, চোখ দুটো অত্যন্ত প্রকাণ্ড হ'য়ে খুলে' গেলো। বিস্ময়ের আতিশয্যে তিনি শুধু বল্‌তে পার্‌লেন, "তার মানে?"

রামচন্দ্র অতি সরল ভাষায় মানেটা বুঝিয়ে দিলে।

দশরথ তাকিয়ার ওপর ঠেশ্‌ দিয়ে উঠে' বসে' তীব্রস্বরে বলে' উঠ্‌লেন, "না, না, সে অসম্ভব। ছিঃ—ওরা হ'ল গিয়ে ব্রাহ্ম—ওদের হাতের ছোঁয়া জল খেলেও আমাদের জাত যায়। ওদের সঙ্গে আমাদের একটা—হরি-হরি! আমি দু'টি ভালো মেয়ের খোঁজ পেয়েছি—বনেদি ঘর, মেয়ে দু'টিও সুন্দরী।"—তারপর স্বর নামিয়ে চুপি-চুপি বল্‌লেন, "তুমি জানো না রামচন্দ্র, কিন্তু আমি খুব বিশ্বাসযোগ্য লোকের কাছে শুনেছি যে মিঃ সিংহ বিলেতে থাক্‌তে গো-মাংস খেয়েছেন।"

রাম এ-কথা শুনে' হো-হো করে' হেসে উঠ্‌ল। দশরথ সহজে চটেন না, কিন্তু একবার চট্‌লে তাঁকে সাম্‌লানো দায় হ'য়ে পড়ে। তিনি অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "হাস্‌ছ? আমার কথাটা গায়েই মাথ্‌ছ না বুঝি? ইংরেজি শেখারই এই ফল। কিন্তু আমার মধ্যে

তো এখনো পবিত্র আর্য্য-রক্ত বইছে, আমি প্রাণ থাকতে এ-অনাচারের প্রশ্রয় দিতে পার্‌ব না। তোমাদের সঙ্গে মিঃ সিংহের মেয়েদের কোনো-মতেই বিয়ে হ'তে পার্‌বে না।"

রামচন্দ্র হাতের আঙুলে একটা রুমাল জড়াতে-জড়াতে শুধু বল্‌লে, "পার্‌বে বলে'ই তো মনে হচ্ছে।"

প্রাণাধিক পুত্রের এ বিরোধাচরণ দশরথকে একেবারে ক্ষিপ্ত করে' দিলো। কম্পিতকণ্ঠে তিনি বল্‌লেন, "পার্‌বে? আচ্ছা বেশ, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে এ-বিয়ে হ'বে, সে-মুহূর্ত্ত থেকে তুমি আর আমার ছেলে নও—আমার সম্পত্তিতে তোমার আর কোনো অধিকার নেই।"

চক্ষের নিমিষে রামচন্দ্রের দেহের সমস্ত রক্ত মুখে উঠে' এলো। কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে শান্তভাবে বল্‌লে, "আপনার সম্পত্তির টোপ ফেলে আমাকে ধর্‌তে পার্‌বেন ভেবে থাক্‌লে ভুল করেছেন। বেশ, তা-ই হ'বে। বিয়ের পরই আমি দেশ ছেড়ে চলে' যাবো।"—দশরথকে আর কোনো কথা বল্‌বার অবসর না দিয়ে রামচন্দ্র ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্মণও তা'র পদানুসরণ কর্‌লে। দশরথ ব্যাপারটা যে কী হ'ল, তা ঠিকমত ঠাহর করে' উঠ্‌তে না পেরে টাকে হাত বুলোতে লাগ্‌লেন।

সেদিনকার কথা রামচন্দ্র কখনো ভোলে নি। বিয়ের পরেই তিনি মিঃ সিং-এর খরচে সস্ত্রীক ইয়োরোপ যাবার ব্যবস্থা করে' ফেল্‌লেন। রামচন্দ্রের জীবনের একটা স্বপ্ন সফল হ'ল। দশরথ প্রাণ গেলেও তা'কে বিলেত পাঠাতে রাজি হ'তেন না। অথচ শিশুকাল থেকে এই স্বপ্নটাই তা'র মনকে দোলা দিচ্ছে।

আদর্শ ভ্রাতৃ-ভক্ত লক্ষ্মণ এসে বল্‌লে, "দাদা, আমাকেও নিয়ে চল।"

রাম লক্ষ্মণের কাঁধ চাপড়িয়ে বল্‌লে, "রাইট-ও!"

তাই বিয়ের একমাসের মধ্যেই তিনজনের সাগর-পাড়ি দেবার সমস্ত আয়োজন চল্‌তে লাগ্‌লো। টমাস্ কুক্ কোম্পানির সাহায্যে নল্‌ডেরা জাহাজে বুক্ করাও হ'য়ে গেলো।—দশরথ ছেলেকে নিরস্ত কর্‌তে অনেক চেষ্টা কর্‌লেন, হাতে ধরে' মিনতি পর্য্যন্ত কর্‌লেন, কিন্তু ছেলের মন টলাতে পার্‌লেন না। দুই মা এসে অজস্র অশ্রু-সিঞ্চন কর্‌লেন, কিন্তু তা'তেও তা'র মন ভিজ্‌লো না। বীর রামচন্দ্র, একগুঁয়ে রামচন্দ্র যেমন করে'ই হোক্, যা ভেবেছেন, তা কর্‌বেনই।

আসন্ন বিচ্ছেদের শোকে দশরথ শয্যাশায়ী হ'লেন। সেই তাঁর শেষ শয্যা।

বিদায়ের দিন ঘনাতে লাগ্‌লো।

উর্ম্মিলার আত্মকথা থেকে খানিক্‌টা :

রাত এগারোটা বেজে গেলো, এখনো স্বামী ঘরে আস্‌ছেন না। দাদার সঙ্গে যাওয়ার বিষয় নিয়ে জটলা চল্‌ছে নিশ্চয়ই। শুয়ে'-শুয়ে' পল্ মোরাঁ'র "Open All Night" পড়্‌ছি। সমস্ত রাত ধরে' বিশ্বের অতিথিশালার দুয়ার খোলা রয়েছে সমস্ত রাত ধরে' উৎসব চলেছে—এক-এক প্রহরে এক-এক দেশে, নব-নব নদীতীরে, নব-নব পাহাড়ের ধারে।...আমরা বাইরে থেকে পাচ্ছি শুধু সুরার ক্ষীণ সুবাস, আর শুন্‌ছি নৃত্য-গীতের অস্পষ্ট গুঞ্জন, আর সেই সুদূরের জন্য একটা পিপাসা মনের মহলে-মহলে টহল্ দিয়ে ফির্‌ছে। আমরা এবার সেই অতিথিশালায় ঢুক্‌বো, যেখানে সৌন্দর্য্যের পুষ্প-মঞ্জরীকে ঘিরে' কুশ্রীতা

সরীসৃপের মত ঘুরে' বেড়াচ্ছে। আজ আমার রক্তের মধ্যে সঞ্চরণ কর্‌ছে সেই তৃষ্ণা-ক্লিষ্ট মত্ততা, সেই নৃত্য-শীল নূপুর-ঝঙ্কারের রিনিঝিনি!

পড়্‌তে-পড়্‌তে ভাব্‌ছি, আর তো বেশি দেরি নেই! অন্ধকার রজনীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন আমিও কর্‌বো, তা'র যথার্থ রূপের সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াবো— আনন্দে স্পন্দমান, বেদনায় বিহ্বল!...এই বিষ্যুৎবারেই আমরা বোম্বে মেইল্‌-এ রওনা হ'য়ে যাচ্ছি। তারপর পি-এণ্ড-ও কোম্পানির বিরাট্‌ জাহাজ—আর চারদিকে অন্তহীন নীল সমুদ্রের ওপর অন্তহীন নীল আকাশ নুয়ে' পড়েছে। রেড্‌-সি, সুয়েজ্‌—তারপর হঠাৎ মেডিটেরা-নিয়ানের নীল নীর—স্ট্রেইট্‌ অব্‌ মেসিনা দিয়ে যেতে-যেতে সিসিলির অগ্নিহীন অগ্নি-গিরির সারি আকাশের গায়ে মিশে' আছে নব-বর্ষার ধূসর মেঘের আলিম্পনার মত!...আনন্দে, উৎসাহে আমার মন ক্লান্ত হ'য়ে আস্‌ছে, এই চিন্তার উত্তেজনা আর সইতে পার্‌ছি না! ধূম-ধূসর, কুয়াসা-ক্লিষ্ট, বিপুল, অতুল লণ্ডন; সুরা আর বিলাসিনীদের লীলা-নিকেতন প্যারিস্‌; সবল, সতেজ, সুন্দর ভিয়েনা; পরিচ্ছন্ন, কর্ম্মাচ্ছন্ন ব্যার্লিন্‌—আমার মন নিজের অলক্ষিতেই বার-বার এই-সব প্রদক্ষিণ করে' আস্‌ছে। ক্লিফর্ডের দেশে যাবো, ফোর্ডের দেশে যাবো, শেলি-বায়রন্‌-ব্রাউনিঙ্‌-এর কাব্য-মন যা'র সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছিলো, সেই ইতালিতে, যে-দেশে সব চেয়ে বেশি জল পাওয়া যায়, আর সব চেয়ে ভালো জলপাই ফলে, সেই গরম রক্ত আর গরম রোদ্দুরের দেশ স্পেইনে;—তুষার-শুভ্র রাশ্যাকে দেখ্‌বো—দুঃখী রাশ্যাকে, মহান্‌ রাশ্যাকে।...এই ছোট্ট পৃথিবীর পরিপূর্ণ রূপ এবার দেখ্‌বো, চোখের দৃষ্টিতে পুষ্প-বৃষ্টি হ'তে থাক্‌বে। উৎসুক আনন্দের ব্যাকুলতা আমায় চঞ্চল করে' তুলেছে,—আমার মন শীতারম্ভে দক্ষিণযাত্রী পাখীর ঝাঁকের মত আকাশে পাখা মেলে দিয়েছে।

"ও কী? এখনো ঘুমোও নি?"

পুরাণের পুনর্জন্ম

চেয়ে দেখি, স্বামী আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কথন্ যে সন্তর্পণে এসে ঘরে ঢুক্‌লেন, তা কিছুই টের পাই নি। বইখানা ভেজিয়ে রেখে বালিশে ঠেশ্ দিয়ে আমি উঠে' বস্‌লুম। স্বামী বিছানা থেকে সরে' গিয়ে টেবিলের ধারে বসে কাগজ-পেন্সিল্ নিয়ে কি যেন লিখ্‌তে লাগ্‌লেন। একটা জিনিষ লক্ষ্য করে' আমার কেমন যেন খট্‌কা লাগে—উনি নিজে কখনো আমার সঙ্গে বিদেশে যাওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নি। আমিও এ-পর্য্যন্ত বেচে কথা তুলি নি, কিন্তু আজ্‌কে এমন মনে হচ্ছিলো যে কোনো কথা বল্‌তে না পার্‌লে রক্তের চাপে আমার শরীর ফেটে যাবে।

আশা হচ্ছিলো, উনিই আগে কথা তুল্‌বেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত জগৎ ঘুরে' বেড়াবার সম্ভাবনায় তাঁর হৃদয়ও নিশ্চয়ই অস্থির ভাবে দুল্‌ছে—আমার মতোই। অথচ তিনি কী সব হিজিবিজি লিখে'ই চলেছেন, তাঁর নিঃশব্দে কম্পমান ওষ্ঠাধর দেখে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, একটা-কিছু'র হিসেব চল্‌ছে। ঘরে ঢুকে' সেই একটি কথা বলার পর আর একটিও বল্‌লেন না। তা যাওয়ার হ্যাঙাম্‌ও তো কম নয়। এদিক্‌কার সব গুছিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লে তবে তো—' হাতে মাত্র চারটি দিন আছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে' রইলুম, কিন্তু স্বামীর হিসেব শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে আর সইতে না পেরে আমি বলে' ফেল্‌লুম, "আচ্ছা, আমার পাস্‌পোর্ট জোগাড় করেছো তো?"

স্বামী এমন ভাবে আমার দিকে মুখ ফেরালেন যে আমার মনে হ'ল কেউ যেন ওদিক থেকে তাঁর গালে এক চড় মেরে জোর করে' এ-দিক-পানে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে।

চশ্‌মা-জোড়া চোখ থেকে খুলে' মোটা শেল্-এর ফ্রেম্ দুটো রুমাল দিয়ে ঘষ্‌তে-ঘষ্‌তে বল্‌লেন, "অ্যাঁ, কী বল্‌লে?"

পুরাণের পুনর্জন্ম

"আমার পাস্‌পোর্ট-এর কি জোগাড় হ'য়ে গেছে ?" আমার গলার স্বর আপ্‌না থেকেই মিইয়ে এলো।

"তার মানে ? পাস্‌পোর্ট দিয়ে তোমার কী হ'বে ?" স্বামী প্রশান্ত-ভাবে এই ক'টি কথা উচ্চারণ কর্‌লেন।

আমার মনে হ'ল, অনেক উঁচু দিয়ে আকাশ-যানে চল্‌তে-চল্‌তে যেন হঠাৎ পা পিছ্‌লে পড়ে' বিপুল বেগে এক কঠিন শিলার ওপর এসে ঠেক্‌লুম। চক্ষের নিমিষে আমার দেহের অস্থি-কণা পথের ধূলোর সঙ্গে অতি সহজে মিশে' গেলো। আমার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌লো; সত্যি-সত্যি আমার দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যায় নি, তা নিজের কাছে প্রমাণ কর্‌বার জন্যে একখানা হাত চোখের সাম্‌নে রেখে ভালো করে' দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। বুক চিরে' একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল—আর সেই সঙ্গে বেরিয়ে এল আমার রক্তের সমস্ত আনন্দ-চাঞ্চল্য, উৎসুক প্রতীক্ষার সমস্ত আগ্রহ, সব আশা; সব বেদনা।

খুব অস্পষ্ট ভাবে শুন্‌লুম, স্বামী বল্‌ছেন, "তুমি যেতে চাও ? তা আগে বলো নি কেন ? এখন তো আর সময় নেই ! Next mail-এ না গেলেই নয়।...তা দাদাও তো তোমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা কিছু বল্‌লেন না।"...

ঊর্ম্মিলা আজ মরে' গেল; তা'র দেহকে কল্‌কাতায় সমাধি দিয়ে তা'র স্বামী বিদেশ-যাত্রার উদ্যোগ কর্‌ছেন।

"নল্‌ডেরা" জাহাজ রামচন্দ্র এবং তাঁর কণ্ঠসংলগ্না পত্নী ও চরণানুগত ভ্রাতাকে নিয়ে আরব্যোপসাগর পাড়ি দিতে-না-দিতেই রাজা দশরথ পুত্র-বিচ্ছেদ-ক্লেশে ও আত্মগ্লানির জ্বালায় প্রাণত্যাগ কর্‌লেন।

পুরাণের পুনর্জ্জন্ম

কৌশল্যা ও সুমিত্রা কিছুকাল পর্য্যন্ত যথারীতি উচ্চৈঃস্বরে শোক-প্রকাশ করে' ধীরে-ধীরে যথারীতি শান্ত হ'য়ে এলেন, এবং পরে যথারীতি পূজা-অর্চ্চনা, দান-ধ্যান ও আহার-নিদ্রা করে' দিন ও রাত্রি যাপন করতে লাগ্‌লেন।

থিয়েটার রোডের সুসজ্জিত সুষমা বিরাট বাড়িখানা কবরের অন্তর-দেশের মত অন্ধকার হ'য়ে এলো; আর সন্ধ্যার ললাটে সন্ধ্যাতারার মত সেই অন্ধকারের মধ্যে জ্বলতে লাগ্‌লো—উর্ম্মিলা।

দশরথের মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত আঁটপাট ঢিলে হ'য়ে এলো। গিন্নিরা বিচরণ করতে লাগ্‌লেন তাঁদের অন্তঃপুরে তিথি-পর্ব্ব আর পূজা-পার্ব্বণ নিয়ে; উর্ম্মিলার সঙ্গে তাঁদের কোনো সংস্রবই প্রায় রইলো না। উর্ম্মিলাও তা'র নিজকে ঘিরে' সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি জগৎ রচনা করে' তা'রি মধ্যে নিজকে একেবারে লুপ্ত করে' দিলে।

সে-জগৎ একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে পরিমিত; তা'র চারদিকে চক্‌চকে আল্‌মারি সাজানো, তা'র মধ্যে পরিপাটি করে' সাজানো অজস্র বই। ফুলদানিতে যেমন করে' লোকে ফুল সাজায়, তেম্‌নি করে' উর্ম্মিলা বই সাজাতো, সস্নেহে, সযত্নে, সুচারুরূপে। তা'র হৃদয়ের সমস্ত মমতা তা'র দশটি রঙীন্ আঙুল দিয়ে ঝরে' পড়্‌তো বইগুলোর ওপর। সেইখানে বসে' সে যাঁদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করতো, তাঁরা মানুষের মূঢ়তাকে করুণার চক্ষে দেখেছেন, বিধাতার নির্ব্বুদ্ধিতাকে বিদ্রূপ করেছেন—শেইক্‌স্‌পীয়ার্ থেকে ব্যর্ণার্ড্ শ, পুশ্‌কিন্ থেকে চেহ্‌ভ্। রাত যখন গভীর হ'য়ে আস্‌তো, অ্যাশ্‌ফল্‌ট্-বাঁধানো কালো পথের ওপর যখন গ্যাসের শাদা আলো চিৎ হ'য়ে শুয়ে' ওপরে আকাশের বুকে শাদা ছায়াপথের আয়নায় নিজের ছবি দেখ্‌তো—তখন সে চুপ করে' শুন্‌তো,

আকাশের এপারের তারার সঙ্গে ওপারের তারা কী কথা বল্‌ছে, আর চাঁদের কলঙ্কের সঙ্গে সরসীর বুকের পঙ্ক।

মাঝে-মাঝে সে বাপের বাড়ি গিয়ে বাপের সঙ্গে পলিটিক্স চর্চ্চা কর্‌তো, আর মা'র সঙ্গে বায়োস্কোপ্। যে-সমস্ত যুবকের তা'র সঙ্গে লক্ষ্মণের বিয়ের পরদিন পট্যাশিয়াম্ সায়ানাইড্-এ পটল তোলার কথা ছিলো, ও-বাড়িতে তা'দের আবার ঘন-ঘন আনাগোনা সুরু হ'ল। ডুব জলে হাত-পা ছুঁড়্‌তে ছুঁড়্‌তে হঠাৎ যেন তা'দের পায়ের নীচে শক্ত মাটি ঠেক্‌লো। নিমন্ত্রণের জ্বালায় ঊর্ম্মিলা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো, আজ্‌কে চা-য়ে কাল ডিনারে, পর্‌শু বটানিক্যল্ গার্ডন্‌সে পিক্‌নিকে। সে নাকি আজকাল grass widow—একটু চেষ্টা কর্‌লেই নাকি তা'কে আজ ফুলের মালার মত গলায় জড়ানো যায়।...এ-সব কথা নানা ভাবে বিকৃত হ'য়ে তা'র কানে আস্‌তো, আর সে মনে-মনে হাস্‌তো। এই সব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর নাইট্‌দের নেমন্তন্ন সে কখনো প্রত্যাখ্যান কর্‌তো না ;—তবু তো সময় কেটে যায়, দু'একজন লোকের মুখ দেখ্‌তে পায়, একটু কথাবার্ত্তা কইতে পারে। একটু-একটু করে' বাইরের এই জীবন তা'কে একেবারে পেয়ে বস্‌লো ;—বায়োস্কোপ, থিয়েটার, পার্টি—নেশার মত তা'কে বশীভূত করে' ফেল্‌লো।...কিন্তু মনে-মনে সে এক স্বপ্নের জাল বুনে' চল্‌ছিলো—বিরহিনী পেনেলোপের মতই। সে জাল সম্পূর্ণ না-হওয়া পর্য্যন্ত সে কাউকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না—আর ভ্রাম্যমান ইউলিসিস্ ফিরে' না এলে তা সম্পূর্ণও হ'বে না।

একটা নেশা চাই, নইলে মানুষ বাঁচে না। ভালোবাসার নেশা, সাহিত্যের নেশা, ফূর্ত্তির নেশা—একটা-কিছুর মধ্যে নিজের সব-কিছুকে ডুবিয়ে না দিয়ে কেউ কি কখনো টিঁকে থাক্‌তে পেরেছে? জীবন-তরুর ডালে-ডালে মানুষ ফলের মত ঝুলে' রয়েছে ;—নেশার

বোঁটায় আটক হ'য়ে। নেশার ধরণ বদ্‌লায়, কিন্তু নেশা থাকে আমরণ।

দিন কেটে যেতে লাগ্‌লো ; দিনে-দিনে মাস, মাসে-মাসে বছব।

প্রতি শনিবার রাতে উর্ম্মিলার সহজে ঘুম হ'ত না—কখনো বা জেগে-জেগেই রাত ভোর হ'য়ে যেতো। রবিবার ভোর হ'তেই সে নীচের ঘবে গিয়ে বসে' থাক্‌তো—কখন্ ডাক-হর্‌করা এসে অচেনা টিকিটে অচেনা ছাপ-মারা চেনা হাতের লেখায় আঁকা একটি খাম তা'কে দিয়ে যাবে, সেই আশাতে। কোনোদিন খাম আস্‌তো, কোনোদিন একখানি পিক্‌চার-পোস্‌ট্‌কার্ড, কোনোদিন বা কিছুই না। দাদা-বৌদির খবর নিঃশেষ হ'লে নিজেব কুশল-জ্ঞাপন ও জায়গা থাক্‌লে একটু ভ্রমণ-কাহিনী বা দৃশ্য-বর্ণনা।...উর্ম্মিলা ভাব্‌তো, এমন চিঠি না লিখ্‌লেও তো চলে! তবু পবেব শনিবার বাতে আবার সেই চিঠিব আশাতেই ঘুম হ'ত না ;—ভাব্‌তো, তা'র চিঠিখানা বম্বে মেইল্‌-এ চেপে প্রতি ঘণ্টায় ষাট্‌ মাইল করে' তা'র দিকে এগিয়ে আস্‌ছে,...তবু এত দেরি!

ববি থেকে বুধবার পর্য্যন্ত সে মনে-মনে চিঠির নানারূপ খস্‌ড়া তৈবি কর্‌তো, বার-বার বদ্‌লাতো অপছন্দ হ'লে শোধ্‌রাতো—মনে-মনে সহস্র কাটাকুটি করে' কাগজ ছিঁড়ে' আবাব নতুন করে লিখ্‌তে সুরু কর্‌তো। তবু যখন বুধবার রাত্রে সে কাগজ-কলম নিয়ে লিখ্‌তে বস্‌তো, তখন তা'র কথা যোগাতো না, যে-কথা বুকের ভেতর থেকে কলমের মুখে আস্‌তো, তা'কে জোর করে' মনের অন্ধকারেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিতো ; মনের কথা এখানে মানায় না, বুকের ব্যথা লুকিয়েই রাখ্‌তে হয়।...

অনেক রাত পর্যান্ত কসরৎ করে' যা ফল দাঁড়াতো, তা এই ক'টি কথার মধ্যে বলে' শেষ করা যায়,—"দিদিকে প্রণাম দিয়ো। তুমি কেমন আছ? আমি ভালো।"—

তারপর লেফাফা বন্ধ করে' পৃথিবীর ম্যাপ্ খুলে' বস্তো! কল্কাতা থেকে লণ্ডন্—এ যে ভয়ানক কাছাকাছি! ইচ্ছে কর্‌লে হেঁটে যাওয়া যায় না? ঐ নীল রঙে আঁকা ছোট খালগুলো সাঁৎরে?—এখানে তো রাত দুটো বাজ্‌তে চল্‌ল—লণ্ডনে বোধ হয় সন্ধ্যেও হয় নি।...

লক্ষ্মণের চিঠি ক্রমেই সংখ্যায় স্বল্প ও আকারে কৃশ হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। ঊর্ম্মিলা শেষ চিঠির ঠিকানায় পর-পর তিন-চার খানা লিখ্‌লো কোনো জবাব পেলো না। তারপর সে-ও ছেড়ে দিলে।

লক্ষ্মণের একখানা চিঠির খানিকটা :

"7, Rue des Italiens
Paris
২০শে আগস্ট্

মাস খানেক ধরে' আমরা এখানে আছি। আরো কিছুদিন থাক্‌বো বোধ হয়। তারপর সবাই মিলে' ব্যর্লিনে যাবো। সেখানে দাদা এরোপ্লেনের কাজ শিখ্‌বেন। দাদার শরীর এখানে এসে দিন-দিন ভালো হচ্ছে। বৌ-দির যা চেহারা হয়েছে, তা না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে না। সেদিন একটা fancy-dress-ball-এ বৌ-দি gipsy-girl সেজেছিলেন। দেখে সবাই বল্‌ছিলো, সমবেত মহিলাদের মধ্যে অমন সুন্দর আর একজনো নেই। কাল হঠাৎ তাঁর কি করে' যেন একটু ঠাণ্ডা

লেগেছে। ভালো ডাক্তার দেখানো হচ্ছে—কোনো চিন্তার কারণ নেই।

ইতিমধ্যে আমি একবার মন্তে কার্লোয় গিয়েছিলাম। রুলেট্-এ আড়াই হাজার ফ্র্যাঁ হেরেছি। তা ও কিছু নয়; অমন সবাই হারে। আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন আমার একটি ফরাসী মহিলা-বন্ধু—ম্যাদ্‌মোয়াজেল্ মারী দ্যুপ্যঁ। মন্তে কার্লো ভারি সুন্দর জায়গা;—হোটেলগুলোও চমৎকার"...ইত্যাদি।

সেই সঙ্গে মারী দ্যুপ্যঁর একখানা ছবি। কনক-কেশী, সুনীলাক্ষী, বহ্নি-বরণী এক তন্বী তরুণী—প্রভঁসের তাজা গোলাপফুলটির মতই, নয় তো বা আঙুর-ছেঁচা শ্যাম্পেনের তরল সোনার মত। কি ভেবে যেন উর্ম্মিলা সেই ছবিখানি আর তা'র নিজের মুখ পাশাপাশি আয়নার মধ্যে দেখ্‌লে—অনেকক্ষণ।

লক্ষ্মণের শেষ চিঠির অংশ :

"39, Unter den Linden
Berlin
১২ই সেপ্টেম্বর্

এখানে এসে দাদা ব্যর্লিনের কাছাকাছি একটা ছোট শহর—Charlottenberg-এ Aeronautical School-এ ভর্ত্তি হয়েছেন। সেখানে এরোপ্লেন তৈরি ও চালানোর কাজ খুব ভালো করে' শেখানো হয়। প্রথম-প্রথম বিদেশী বলে' দাদাকে সেখানে নিতে চায় নি। কিন্তু জ্যর্ম্মানীর এক মস্ত নামজাদা General হেয়ার হাইন্‌রিখ্ হাইন্‌মান্-এর সঙ্গে দাদার প্যারিসে থাক্‌তেই বিশেষ বন্ধুতা হয়—তাঁরই সুপারিশে দাদা ভর্ত্তি হ'তে পেরেছেন। হেয়ার হাইন্‌মান্ প্রসিদ্ধ হ'লেও প্রবীণ

নন্—দাদার প্রায় সমবয়সীই। তাই বন্ধুতা এখন নিবিড় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়েছে। হেয়ার হাইন্‌মান্ বোধ হয় দাদার জন্য প্রাণও দিতে পারেন প্রয়োজন হ'লে—বৌ-দির প্রতিও তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। জ্যার্ম্মান্‌দের মধ্যে এত ভালো লোক থাক্‌তে পারে, তা আমার জানা ছিল না। গত সোমবার দিন তিনি দাদাকে নিয়ে এরোপ্লেনে করে' একবার ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন, ক্রয়ডেন্-এর aerodrome দেখ্‌তে। আমিও সঙ্গে গিয়েছিলাম।

সম্প্রতি একটু চিন্তার কারণ ঘটেছে। রাবণ রক্ষ বলে একজন প্রাচ্য রাজার সঙ্গে এখানে এসে আমাদের আলাপ হয়। সে জাভা না কোথাকার কাছাকাছি একটা ছোট দ্বীপের মালিক! লোকটি প্রায়ই আমাদের বাসায় আসে—যদিও দাদা তাকে আদৌ পছন্দ করেন না, আমিও করি নে। লোকটার মধ্যে কেমন যেন একটা অকপট বর্ব্বরতা আছে—ট্রপিক্‌সের উগ্র রৌদ্রের রুদ্র দীপ্তি যেন ওর সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত হ'য়ে আছে। লোকটার চেহারাও জমকালো—প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা, গায়ের শাদা রঙ্ রোদে ঝল্‌সে বাদামি হ'যে গেছে, মাথায় এক ঝাঁকড়া লম্বা চুল, প্রকাণ্ড চোখ দু'টো সর্ব্বদাই লাল হ'য়ে আছে। পরশুদিন বিকেলে আমরা কেউ বাড়ি ছিলাম না—সে সেই ফাঁকে বৌ-দিকে নিয়ে কোথায় যেন চলে' গেছে। চাকরদের জিজ্ঞেস্ করে' জান্‌লুম, সেই সন্ধ্যায় ভিয়েনায় একটা অপেরা দেখ্‌বার জন্য বৌদি এরোপ্লেনে রাবণের সঙ্গে চলে' গেছেন। কিন্তু দু'দিন হ'য়ে গেলো এখনো বৌ-দি ফিরছেন না কেন, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। রাবণ লোকটা আবার তত সুবিধের নয়;—দাদা তো রীতিমত ভয় পেয়ে গেছেন। হেয়ার হাইন্‌রিখ্‌কে দিয়ে চার্‌দিকে খোঁজ নে'য়াচ্ছি।...ভিয়েনায় একটা wireless পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু তারো জবাব আসে নি।"

এম্‌নি আরো সব কথা। দাদা আর বৌ-দি—তাঁদের ক্ষুদ্রতম সুখ, তুচ্ছতম দুঃখের কাহিনী। উর্ম্মিলা ভাবলে, হয়-তো সে সত্যি মরে' গেছে। নিবে'-যাওয়া দীপের স্মৃতি-শিখাকে কি আর কেউ মনে করে' রাখে?

•

উর্ম্মিলার ডায়েরী থেকে :

হালে অনেক কথাই ভুল্‌তে সুরু করেছি, কিন্তু আজ্‌কে ঘুম থেকে উঠ্‌তেই মনে পড়্‌লো যে আজ পয়লা আষাঢ়। আমি জান্‌তুম যে আজ বৃষ্টি হ'বে, যদিও সকালবেলায় নীল আকাশে শাদা রোদ ঠিক্‌রে পড়্‌ছিলো, আর অত বড় আকাশটার কোথাও একটু মেঘের চিহ্নও ছিল না।

কিন্তু বিকেল থেকেই ধারা-বর্ষণ সুরু হয়েছে। এক বন্ধুর বাড়িতে টেনিস্‌-এর নেমন্তন্ন ছিলো—যেতে আর পারি নি। আমার এই বই-ঘেরা ছোট্ট ঘরটিতে বসে' লিখ্‌ছি।

হিসেব কর্‌তে ইচ্ছে করে না, তবু অনেক সময় ভাবি এই তো দশ বছর হ'ল! তখন আমার বয়েস ছিল আঠারো, এখন হয়েছে আটাশ। লোকে বলে, আমি নাকি সেই আগের মতই আছি—অর্থাৎ, তেম্‌নি রমণীয়, তেম্‌নি লোভনীয়। সেদিন স্নান কর্‌বার আগে আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছিলাম, কই, বুড়ো হ'বার কোনো লক্ষণ তো এখনো দেখা যাচ্ছে না! কপালে একটি বলি-রেখার চিহ্নও তো পড়ে নি, চুল তো তেম্‌নি কালো, ঠোঁট তো তেম্‌নি লাল! মনে-মনে ভাব্‌ছিলাম, এ আগুন নিব্‌বে কবে? যে-তিন্‌টে জিনিষের অত্যন্ত

ক্ষণস্থায়ী বলে' বদনাম আছে, সেগুলো আমার কাছে এসে এত বেশি টি‍ঁকে যাচ্ছে কেন, বুঝি না।

আমার দেহের এই দীপশিখা দেখে যে-সব পতঙ্গের পাখা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছে তা'রা বড় ভুল কর্‌ছে। আমার এ-আলো জোনাকির আলো—উজ্জ্বল বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা। কেউ যদি ছুটে' আসে, তা হ'লে দেখ্‌বে, এ নিতান্তই একটা অলীক, অবাস্তব জিনিষ—হয়-তো বা চোখের একটা ভুল। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এমন কি মনের সুখে পুড়ে'ও মরা যায় না।

এ-কথাটা কিন্তু আমি কাউতে বোঝাতে পার্‌লাম না এ পর্য্যন্ত। তা'রা আমার কাছ থেকে কত-কিছু আশা করে, তা'দের স্নেহে, তা'দের সৌজন্যে, তা'দের আনন্দের দানে আমি নিত্য বিব্রত। তাদের এ-ঋণ আমি শুধ্‌বো কী করে'? আমার যে কিছুই নেই—উর্ম্মিলা যে মরে' গেছে, দশ বছর আগে এক শুক্ররাতে সবার অলক্ষিতে! এদের কাছে আমি লজ্জিত হ'য়ে পড়ি, এদের জন্য দুঃখ হয়।

সব চেয়ে বেশি দুঃখ হয় সুমন্ত্রর জন্য। আমার বিশ্বাস, ও মরে' গেলে ওর শ্মশানের ওপর দিয়ে যদি আমি হেঁটে যাই, তা হ'লে ওর ছাই হয়-তো প্রাণ পায়। আমার পায়ে ও ওর সব-কিছু উজাড় করে' দিতে চায়, কিন্তু ওর ঐ পরম স্নেহের, পরম শ্রদ্ধার উপহারকে আমি গ্রহণ করে' অপমান কর্‌তে পারি না।

ওর বিষণ্ণ চোখ দু'টি নীরবে অভিযোগ জানায়। আমার মন অক্ষমতার ব্যথায় ভরে' ওঠে। অনেক সময় বলে, "উর্ম্মিলা, এত করে'ও তোমার মন পেলাম না।"

আমি চুপ করে' থাকি। হায় রে আমার মন! ও-বস্তুকে আমার বল্‌বার অধিকার যদি আমার থাক্‌তো, তা হ'লে কি আর আজ আমায়

এ-দশা হ'ত !—একদিন নিউম্যানের দোকানে একটি ক্ষীণদৃষ্টি, ক্ষীণদেহ লোকের সঙ্গে আমার চোখ মিলেছিলো। সেই একটি দৃষ্টির সঙ্গেই আমার সব কিছু দিয়ে ফেলি—আমার মন, আমার দেহ—আমার আত্মা, স্বর্গ, ঈশ্বর—সব ! একবার দিলে নাকি আর ফিরিয়ে নে'য়া যায় না। আমিও পারি নি। সে কতদিনকার কথা ? এই তো সেদিন—কাল, কি পরশু—না, দশটা বছর, পুরোপুরি দশ।

আমার নীরবতা সুমন্ত্রকে আরো বেশি পীড়া দেয় ! হয়-তো ওর চোখ ছল্-ছল্ করে' ওঠে। আমি তখন ওকে কোনো মতে শান্ত করি—হয়তো একটু হাতে ধরে', না হয় হেসে একটু কথা বলে'। ছোট ছেলেকে মা যেমন করে' বুঝ্ দেয় ! ঐটুকুতেই ও খুসি—ঐ নরম চামড়ার একটু ছোঁয়ায়, দু'-একটা দম-দে'য়া মিষ্টিবুলি আওড়ানোয়। ও যদি বুঝ্‌তো, ওকে কী ভয়ানক ঠকাচ্ছি—

আমাকে এক মুহূর্ত্ত কাছে পাবার জন্য, আমার সঙ্গে সম্পর্কটা একটুখানি গাঢ় করে' তোল্‌বার জন্য সুমন্ত্রর সে কী প্রচেষ্টা, অসম্ভবকেও সম্ভব করে' তোল্‌বার জন্য কী দুর্জ্জয় পণ ! এই তো সেদিন খুব ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ছুটে এসে বল্‌ছিলো, "আমি একটা ফিল্ম্-কোম্পানি start কর্‌ছি, ঊর্ম্মিলা, তোমার সহায়তা চাই !"

ওর উৎসাহের সম্মান যথাসাধ্য রেখে বল্‌লাম, "যথাসম্ভব পাবে।"

ও অনর্গল বকে' যেতে লাগ্‌লো—নাম হ'বে মাধুকরী ফিল্ম্ কোম্পানি, দু'লক্ষ টাকা ক্যাপিটাল্ উঠেছে—ও নিজে দিয়েছে পঞ্চাশ হাজার—অভিনেতাও অনেক জোগাড় হ'য়ে গেছে—আপাতত অভাব হচ্ছে অভিনেত্রীর। সেই অভাবটি পূরণ হ'লেই ওরা নাকি এমন-সব ছবি বা'র কর্‌তে পার্‌বে, যা বাঙ্‌লা দেশে তো হয়-ই নি, আমেরিকাতেও খুব কম হয়েছে। এবং মাতৃভূমির এই শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য আমাকে

পুরাণের পুনর্জন্ম

ওদের প্রথম ছবি "চরিত্রহীনে" কিরণময়ী সাজ্‌তে হ'বে। দশ রিল্‌ ছবি—super-super-production! জগৎ-জোড়া খ্যাতি, বিপুল অর্থাগম, আর্টের সেবা, দেশের উন্নতি!

সমস্ত খবর শুনে' চমৎকৃত না হ'য়ে পার্‌লুম না। বল্‌লুম, "আচ্ছা বেশ, কিন্তু দিবাকর কে সাজ্‌বে, তুমি তো?"

বেচারা কথাটা শুনে' আকণ্ঠ এমন লাল হ'য়ে উঠ্‌লো যে আমার নিজেরই লজ্জা করতে লাগ্‌ল। আম্‌তা-আম্‌তা করে' সে যা বল্‌লে, তা থেকে বুঝ্‌লুম যে হ্যাঁ—সেই রকমই কথা আছে বটে!

বল্‌লুম, "এক কাজ করো না! তুমি সতীশ সাজো আর আমি সাবিত্রী। তা'তে আর ক্ষতি কী? আজকাল কত ফিল্মেই তো একই লোক দুটো role নিচ্ছে,—যে সব scene-এ দু'জনেই আছে, সেখানে double photography কর্‌লেই হ'বে!

সুমন্ত্রর মুখ দিয়ে সেদিন আর একটি কথাও বেরোয় নি। এমন কি, চায়ের পেয়ালাটা এমন নিঃশব্দে, নতমুখে নিঃশেষ কর্‌লে যে শেষে আমার ভয়ানক দুঃখ হ'তে লাগ্‌লো।

সুমন্ত্রকে, সেদিন, অমন নিষ্ঠুর ভাবে ব্যথা দিয়ে নিজেই এখন বেদনাবোধ কর্‌ছি। উৎসাহ-দীপ্ত মুখ নিমেষে ম্লান হ'য়ে গেল, উত্তেজনাময় কথা মিইয়ে এল। অনেক সময় ভাবি, ও যে আমাকে কতখানি ভালোবাসে, তা নিজেই হয়-তো বুঝি না। কিন্তু বুঝ্‌লেই বা কী করতে পার্‌তুম! আমার ভাঁড়ার ঘর বোঝাই-করা মিষ্টি রয়েছে, কিন্তু সে-ঘরের চাবি আর-একজনের কাছে, সে আমি কারো পাতে পরিবেষণ কর্‌তে পার্‌বো না। ইচ্ছে থাক্‌লেও সে-ঘর খোলার আর উপায় নেই। আমার হাত শূন্য···আমি কাউকে কিছু দিতে পারি না···তাই অন্যের দানও বোঝার মত লাগে।

পুরাণের পুনর্জন্ম

আজ্‌কের এই বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যাটি আমাকে একটি বিরল অবকাশ এনে দিয়েছে বলে'ই এ-সব কথা ভাব্‌তে পার্‌ছি। বৃষ্টির দাপটে যখন মানুষের বাইরের কাজকর্ম্ম সব অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, তখন তা'র মন স্বভাবতই ভেতরের দিকে গুটিয়ে আসে। নইলে আমি নিজের সম্বন্ধে ভাবাকে একটা খুব উঁচু ধরণের বিলাসিতা বলে' বর্জ্জন করে'ই আস্‌ছি। বাইরে থেকে দেখ্‌তে গেলে আমার জীবনটা বেশ ভর্‌পুর— আমি হাসি, খেলি, গান গাই, অবিশ্রান্ত কথা বলি, কল্‌কাতার যেখানে যা-কিছু হয়, সবগুলোতে যোগ দিই, কিন্তু তা যে একটা বাতাস-আঁটা ফুটবলের মত, সে-খবর শুধু আমিই জানি। তার ওপর ছোট্ট একটি কাঁটা বিধ্‌লেই সব ভেপ্‌সে' চিম্‌সে' দুম্‌ড়ে' অতটুকু হ'য়ে যায় একেবারে।

আজ্‌কে নিজের জীবনটার এই যথার্থ রূপ বেরিয়ে পড়েছে। তা'র পানে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমি ভয়ে আঁৎকে' উঠ্‌ছি। আজ দেখ্‌ছি শুধু প্রকাণ্ড একটা কাঁটা বিঁধে' রয়েছে, প্রকাণ্ড একটা ঘা লাল মুখ বের করে' হাঁ করে' আছে, তা' দিয়ে একটু-একটু করে' সমস্ত রক্ত চুঁইয়ে পড়্‌ছে।

মস্ত ফাঁকা—ঐ মেঘ-মলিন, তারা-বিহীন আকাশটার মতই। ভাব্‌তে-ভাব্‌তে পৃথিবীর উত্তর-সীমান্তের মেরু-মরুর ছবি মনে জাগে; —নীচে ধূসর তুষার ধূ-ধূ কর্‌ছে, ওপরে ধূসর আকাশ। সে-আকাশে কখনো সূর্য্যি ওঠে না, তারা ফোটে না, চাঁদ দেখা দেয় না। সেখানে আর কোনো রঙ্‌ নেই—না গাছপালার সবুজ, না মেঘের কালো, না রোদের শাদা! চার্‌দিকে অস্পষ্ট, ধূসর কুয়াশার জাল, হিম কুয়াশা, জমাট কুয়াশা।

একটা কথা নিজের কাছে স্বীকার কর্‌তেও লজ্জা করে। তা'র চেয়েও বেশি লজ্জা করে এ-কথা ভেবে যে, সে-কথাটি কখনও ভুলে'

থাকতে পারি না। ভুলতে আর পারলাম কই? সেই স্বল্পদৃষ্টি—কাছের জিনিষের জন্যও হাতড়ানো,—ভীরু চোখের সেই করুণ, অসহায় দৃষ্টি, কথা বলার সেই বিনম্র মধুরতা—সেই নিউম্যানের দোকান। · আজকাল বরাবর থ্যাকার্ স্পিঙ্ক-এই যাই!

একখানা চিঠি পাই নে, সে-ও তো বুঝি আট বছর হ'তে চললো। শুধু এক টুকরো কাগজ—তা'র ওপর কয়েক ছত্তর লেখা। আমারো যে "সাড়ে চুয়াত্তর" এর অবস্থা হয়েছে, সে-কথা কা'কেই বা বলি? আমার grass widow নামের আগের কথাটি এতদিনে ঘুচে' গেছে কিনা, তা-ই বা কে জানে?

না-জানি দিদিই বা কেমন আছেন। শেষ চিঠিতে তাঁর সম্বন্ধে যে-খবর ছিল, তা' থেকে অনেক কিছুই অনুমান করা যায়। এমন হঠাৎ ভিয়েনায় অপেরাতে যাওয়ার মানে কী? দিদি ভালো থাকলেই বাঁচি—আমার যা হবার তা তো হ'লই, তা'র ওপর কারো হাত নেই, কিন্তু দিদির জীবনের ওপর নামুক্ তারার আলো, নামুক্ শরৎ-উষার শেফালি-সৌরভ, নামুক্ তটিনীর রজত-মেখলার সুর-গুঞ্জন!

আজ বড় ইচ্ছে করছে, একখানা চিঠি লিখতে—দীর্ঘ, সুন্দর, স্নিগ্ধ একখানা চিঠি। কিন্তু ঠিকানা জানি নে। জানলেও বোধ হয় লিখতাম না। আমার যে-চিঠি কখনো লেখা হ'বে না, তা থাকুক্ আমার অন্তরের অনির্ব্বাণ দীপশিখা হ'য়ে, থাকুক্ এই খাতার লাইনের ফাঁকে-ফাঁকে, আমার স্বপ্নে, থাকুক্ ঐ কাজল-কালো আকাশের কোলে, এই উচ্ছৃঙ্খল বাতাসের নিঃশ্বাসের মাঝে!

এই লেখার তারিখের বছর চারেক পরে একদিন হঠাৎ বম্বে থেকে

পুরাণের পুনর্জন্ম

রামচন্দ্রের এক টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত—আগামী শনিবার তাঁরা সবাই কল্‌কাতায় পৌঁছ্‌ছেন।

দুই বা তিন দিনের জন্য ভগবানকে তাঁদের ভক্তির প্রাবল্য থেকে ছুটী দিয়ে ঘর-গোছানোর কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত কর্‌লেন। তাঁদের উৎসাহের আধিক্যে চোদ্দ বছরের সঞ্চিত অপরিচ্ছন্ন বিশৃঙ্খলতা চোদ্দ ঘণ্টায় একেবারে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে হ'য়ে গেলো।

ঊর্ম্মিলার ঠোঁট ও গাল দু'টি হঠাৎ আরো বেশি রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। একেবারে ফেটে পড়্‌তে চায় যেন।

ঊর্ম্মিলা নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাওড়া স্‌টেশ্‌নে গেল। শহরের সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে তা'র বুকের বাজ্‌না আজ ওপরে উঠেছে।

হু-হু করে' বম্বে মেইল্ এসে ঊর্ম্মিলার চোখের সাম্‌না দিয়ে ছু'টে যেতে লাগ্‌লো। এক-এক জান্‌লা এক-এক সেকেণ্ড। তবু মুখ চেন্‌বার পক্ষে ঐ যথেষ্ট।

ঐ যে!—না?

ঊর্ম্মিলার বুকের ভেতরকার যন্ত্রটা ভয়ানক জোরে চল্‌তে-চল্‌তে হঠাৎ থেমে গেলো।

সীতার হাত ধরে' পাইপ্-মুখে রামচন্দ্র নাব্‌লেন। তারপর লক্ষ্মণ। তা'র মুখেও পাইপ্। ঊর্ম্মিলাকে দেখে শুধু বল্‌লে—"এই যে"—বলে' তা'র হাতখানা নিয়ে আঙুলের ডগা ক'টি একটু ছুঁয়ে'ই অন্যদিকে ফিরে' হাঁক্‌লে, "এই কুল্—ঈ, এধার আও!"

রাম ও সীতার পর ঊর্ম্মিলা গাড়িতে উঠে' সীতার একটু গা ঘেঁসে বস্‌লে। বেশ বড় গাড়ি—চার জনে দিব্যি বসা যায়। কিন্তু গাড়িতে যখন স্‌টার্ট্ দিচ্ছে, তখন লক্ষ্মণ কুলিদের ভাড়া চুকোতে ব্যস্ত। তারপর

গাড়ি যখন চল্‌তে সুরু কর্‌লো, তখন সে তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা না খুলে'ই সোফারের পাশে গিয়ে বস্‌লে।

পনেরো মিনিটের পথ!

সেইদিনই রাত দশটাব সময় উর্ম্মিলা বিছানাব ওপর গা এলিয়ে দিয়ে মড়ার মত অসাড় হ'য়ে পড়ে' ছিলো। আজ্‌কে আব তা'র হাতে বই ছিলো না।...

কতদিন পর সে আবার বিছানায় শুয়ে' কাবো প্রতীক্ষা কর্‌ছে। সে অনেকদিন। আজ থেকে বোধ হয় তা'ব নব-জীবন সুরু হ'ল। এই সারাটা সময় সে মরে' গিয়েছিলো—আজ দেবতা এলেন মৃতসঞ্জীবনী নিয়ে।

কিন্তু সবার মধ্যেই যেন কেমন একটা পবিবর্ত্তন এসেছে। তাঁদেব মুখের দিকে তাকালেই উর্ম্মিলার কেমন যেন ভয়-ভয় কর্‌তে থাকে। মুখ নয় তো মুখোস্—যেন অনেক কথা তা'র আড়ালে লুকিয়ে আছে, যা বলার জন্য ঠোঁট কেঁপে' ওঠে বার-বার, কিন্তু কখনো বলা হয় না। কী সে রহস্য, যা ওরা এম্‌নি কবে' তাব কাছ থেকে লুকিয়ে চলেছে? সে কি কোনোকালেও তা জান্‌তে পাবে না। বামচন্দ্রকে দেখে' মনে হয়, যেন একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ সচেতন হ'যে উঠে' তিনি বুঝ্‌তে পেরেছেন যে ও কিছুই সত্যি নয়, স্বপ্নমাত্র—এমনি একটা অসীম আরামের চিহ্ন তাঁর মুখে। লক্ষ্মণের সমস্ত কথাবার্ত্তা, অঙ্গ-ভঙ্গীর মধ্যে যে-জিনিষটা ফুটে' ওঠে, তা'র নাম উর্ম্মিলা কী দেবে, ভেবে ঠিক কর্‌তে পারে না। সে কি গর্ব্ব? নাঃ—অত শান্ত, নিরীহ ভালোমানুষকে তা' মানায় না। তবু তা'কে দেখে-দেখে মনে হয়

সে যেন জয়ের স্বাদ পেয়েছে, তাই তা'র অমন শীতল শোণিতও ঈষৎ উষ্ণ হ'য়ে উঠেছে। সীতাকে সে একেবারেই বুঝে' উঠ্‌তে পারে না। একবার সে বলেছিলো বটে, "তোকে অনেক কথা বল্‌ব, উর্মি"—বলে' অদ্ভুতভাবে একটু হেসেছিলো। ঊর্ম্মিলা সে-হাসির কোনো মানে করতে পারে নি। কাল সে স্পষ্ট জিজ্ঞেস্ করে' সব জান্‌বে। এ তা'র অসহ্য লাগ্‌ছে।...কিন্তু থাক্, ও-সব ভাবনা ভেবে আর কী হ'বে?... তা'র নিজের মধ্যে আজ যে একটি নতুন মানুষ জন্ম নিয়েছে, তা'র সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্‌তেই—

ওপরে ওঠ্‌বার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হ'ল, সেই পায়ের শব্দ একটু-একটু করে' তা'র ঘরের দরজার দিকে আস্‌তে লাগ্‌লো। ঊর্ম্মিলা প্রাণপণ শক্তিতে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে' সমস্ত দেহটাকে শক্ত করে' প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লো;—অমন প্রতীক্ষা সে জীবনে আর করে নি।

পায়ের শব্দ দরজা ধর-ধর হয়েছে, পরের মুহূর্ত্তেই দুয়ার খুলে' যাবে—এমন সময় রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—"লক্ষ্মণ।"

"দাদা!"—পায়ের শব্দ থম্‌কে দাঁড়ালো।

"এই journeyতে শরীরটা ভারি বিচ্ছিরি লাগ্‌ছে। চলো না Firpoর ওখান থেকে আসি—let's have some good drink,—ready?"

পায়ের শব্দ আস্তে-আস্তে যে-পথে এসেছিলো, সেই পথেই ফিরে' গেলো। তারপর সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে মিলিয়ে গেলো। দুয়ার আর খুল্‌লো না।

ঊর্ম্মিলা বহুক্ষণের রুদ্ধ নিঃশ্বাস এক সঙ্গে ছেড়ে দিলো। ছোটখাটো একটি ঝড়। তা'র সারা দেহ অবশ, শিথিল হ'য়ে এলো। টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে খসে' পড়্‌ছে।

পুরাণের পুনর্জন্ম

সে-রাতের মতই অনেকটা।

উর্ম্মিলার ডায়েরি থেকে :

আজ সকালে বেরুবার আগে স্বামী বল্‌লেন, "দ্যাখো, রান্নাব একটু বিশেষ আয়োজন করিয়ো। আজ দু'-চারজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছি।"

"কেন?"

স্পষ্টই বোঝা গেল, স্বামী একটু অবাক্ হ'লেন। বল্‌লেন, "সে কী? তা-ও জানো না?"

একটু ভাব্‌তে হ'ল। ও, আজ্‌কে বুঝি নববর্ষেব দিন!

স্বামী তো আমার ওপর বান্নার ভার দিয়ে বেবিয়ে গেলেন, এদিকে আমি লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে খিল এঁটে বস্‌লুম। যা ইচ্ছে বান্না হোক্ গে, না হ'লে না হোক্!

নতুন বছব বল্‌তে দেহে-মনে যে একটা আনন্দের চঞ্চল অনুভূতি—তা আর আমার মধ্যে আসে না। অন্তবেব আনন্দ-উৎস শুকিয়ে গেছে, তাই বাইরে থেকে কোনো রসই আর আহবণ কর্‌তে পারি নে। এই তো স্বামী দেশে ফির্‌বার পব তিন্‌টে নববর্ষ এলো—তিনবারই আমাকে সে-কথা মনে কবিয়ে দিতে হয়েছে।...আমার সেই চোদ্দ বছরের অভ্যস্ত, পরিচিত জীবনই চল্‌ছে, এ কখনো বদ্‌লাবে না। বই আর বাইরেটার মধ্যেই আমার জগৎ এখনো সীমাবদ্ধ। স্বামী সারাদিন প্রায় বাইরে-বাইরেই থাকেন—জমীদারির কাজকর্ম্মে ভাসুর-ঠাকুরকে সাহায্য করেন, বৌ-দিকে নিয়ে বেড়াতে যান, বৌ-দির ফুট্-ফবমাস্ খাটেন—ফুট্‌ম্যান্‌গিরি করেন। অনেক রাতে যে একবার ঘরে আসেন, তা কেবল ঘুমোবার জন্য।

পুরাণের পুনর্জন্ম

সুমন্ত্রকে আজকাল আর বড় একটা দেখি না। স্বামী আস্‌বার পর ঘাব্‌ড়ে' গেছে। এবারেও ও আমাকে ভুল বুঝ্‌লে।

আজ জোর করে' বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছি, যদি কোথাও একটু নতুন রঙ্‌-এর আমেজ লেগে থাকে! কিন্তু কই? সেই বাড়ির ছাতের ওপর নেতিয়ে-পড়া আকাশের নীলিমা, রৌদ্রদীপ্ত প্রভাতের এই ভাস্কর জ্যোতি, সবুজ পাতায়-পাতায় আলোর ঝিকিমিকি, ফুটপাথের ভিড়, রাস্তার কোলাহল, অ্যাস্‌ফল্টের গন্ধ—সবই পুরোনো, ভয়ানক পুরোনো! নববর্ষে এরা কিছুমাত্র নতুন হয়েছে বলে' তো মনে হচ্ছে না। তা অবিশ্যি কোনো কালেও হয় না। নতুন হয় মানুষের চোখ—কবিদের চোখ বল্‌লেই কথাটা মানান্‌সই হয় বোধ হয়।

বসে'-বসে' সত্যেন দত্তের "নওরোজের গান" পড়্‌ছি। সে-ও তো নববর্ষেরই কবিতা!—কিন্তু কবিরা যে-চোখে দেখেন, সে-চোখে দেখ্‌বার ক্ষমতা হারিয়েছি।

মনের মধ্যে একটা লাইন্‌ বার-বার ঘোরাফিরি কর্‌ছে—"ভগবানের দোহাই তোমার একটি খোকা হোক্‌!"

শত যুগের শত নারীর মমতায় স্নিগ্ধ ঐ কয়টি কথা, চোখের জলে ভেজা।

নববর্ষের স্বচ্ছ আকাশের গা'য় অদৃশ্য অক্ষরের লিখন পড়্‌ছি, "একটি খোকা হোক্‌।"

লেখাটা প্রেসে দিতে যাবো, এমন সময় উর্ম্মিলা দেবীর কাছ থেকে এক চিঠি পেলাম। লিখেছেন, "শুনলাম আমার অপ্রকাশিত বইটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও bowlderise করে' আপনারা আপনাদের কাগজে ছাপাতে যাচ্ছেন। ছাপা হ'বার আগে লেখাটা একবার দেখ্‌তে চাই। বুধবার বিকেলে বাড়ি এলে আমার দেখা পাবেন।"

অনন্যোপায় হ'য়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উর্ম্মিলা দেবীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর্‌বার পর বেয়ারা এসে আমাকে তাঁর লাইব্রেরি-ঘরে নিয়ে গেলো।

উর্ম্মিলা দেবী তখন এক পেয়ালা কোকো খেতে-খেতে একখানা নতুন "L' Illustration"-এর পাতা ওল্টাচ্ছিলেন! আমাকে দেখেই বই থেকে চোখ তুলে' বল্‌লেন, "এই যে, আসুন্—নমস্কার। লেখাটা এনেছেন তো?"

কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লাম' "হ্যাঁ"।

"দেখ্‌তে পারি?"

পকেট থেকে কাগজের তাড়াটা বার করে' ভীতচিত্তে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি চক্ষের নিমেষে তা'র মধ্যে ডুবে' গেলেন। আমি ততক্ষণ লাইব্রেরির বইগুলোর পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হ'লাম। হ্যাঁ— লাইব্রেরি বটে! দেখে-দেখে শুধু একটা কথাই মনে হ'তে লাগ্‌লো যে তা'র মধ্যে যত বই'র নাম শুনেছি, তা'র চেয়ে যত বই'র নাম শুনি নি, তা'র সংখ্যা বেশি।

উর্ম্মিলা দেবী পড়া শেষ করে' কাগজগুলো আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "আমায় এখন একটু বেরুতে হ'বে। বালীগঞ্জে যাবো। আপনার কি আমার সঙ্গে যাওয়ার সুবিধে হ'বে?"

"আমি ভবানীপুর যাবো। খানিকটা পথ অন্তত, এক সঙ্গে যাওয়া যায়।"

"বেশ, থ্যাঙ্ক-ইউ।"

গাড়ি-বারান্দায় একখানা Baby Austin দাঁড়িয়ে ছিলো। তিনি সেটা দেখিয়ে বললেন, "এটা আমার নিজের ব্যবহারের জন্য। অনেক সময়—কিছুই যখন ভালো লাগে না—তখন এটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, যে দিকে দু' চোখ যায়। অনেকদিন গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড্ ধরে' বহু দূর চলে' যাই।"

গাড়ি চল্‌তে লাগ্‌লো। Steering wheel-এর ওপর ন্যস্ত উর্মিলা দেবীর পাণ্ডুবর্ণ, নীলরেখাঙ্কিত, নিটোল হাত দু'খানি আমি মুগ্ধ চোখে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। তাঁর পাশে বসে' নিজকে অত্যন্ত ছোট ও বেখাপ্পা বোধ হ'তে লাগ্‌লো।

খানিক পরে তিনি আমার দিকে ফিরে' বল্‌লেন, "আপনার লেখাটা বেশ হয়েছে, তবে কিনা আমার স্বামীর প্রতি একটু অবিচার করা হয়েছে বলে' আমার মনে হয়।"

আমি অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস্ কর্‌লাম, "কী করে'।"

উড়ন্ত চুলগুলোকে ডান্ হাত দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "তাঁর জীবনে এক তাঁর দাদা ছাড়া আর কারো স্থান ছিল না, রামচন্দ্রের জন্যই তিনি সব কিছু ত্যাগ কর্‌লেন—আমাকে শুদ্ধ। অত বড় একটা ভালোবাসা কি ফেল্‌বার জিনিষ? তা' হ'লে আমাকেও তো দোষ দিতে পারেন, সুমন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছি বলে'। কিন্তু আমি কী কর্‌বো? আমার জীবনেও সেই একটি লোকেরই স্থান ছিলো। সুমন্ত্র আর আমার জীবনের ট্র্যাজিডি মূলতঃ একই।"

আমি জিজ্ঞাসু নয়নে তাঁর মুখের দিকে একবার তাকালাম।

পুরাণের পুনর্জন্ম

উর্ম্মিলা দেবী বলতে লাগ্‌লেন, "তারপর দেখুন্‌, মা হ'বার জন্য একটা অতি প্রচণ্ড লোভ আপনি আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। ও-লোভ অবিশ্যি কম-বেশি সব মেয়েমানুষেরই থাকে, তবে মাতৃত্বের ভেতর দিয়ে কারো অন্তরের একটা বিকাশ হয়, কারো বা হয় না। দুঃখের বিষয় আমার হয় নি। আমিও তো এখন মা হয়েছি, কিন্তু শুন্‌লে অবাক্‌ হবেন, ছেলেদের প্রতি বোধ হয় আমার খুব কমই স্নেহ আছে। ভেবে-ছিলাম, মা হ'বার সঙ্গে-সঙ্গে বুঝি আমি নব-জন্ম নেবো, কিন্তু কই, কিছুই নয়—সবই আগের মত—অর্থহীন, ফাঁকা।"

মসৃণ অ্যাস্‌ফল্‌টের ওপর দিয়ে তীবের বেগে বেইবি-অ্যাস্‌টিন্‌ ছুটে' চল্‌লো। এল্‌গিন্‌ রোড্‌ পেরিয়ে এসে উর্ম্মিলা দেবী আবার বল্‌লেন, "আজ মনে হয়, জীবনে বুঝি শুধু একজনকেই ভালোবেসেছি—সেই ভালোবাসার বিকাশ হ'তে পার্‌লে সমস্ত জগৎটার ভেতর দিয়ে আমার সমস্ত প্রেম তা'রই কাছে পৌছ্‌তো। তা হয় নি বলে' জগতের কারো প্রতিই আর আমার মমতা নেই—আমার ছেলেদের জন্যও নয়।—ও—আপনি বুঝি এইখেনে নাম্‌বেন—আচ্ছা, খুব খুসি হ'লাম আলাপ করে'—মাঝে-মাঝে আস্‌বেন—হ্যাঁ, গুড -বাই।"

ফুট্‌পাথে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম, মোটারের অরণ্যের মধ্যে ছোট্ট বেইবি-অ্যাস্‌টিন্‌ খানা নিমেষে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

১৩৩৪ থেকে '৩৬ সালের মধ্যে আমার যে-সমস্ত গল্প বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে এক মেজাজ ও স্টাইলের আটটি একত্র করে' এই বই তৈরি হ'ল। এই গল্পগুলো যে শুধু দপ্তরীর সুতো দিয়ে একত্র বাঁধা নয়; এদের মধ্যে যে বিষয়-ও ভাব-গত অন্তরঙ্গ মিল রয়েছে; এরা যে যুগল-মলাটের কক্ষে আবদ্ধ না হ'লেও সকলে মিলে' একটি বই তৈরি করতো—তা বুদ্ধিমান পাঠককে বলে' দিতে হয় না।—প্রথম ও শেষ ও যাঁহা বাঁহার তাঁহা তিপ্পান্ন ভারতবর্ষে, তথৈব বিচিত্রায়, অভিনয়, অভিনয় নয় ও ছেলেমানুষি কল্লোলে, বোন্ উত্তরায় এবং পুরাণের পুনর্জন্ম প্রগতিতে প্রকাশিত হয়েছিলো।

পুরাণের পুনর্জন্ম রচনার একটু ইতিহাস আছে। ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে যখন আমি ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত প্রগতি চালাতে আরম্ভ করলাম, তখন আমাদের সেই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মহৎ চেষ্টায় একজন সদ্য-ইয়োরোপ-ফেরৎ হার্ভার্ডের এ, এম্ ও লণ্ডনের পি-এইচ্-ডির কাছ থেকে অনেক উৎসাহ ও সাহায্য পাই; তিনি আমাদের সাহিত্যিক-বন্ধু শ্রীপ্রভু গুহঠাকুরতা। প্রগতির পেট ভরাবার জন্যে নানারকম নতুন খোরাক উদ্ভাবন করতে প্রভুবাবু ছিলেন অসাধারণ: পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটাবার প্রস্তাব তাঁর অনেক আইডিয়ার একটি মাত্র। বলা ভালো, এ-আইডিয়া তিনি পান্ তখন সদ্য-প্রকাশিত John Erskine-এর Sir Galahad থেকে; বইখানা তিনি আমাকে পড়তে দেন্; এবং পরে কিছুদিন ধরে' আমরা জল্পনা করি, রাম-সীতা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়-স্মরণীয়াদেরকেও ধুতি-শাড়ি পরিয়ে বিংশ শতাব্দীর কল্‌কাতায় টেনে আনা যায় কিনা। (John Erskine যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা লক্ষ্য করবেন, Erskine-এর method-এর সঙ্গে এর তফাৎ আছে; Erskine সময় অপরিবর্ত্তিত রেখে বিংশ শতাব্দীর spirit

ঢুকিয়েছেন ; আমাদের প্ল্যান্ হ'ল বিংশ শতাব্দীতে পৌরাণিক চরিত্রের পুনরাবির্ভাব ও পৌরাণিক ঘটনার পুনরভিনয় করানো : ফল অবিশ্যি দু' জায়গাতেই এক হয়েছে ; দুটোই অত্যন্ত মজার burlesque হয়েছে।) যে কথা, সে কায্য। আমাদের প্রথম মনোনয়ন পড়্লো ঊর্ম্মিলার ওপর : কারণ অবিশ্যি রবিঠাকুরের প্রবন্ধ। বাল্মীকি থেকে একেবারে দূরে সরে' না গিয়ে প্লটটাকে যতদূর আধুনিক করা হ., আমি আর প্রভুবাবু বসে' ঠিক করলাম। 'পুরাণের পুনর্জ্জন্ম' এই general title একদা অজিতকুমার inspired মুহূর্ত্তে উচ্চারণ করে' ফেল্‌লেন। লিখিত হওয়ার ঠিক আগের অবস্থায় গল্পটি যতদূর তৈরি হ'তে পারে, সে-পর্য্যন্ত প্রভুবাবুকে অন্যতম লেখক বলে' স্বীকার করতেই হ'বে। লেখার ব্যাপারেও ইয়োরোপের জীবন ও জগ্রাফি সম্বন্ধে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।

প্রভুবাবুর কাছ থেকে এত সাহায্য পাওয়ায় গল্পটি নিজের নামে প্রকাশ করতে আমার একটু কুণ্ঠা হ'ল (যদিও, ছদ্মনাম নিলে প্র গ তি র পাঠকদের বুদ্ধদেব বসুর নাম একবার কম দেখ্‌তে হয়, এ-সুবিধেও কম নয়)। তাই বিপ্রদাস মিত্র ছদ্মনামে পু রা ণে র পু ন র্জ ন্ম প্র গ তি তে দেখা দিলো। বিপ্রদাস মিত্রর আশা এবং ইচ্ছে ছিলো, রাম, সীতা, ভীষ্ম, কর্ণ, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকল নায়ক-নায়িকার গা থেকে কবিত্ব ও দেবত্বের বস্ত্র হরণ করে' বাঙ্‌লা ভাষার একমাত্র বিরাট satire রচনা করা ; কিন্তু মাস গেলো, বছর গেলো—বিপ্রদাস মিত্র আর লিখ্‌লেন না। আর-একজন লেখক প্র গ তি তে ই লক্ষ্মণের পুনর্জ্জন্ম ঘটালেন, কিন্তু বিপ্রদাস মিত্র আর লিখ্‌লেন না। আমার মনে হচ্ছে, বিপ্রদাস মিত্র আর লিখ্‌বেনও না। সুতরাং বাঙ্‌লাদেশের কোনো যশাকাঙ্ক্ষী যুবক-লেখকের জন্যে একটি মহামূল্য tip বিনামূল্যে যাচ্ছে।